হৃদয়পুর লোকাল

সৌরভ মিত্র



হৃদয়পুর লোকাল

সৌরভ মিত্র





গল্প কোথায় থাকে?- চা-কফির আড্ডায়, ঘড়ির শাসানি এড়ানো বাজারের ফর্দে, রাতজাগা টেলিফোনে, দুপুরের হেঁশেল থেকে নৌকার ছাওয়ায় । শহরের সীমা থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে। গল্প থাকে মাটিতে। সে মাটি কোথাও দিগন্ত রচনা করে, কোথাও সিমেন্টের ফাঁক গলে এগিয়ে দেয় ঘাসফুলের রং। সেই সব খণ্ডমুহূর্তে মাটি বুক পেতে দেয়। এগিয়ে চলে হৃদয়পুর লোকাল। একে-একে সওয়ার হতে থাকে শহুরে মধ্যবিত্ত, মফস্বলের বোকাসোকা চাকুরে, ব্যর্থ সেলসম্যান, অনাবাসী ভারতীয়, সম্বলহীন স্মাগলার, মুখচোরা ডুবুরি, বৃদ্ধ কীর্তনীয়া, মাটির প্রদীপের কারিগর, সুন্দরবনের এক মাঝির পোষা বাঘিনী। সিংভাঙা পাঁঠাকে নিয়ে চড়ে বসে ময়ুরপঙ্খি দলের বাজনদারও। সময়ের বেড়া ডিঙিয়ে হাজির হয় উনিশ শতকের বাবু, মিশরের ফারাও। তাদের টুকরো কথা, হাসি, কান্না, চিৎকারের একফাঁকে ছিটকে আসে দীর্ঘশ্বাস। লাল-নীল-সবুজ-কালোয় রঙিন হয়ে এগিয়ে চলে সেই হৃদয়পুর লোকাল। সে যাত্রা কামনা-বাসনা, রাগ, লোভ, হিংসা, হতাশা, পাগলামি নেশা ধরায়।– না, মসৃণ আমেজ নয়, তারা দিশি, তাদের সর্বাঙ্গে ঝাঁঝ, গন্ধ, হয়তো বা বিষও...

দেশ, বর্তমান, সাপ্তাহিক বর্তমান, শিলাদিত্য, ঋত্বিক, অন্তরীপ, ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত পঁচিশটি ছোটোগল্প নিয়ে এই সংকলন।

হৃদয়পুর লোকাল

সৌরভ মিত্র



boiChoi publiCation

think books, think boiChoi

Hridhoypur Local
A collection of short stories
by Sourav Mitra

বইচই পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে
অংশুমান চক্রবর্তী এবং অভীক সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

ISBN ঃ 978-93-93949-16-5

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৮৭/২১২, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা ৭০০০৪৭
নিজস্ব বিপণীঃ স্টল ১ এবং ২, ব্লক ৩, সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়্যার, কলকাতা ৭০০০১২
ফোনঃ ৯৭৪৭৪ ৮৮৭৪৭ / ৯৮৭৪৩৭৮৫৮৭ / ৯৮৩০৪৩০০৪৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ নভেম্বর ২০২২

দাম ঃ ৩০০.০০ টাকা

মুদ্রণ ঃ ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., কলকাতা ৭০০১৩২

প্রচ্ছদ - সৌজন্য চক্রবর্তী
বর্ণ সংশোধন - পিয়ালী দাস
অক্ষর বিন্যাস - ঋতাক্ষর

পরিবেশকঃ বইচই বিপণী। স্টল ১ এবং ২, ব্লক ৩, সূর্য সেন স্ট্রীট। কলকাতা ১২.
বাংলাদেশ এ আমাদের পরিবেশক ঃ অক্ষর এক্স ওয়াই জেড

প্রাপ্তিস্থান ঃ বইচই বিপনী, দে'জ, দে বুক স্টোর (দীপুদা), অভিযান বুক ক্যাফে
এবং কলেজ স্ট্রীটের অন্যান্য বিপণী।
অনলাইন প্রাপ্তিস্থান ঃ boichoipublication.com, boighar.in,
readbengalibooks.com

... আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাহাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে–
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক
ওগো দুখজাগানিয়া॥
তোমায়...

সূচিপত্র

চোর

অবশেষে ধরা পড়েছে চোর। জ্যৈষ্ঠমাস। রবিবার ভরদুপুর। নেহাত ঠেলায় না পড়লে রাস্তার কুকুরও এমন রোদে পথে নামে না। দেওয়ানপাড়ায় হঠাৎ শোরগোল– 'মার ব্যাটাকে, হাড় গুঁড়িয়ে দে, চামড়া গুটিয়ে দে।'

গত কয়েক মাস খুব জ্বালিয়েছে হতচ্ছাড়া। রোজ রাতেই কারও না কারও বাড়ি থেকে মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন, টর্চ, খুলে রাখা কানের দুল, জামা-প্যান্ট, খেলনা, এমনকী জুতোজোড়া অবধি জানালা বা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে গায়েব হয়ে যাচ্ছিল। চোরের উৎপাতে ঘরবাড়িকে তো লখিন্দরের লৌহবাসর বানিয়ে রাখা যায় না। এই গরমে চতুর্দিক আটকে ঘুম? ফলে, তাপমাত্রা চড়ছিল। আজ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। দশদিক থেকে ধেয়ে আসছে অভিযোগ।

– মেয়ের জন্মদিনে আইপড দিয়েছিলাম। জানেন, তিনটে দিনও শান্তিতে গান শুনতে পারল না বেচারি।

– বালগোপালের চাঁদির থালাটা অবধি ছাড়েনি! জানোয়ারটার নরকেও ঠাঁই হবে না।

– আমার ল্যাপটপ।

– আমার টিভির রিমোট।

– গাড়ির চাবি।

– রেলের মান্থলি।

– লোকনাথবাবার ফটো।

বিকাশ দত্তের দেড়শ টাকার হাতঘড়ি নারকেলডাঙা কারশেডে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যারাকপুর লোকালের সিটের নীচে তখনও টিকটিক করছিল। সেই সুযোগ বুঝে তিনিও বলে উঠলেন, 'আমার রোলেক্স ঘড়িটাও ঝেঁপে দিয়েছে কাল।'

উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু, পাড়ার ল্যাম্পপোস্টে যাকে বাঁধা হচ্ছে, সেই লাল্টু অবাক হয়ে যায়। এত মাল সরালো কে? যে ফর্দ কানে আসছে, তার অর্ধেক জিনিস চোখেও দেখেনি। পল্টুদা এই এলাকায় অন্য ছেলেও দিয়েছে নাকি? তেমন তো হওয়ার কথা নয়। ঝামেলা চুকলে আজই কথা বলতে হচ্ছে।

হঠাৎ কাঁধে বিশাল এক রদ্দা! ও তৈরি ছিল না। বেশ লেগেছে। দশ-বারোটা হাত, চ্যালাকাঠ, খেটো বাঁশ, বেল্ট, ইত্যাদি নিজের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে লাল্টু শ্বাস আটকে শরীর শক্ত করে নেয়। পটলার এলেম আছে, জব্বর টেকনিক শিখিয়েছে মাইরি? নইলে এই মার হজম করতে হত না। অবশ্য তার

আটবছর রেগুলার পুলিশের বাটাম খাওয়ার অভ্যেস, টেকনিক সে জানবে না তো লাল্টু জানবে? অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে তো নাকি!

গণধোলাই শুরু হলে দু-ঘা খেয়েই মরে-গেলাম মরে-গেলাম ভাব করতে হয়, নইলে অল্পে ছাড় মেলে না। লাল্টুর অত অভিজ্ঞতা নেই। তাই ঘা দশেক খাওয়ার পরও চোর নির্বিকার দেখে জনগণের মেজাজ আর শক্তি দুই-ই যেন চড়তে থাকে। একফাঁকে কে আবার বিচুটিপাতা ঘষে দিয়েছে পায়ে। লাল্টু মনেমনে ভাবে, হাতটা দয়া করে খোল বাবা। মা কালীর দিব্যি, পালাব না। শান্তিতে একটু চুলকে নিতে দে। পরে যত খুশি ঠ্যাঙাস।

সব ঠ্যাঙানিদাতাই যে ওর পূর্ববর্তী শিকার নয়, তা বলাই বাহুল্য। সক্রিয় জনতার মধ্যে জনাসাতেক তরুণ তুর্কি আসলে সদ্য হতাশাবিদ্ধ। পাড়ার ক্লাবের উদ্যোগে রাতে পাহারা দেওয়া শুরু হয়েছিল ক-দিন। লুকিয়ে এর-ওর জানালার ফাঁকে চোখ রাখা যেত। ক্যাবলাটা ধরা পড়ে গেল! সব শেষ।

জনরোষের মাত্রা দেখে প্রবীণ নাগরিক রঘুনাথ মিত্তির বেশ শঙ্কিত, 'ও অবিনাশ, ছেলে-ছোকরাদের একটু থামাও। বেচারা মারা পড়বে তো!'

অবিনাশ মুস্তফি আগুনখোর বুদ্ধিজীবী। পাঁচটা কথার মধ্যে চারখানা কোটেশন ঝাড়েন। ইদানীং আবার উত্তর আধুনিকতা নিয়ে পড়েছেন। লিওতার, নীৎসে, হ্বিটগেনস্টাইন ছাড়া মুখে রোচে না। তিনি বললেন, 'সমস্যাটি বেশ গুরুতর মিত্তিরদা। ব্যক্তিজীবনে চিরক্ষুধার্ত যৌনতা, সমাজজীবনে রাজনৈতিক মৌনতা, আর দুইয়ে মিলে সার্বজনীন গৌণতা। প্রোলেতারিতদের এছাড়া তো কিছু নেই। গতকাল আবার ইন্ডিয়া আট উইকেটে হেরেছে। ফলে সমস্যাটি এখন গুরুতর-র হওয়ার পাশাপাশি গম্ভীরতরও বটে। এ বিষয়ে বোদ্রিয়ার বলেছেন-'

– তোমার এই কেদার-বদ্রি পরে শুনব'খন। আরে, অঘটন কিছু একটা হলে পাড়ার লোকেরই কোমরে দড়ি পড়বে যে!

– কী করবেন? সমাজ সংস্কারের কাজে-

– পুলিশে খবর দিই? অ্যারেস্ট করলে বেচারা রেস্ট তো পাবে।

ফোন আসতেই মেজবাবু বিমলদারোগার মেজাজ খাপ্পা। দুপুরের মাটন রেজালা ঠিকমতো হজম অবধি হয়নি, এর মধ্যেই ডিউটি! নিরাকার উপরওয়ালার প্রতি অনুচ্চারে কয়েকটি বাছাই করা সম্বোধন নিবেদন করার পর বললেন, 'ছাতার চাকরি! ডি.এ.-র বেলায় লবডঙ্কা, কাঠফাটা রোদে ছুটিয়ে মারবে! এই হালদার, গাড়ি লাগাতে বল। পল্টুর টিমের এক মাল কেস খেয়েছে মনে হয়। যত্তসব নবিশ ছেলেপুলে, সাবধানে কাজ করতে পারে না!'

থানা অবধি যেতে হয়নি। বিটি রোডে পৌঁছেই গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে পুলিশ। দু-পাটি কোলাপুরি চপ্পলের জন্য ডায়েরি লেখা,- ঘাস কাটতে করাত চালানোর সামিল।

আজ লাল্টুর জন্মদিন। কাল রাতে তেমন কিছু হয়নি। ভেবেছিল, রোজগারপাতি হলে ইংলিশ খেয়ে আপনমনে 'হ্যাপি-বাড্ডে' গাইবে। ভরদুপুরে

কাজে নামা সেই জন্যই। বার্থডে হ্যাপি তো হলই না, উলটে জনগণ দলবেঁধে মোমবাতি নিভিয়ে ছেড়ে দিল! সারা গায়ে বেশ ব্যথা। মরুক গে, এবার না হয় পরের বার হবে।

রাত ন-টা। গায়ের জামাখানা বন্ধক রেখে এক পাউচ দিশি গেলার পর গরমও লাগছে। এক্সপ্রেসওয়ের ধারটায় খুব বাতাস। লাল্টু আদুল গায়ে রাস্তার ফেন্সিং-এর ওপর বসে। এই রাস্তা চওড়া করার সময় ছাই ফেলে ফেলে নীচু জলাজমি উঁচু করা হয়েছিল। তখন প্রায় তিন-মানুষ সমান ছাইয়ের পাহাড়। আরও অনেকের মতো ওর মা-ও এখানে আসত আধপোড়া কয়লার খোঁজে। কয়লা নিতে নিতে বেশ কয়েকটা গুহা-মতো হয়ে গিয়েছিল। একদিন এমনই এক গুহায় ধ্বস নামে। লাশটা বের করাও যায়নি।

জোরালো হাওয়ায় বেশ আমেজ। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। স্কুলবইয়ের স্মৃতি থেকে কালপুরুষ আর সপ্তর্ষিমণ্ডল স্পষ্ট চিনতে পারে লাল্টু। মনটা উদাস হয়ে যায়। হাত দশেক দূরে মদনের পান-সিগারেটের দোকান। রেডিও চলছে। দু-একটা বিজ্ঞাপনের পর গান শুরু হয়। 'আরও প্রভু আরও আরও এমনি করেই, এমনি করেই আমায় মারো।'

'আজব পাবলিক তো মাইরি!' লাল্টুর বিস্ময় যেন কাটেনা, 'মার খেতে কারও এত ভাল্‌লাগে?'

ঘুমিয়ে পড়েছিল অলক দাস। বয়স যথেষ্ট হয়েছে। রাতের পর রাত কাঁহাতক জেগে বসে থাকা যায়? রাত বারোটা নাগাদ দরজায় ধাক্কা পড়ে।

– বাবা, ও বাবা। এই বুড়ো... ওই শালা বাপ! দরজা খোলো।

– এই না হলে সুপুত্তুর! মাঝরাত্তিরে মদ গিলে এসে বাপকে খিস্তি না করলে কি আর পুলিশের মার হজম হয়। আমাকে যমেও নেয় না!

– সঙ্গে ডিফেক্টিভ পিস আর নিচ্ছে না। গোটা মালই রাখার জায়গা নাই, তা আবার ল্যাংড়া-খোঁড়া! আর তুমি গিয়েও বা করবা কী? অপ্সরাদের সঙ্গে শান্তিতে কোমর দোলাতেও তো পারবা না।

– দেখ লাল্টু, তুই কিন্তু-!

– মেলা ভ্যাজভ্যাজ কোরো না। পেটের ছুঁচোগুলো কিচাইন করছে, খেতে দাও।

– কোত্থেকে পাব?

– সব নিজেই গিলে বসে আছ?

– তোর মদের জোগান দিয়ে কারও কিছু গেলার উপায় থাকে? খেতে হলে বৌয়ের হোটেলে যা।

– বেকার বউ-বউ হেজিও না তো। হুহ্, কার শালা বউ, কোন শালা মানে?

ওরা যখন দুর্গানগর কলোনিতে থাকত, লাল্টুর তখন বছর-বারো বয়স।

বনগাঁ লাইনে ফলের হকারি করত অলক। কলোনির একদল ছিন্নমূল মানুষ। সুখে-অসুখে, ঝগড়া-সখ্যে মিলেমিশে দিন কাটে। এরই মধ্যে একটি পরিবার শিবু হালদারের। অলক আর শিবুর শিকড় এক গাঁয়ের। বন্ধুত্ব একটু বেশিই ছিল তাদের।

স্টেশনফেরত শিবুর দোকানে এক ভাঁড় চা আর একটা চারমিনার না হলে সারাদিনের ক্লান্তি যেন কাটতই না অলকের। পুজো-পার্বণে দেওয়া-থোওয়া, বাবুদের গুঁতোয় এক বাসে চেপে ব্রিগেড গিয়ে সারাদিন 'চলছে-না চলবে-না', এক লাইনে ভোট দেওয়া, পচা চালের কারণে রেশন দোকান ভাঙচুর, তার জন্য একরাতের হাজতবাস— সবেতেই পাশাপাশি। যাকে বলে উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুনিগ্রহে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি-।

কলোনিরই কিশোর বিশ্বাসের মেয়ের বিয়ে। শেষ ব্যাচে খেতে বসেছিল ওরা দুজন।

– মাছটা ভালোই রেঁধেছে। কী মাছ রে? আগে খাইনি।

– সিলভার কাপ না কী যেন। বাজারে নতুন এসেছে।

– তোর ভাল্‌লাগছে না? গোমড়া মুখে বসে আছিস কেন?

– কিশোরদার কত খরচ গেল জানিস? প্রায় ষাট! এখনই যদি এই দশা হয়, সোমার সময় কী হবে? চায়ের দোকান চালিয়ে অত টাকা পাব কোথায়?

– অত ভাবিস না। আমরা আছি তো। সবাই মিলেমিশে কিছু একটা হয়ে যাবে।

– সে জানি, কিন্তু?

– আচ্ছা, সোমার তো ন-বছর হল?

– হ্যাঁ। কেন?

– লাল্টুর বারো চলছে। দুটোকে... কী বলিস? বিয়েটা সারা থাকুক, সেয়ানা হওয়া অবধি না হয় তোর মেয়ে তোর কাছেই রাখলি। ভেবে দেখ। বলিস যদি, সামনের অঘ্রাণেই লাগিয়ে দিই। কাঁচা থাকতে খুঁটি জুটিয়ে দিলে ছেলেমেয়ের পোঁদ পাকার বয়সে গেল-গেল করে ভেবে মরতে হবে না।

গলা খাদে নামায় অলক, 'দিনকাল যা পড়েছে, কিশোরদার ভোগান্তির কথাই ভাব। এই মেয়েকে পার করতে কম ঝক্কি গেল?'

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। দুই গিন্নিও মহাখুশি। বহু বছর বাদে জীবনে একটা বলার মতো অনুষ্ঠান। লাল্টু তখন ক্লাস ফাইভে। কেন জানে না, বিয়ের কথায় খুব লজ্জা-লজ্জা লাগত। ওর সঙ্গেই পড়ত কাত্তিক। অবশ্য, 'পড়ত' বলা ভুল, তিন-চারবার গাড্ডা খেয়ে ক্লাস ফাইভেই লটকে ছিল। বন্ধুমহলে জনপ্রিয়তা সাঙ্ঘাতিক। তখনই 'দিল', 'আশিকি', 'সাজন'— সব দেখা সারা। কামারহাটির কোন-এক মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ট্রেমও করত নাকি। তার জ্ঞানের দাপটে লাল্টুদের কান গরম হয়ে যায়। এক-একদিন বাপ-মায়ের মুখের দিকে তাকাতে অবধি পারে না।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বাড়তি একদিনের প্যান্ডেল-খরচ বাঁচাতে বাসি বিয়ে বসেছে সেদিনই। হঠাৎ মহা গন্ডগোল! কোথাকার কোন-এক শিশু রক্ষা সংগঠন পুলিশ নিয়ে হাজির।– 'নাবালিকার বিয়ে? গ্রেফতার কর!'

দুই বাপ পুরুষ-ফাটকে, দুই মা জেনানা-ফাটকে। বর-কনের ঠাঁই হল শান্তিনগর চাইল্ডহোমে। লাল্টুর আসার কারণ শুনে হোমের অন্য ছেলেগুলোর সে কী হাসাহাসি! ওর সবকিছু গুবলেট হয়ে যাচ্ছিল। বিয়েটা যেন ভগ্নাংশের অঙ্কের একুশ পূর্ণ তিনশ সতেরোর পাঁচশ চার-মার্কা বিচ্ছিরি উত্তর হয়ে লটকে গেল! আচ্ছা, বাবা-মাকে ছাড়বে কবে? নিজেই বা কবে বাড়ি ফিরবে?

তৃতীয়দিন সকাল থেকেই খুব মনখারাপ। হিসেবমতো সেদিন বৌভাত হওয়ার কথা। মুরগির মাংসের অর্ডার দিয়েছিল বাবা। এমনিতে বিয়েবাড়ির খাবার পরিবেশন যারা করে, তারা বেশ ওস্তাদ কবাডি খেলোয়াড়। 'কবাডি-কবাডি'-র মতোই 'মাংস-মাংস', 'ছ্যাঁচড়া-ছ্যাঁচড়া', 'সন্দেশ-সন্দেশ' করতে করতে চারদিকে সাঁ-সাঁ ছুটে চলে। জামাই আর বরযাত্রী ছাড়া অন্য কেউ তাদের চট করে আউট করতে পারে না। ইশ, নিজের বৌভাত, যত খুশি মাংস খাওয়া যেত। তার বদলে কিনা ট্যালটেলে ডাল আর কুমড়োর তরকারি, থুঃ!

হোমের খাবারদাবার, বলাই বাহুল্য, মুখরোচক নয়। তবে সেদিন রাতে জুটল ডিমের ঝোল। আধখানা হাঁসের ডিম, সারাক্ষণ পাতের এপাশ-ওপাশ বাঁচিয়ে রেখে শেষে সাদা অংশটা লাল্টু বেশ আয়েশ করে খাচ্ছে, হঠাৎ সোমার কথা মনে পড়ে। তখন সে ওই হোমেরই বালিকা বিভাগে। ইশ, কাত্তিকটা অত কিছু শেখাল, পেস্টিজ রাখতে হবে তো! কুসুমটুকু আর খাওয়া হয় না।

দশটা বাজল। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। ও চুপিচুপি বেরিয়ে বালিকা বিভাগের সামনে আসে। চোরের মতো পাইপ, সানশেড বেয়ে উঠে মুখ রাখে দোতলার জানালায়।

– সোমা, ওই সোমা... ওই মুটি, শোন না।

জানালায় ভূতের মতো একটা ছায়া। সোমা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তবে গলাটা চেনা। সে পা টিপেটিপে এগিয়ে যায়।

– এটা নে।

– কী এটা?

– ডিমের কুসুম। খা।

কাগজের পুঁটলিটা হাতে সোমা কী করবে বুঝতে পারে না।

– একটা কথার উত্তর দিবি?

– কী?

– আমাদের বিয়েটা হয়েছে কি হয়নি বলতো?

– জানি না।

– আজকে আমাদের ফুলশয্যা, জানিস?

– জানি না।

– গাধি। কিছুই জানে না। ... এদিকে আয়। কানেকানে একটা কথা বলব।

হঠাৎ 'চ্যাঁ-ভ্যাঁ' চিৎকারে ছুটে আসে বালিকা বিভাগের ওয়ার্ডেন। একহাতে ডিমের আধখানা কুসুম, অন্যহাতের চেটো দিয়ে নিজের গাল ঘষছে পরশু রাত্রে হোমে আসা মেয়েটি!

– এই মেয়ে, কাঁদিস কেন? কী হয়েছে?

– দ্যাখেন না দিদিমনি, গালে থুতু লাগিয়ে দিল।

– কে?

সোমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে শূন্য জানালার দিকে আঙুল দেখায়।

– কে এসেছিল?

– কেউ না।

– বল বলছি।

সোমা একটু যেন ভেবে নেয়, 'চোর।'

হলেও হতে পারতো বেয়াইরা যখন কে কাঠি করেছে-র উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত, তখন জেনানা-ফাটকে সমভাগ্য দুই বেয়ান জুড়েছে মহা-চুলোচুলি! একজন বলে, 'তোদের জন্য আমার ছেলেটা ফাঁসল', তো অন্যজন বলে, 'আমার মেয়ের সব্বনাশ করেছিস তোরা'।

এক সপ্তাহ পর ফাটকমুক্ত হলেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ভাঁটার নদী ক্রমশ শুকোতে থাকে। শিবু আর অলক তখনও এক-আধদিন লুকিয়ে-চুরিয়ে আড্ডা দিত বটে, তবে আর তেমন প্রাণ ছিল না।

প্ল্যাটফর্মে পড়ে পা ভাঙল অলকের। প্রায় একবছর শয্যাশায়ী থাকতে হল। শিবু বেশ কয়েকবার এসেছিল খোঁজ করতে, প্রতিবারই লাল্টুর মায়ের চোখা-চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে উঠোন থেকে ফিরে গিয়েছে।

লাল্টু এখন বুঝতে পারে, ঠিকে ঝিয়ের কাজে দিনরাত গালমন্দ শুনতে শুনতে আর নৈমিত্তিক অভাবের তাড়নায় মায়ের মনটা বিষিয়ে গিয়েছিল। খিদের থেকে ছোটোলোক তো আর কিছু হয় না।

একদিন দুম করে মরেও গেল মা-টা। ওদিকে, এক্সপ্রেসওয়ের আশীর্বাদে শিবুর চায়ের দোকান ফুলে-ফেঁপে হোটেল হয়ে গেল দেখতে-দেখতেই। দুর্গানগর কলোনি ছেড়ে নতুনপল্লীতে ঘর তুলল শিবু। মুখ দেখাদেখিটুকুও রইল না।

শিবুর পর হোটেলের হাল এখন সোমার হাতে। বেশ কড়া ধাতের মালকিন। দিনেদিনে ব্যবসাও বেড়েছে অনেক। চা, কফি, কোকাকোলার সঙ্গে সিঙাড়া, চপ, ওমলেট, তড়কা রুটি, রোল, মোগলাই, চাউমিন— খাদ্যতালিকাও দীর্ঘ হয়েছে পাল্লা দিয়ে।

মাঝেমধ্যে কানে খবর এলেও লাল্টু ওদিকটায় বহুদিন যায়নি। বছর

তিনেক আগের ঘটনা, সেদিনও ওর জন্মদিন, দলের একটা ছেলে হঠাৎ লাইন ছেড়ে দেয়। সকালে নাকি বিয়ে করেছে কালীঘাটে। বেশ খাওয়াদাওয়া হল সেদিন পল্টুদার ডেরায়। দিশির আমেজে নানান এলোপাথাড়ি চিন্তা ঘুরছিল লাল্টুর মাথায়। হঠাৎ হাজির হয়েছিল শিবুর হোটেলে। প্রায় তেরো-চৌদ্দো বছর বাদে। একটা ফাঁকা টেবিলে বসতেই কাউন্টার থেকে সোমা নাকমুখ কুঁচকে তাকায়, 'কী চাই?'

– চিনতে পারছিস?

– চোর-ছ্যাঁচড়াদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় রাখি না। কী কাজ বল।

– উরিঃ শালা, কী দেমাক দেখাচ্ছিস রে!

– ক্যাচাল করিস না তো। কাজ না থাকলে বেরো এখান থেকে।

– একটা মোগলাই দিতে বল। চিন্তা নাই, মাঙনা খাব না। ... এই যে পয়সা।

– এটা মাতলামির জায়গা না। চল ফোট।

– আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দিবি?

– কী?

– আমাদের বিয়েটা হয়েছিল কি হয়নি বল তো?

– শালা কুত্তা।

– খিস্তি করছিস? আজকে আমার জন্মদিন রে।

– জন্মে চোদ্দোগুষ্টি উদ্ধার করেছিস আমার! ব্যবসার টাইম, ভদ্রলোক কাস্টমাররা আসে। গেলি?

– রাখ তোর ভদ্রলোক! শালা, দু-নম্বরির পয়সায় কেনা গাড়িতে অন্যলোকের বৌ নিয়ে ফুর্তি করতে যায়। রাস্তায় তোর হোটেলে চিলি-চিকেন প্যাঁদায়। তারা সব সাধু, আমিই শালা চোর। তারা ইংলিশ টানলে দোষ নাই, আর আমি বাংলা খাই বলে মাতাল?

– এই হারামি, নিজে উঠবি নাকি লোক ডাকব?

ওদিকে আর যায়নি লাল্টু। মনখারাপ লাগে। অতদিন পর দেখা, একটু ভালোমুখে কথা বলা যেত না?

খিদে হজম করার অভ্যেস আছে অলকের। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। লাল্টুর পেটের ভিতর খিদে যেন কামড়ে ধরেছে। বহুদিন ধরে ঘুমের সময়টাও গিয়েছে বদলে। প্যান্টের পকেটে কিছুটা চিনেবাদাম ছিল। ও অনেকক্ষণ ধরে একটা একটা করে চিবোয়। জল খায় দু-ঘটি। ততক্ষণে আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। শুতে না শুতেই দরজায় ঘা। বিমলদারোগার তলব, তবে অন্য থানায়।

বাগুইহাটির বড়োবাবু আর মেজবাবুর সঙ্গে বসেছিল বিমলদারোগা।

– একটা ডাকাতি হয়েছে বুঝলি, এক মন্ত্রীর মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে।

লাল্টু রসিকতা করে, 'মাসতুতো ভাই তো স্যার শুধু আমাদেরই থাকে

শুনেছিলাম।'

– এক চড়ে হাগিয়ে দেব বাঞ্চোৎ, আমার সঙ্গে ফাজলামি!

লাল্টু মনেমনে বলে, এহ্ পুলিশ যেন আমার ভাসুরঠাকুর, দেখলে ঘোমটা দেব! বলে, 'আমি এই বাওয়ালে নেই। নিজের ম্যাও নিজেরা সামলান।'

সঙ্গে সঙ্গে বিমলদারোগার তেজ, লেজের মতো যেন দু-পায়ের ফাঁকে ঢুকে যায়। 'কেন মাথাগরম করছিস বাবা? ওই মিডিয়া-ফিডিয়া ঢুকে কেসটা একটু ঘেঁটে দিয়েছে। অ্যাকশন না নিলেই নয়। এদিকে প্রাইম সাসপেক্ট সুদামা আবার আর এক মন্ত্রীর ডানহাত। তাকেও, বুঝতেই পারছিস, ছোঁয়া যাবে না।'

– তো আমি কী করব?

– মাসখানেক সুদামা সেজে থাকবি আর কী। ততদিনে মিডিয়াও ঠাণ্ডা। ভুল করে একটা রং-নম্বর হয়ে গিয়েছে। দলের ভেতরের ব্যাপার, দুই মন্ত্রীতে মিটমাটও হয়ে যাবে। কোনো চিন্তা নেই বাপ। কেস দেওয়া তো আমাদের হাতেই, হালকা কিছু দেব। তোকে না দেখিয়ে চার্জশিট জমা-ই দেব না। তোরও ক-দিন একটু বিশ্রাম হবে, যা খাটাখাটনি যায় তোদের!

– বলেন কী! আমার জন্য আপনাদের এত দরদ?

– কেন, পড়িসনি, দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা যেথা কাঁদে!

– সব্বোনাশ করেছে!

– সর্বনাশ বলতে নেই। থিংক পজিটিভ।

– জানি স্যার, জানি। ইস্কুলে শিখিয়েছিল, বোতল হাফ্ খালি না বলে হাফ্ ভর্তি বলতে হয়।

– এই তো বুদ্ধিমান ছেলে। এবার শোন, ফিরে আসার পর ছ-মাস কেউ তোকে ছোঁবে না। আর এই ক-দিন তোর বাবার সমস্ত দায়িত্ব আমাদের। বুড়োমানুষ, কতদিন আর এভাবে আধপেটা খেয়ে থাকবে বল? মাঝেমাঝে ডাক্তার-টাক্তারও দেখানো দরকার। কাজের চাপে তোর হয়ে ওঠে না– বুঝি। রোজগারও তো নিয়মিত নয়।

– আমার বাপকে দত্তক নেবেন নাকি? বুড়ো কিন্তু বহুত খিটখিটে।

– ছিঃ ছিঃ, কী যে বলিস! তোর বাপ, সেতো আমাদেরও বাপের মতো।

সহমর্মিতায় গলে যায় লাল্টু। পরদিন সকালে কাগজে ওর ছবি বেরোয়। কালো কাপড়ে ঢাকা মুখ, কোমরে দড়ি, দু-পাশে হোঁতকা চেহারার দুই কনস্টেবল। পাশে শিরোনাম, 'পুলিশের জালে এলাকার ত্রাস।' উরিব্বাস! লাল্টুর পেটের মধ্যে যেন ব্যাঙ লাফায়, গর্বে বুক ফুলে ওঠে। হুঁহুঁ বাবা, প্রথম পাতায় ছবি! প্রধানমন্ত্রী, এমনকী তেন্ডুলকারেরও ওপরে। ইশ, আগে জানলে মুখটা খোলা রাখত। ও ভাবে, সুদামার বদলে নিজের নামখানাই থাকলে পল্টুদার সামনে পেস্টিজটা কত না বেড়ে যেত!

পুলিশ হেফাজত থেকে কোর্ট। সিনেমায় দেখা, স্বপ্নে দেখা কোর্টের সঙ্গে প্রায় কিছুই মিলছিল না। চোখে পট্টি বাঁধা স্ট্যাচু নেই, কাঠগড়ার বদলে ছোট্ট

একটা জলচৌকি। সেখানে 'গীতা পে হাত রাখকে' কসমও খেতে হল না, কেউ গলা ফাটিয়ে 'কানুন অন্ধা হ্যায়' বা 'অর্ডার-অর্ডার'ও বলল না। জজ্ সাহেবের পরচুলা আর হাতুড়ি— এ দুটি যে কোন চুলোয় গিয়েছে, ভগবান জানে!

লাল্টু মনেমনে ভাবে, 'না, আইনকানুনে তেমন আর ঝাঁঝ নাই!'

কোর্ট থেকে জেল। আগে বার-দু-তিনেক লক-আপে ঢুকলেও জেল ওর জীবনে এই প্রথমবার। প্রিজন ভ্যানটা গেটের সামনে আসতেই সটান স্যালুট ঠোকে লাল্টু। গুরু, তোমাদের দেখেই লাইনে এসেছি। আশীব্বাদ করো, জীবনে কিছু যেন হয়। কর্তব্যরত পুলিশটি গুঁতো বা গালি দেবে কী, অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।– 'মদনটা কে বে?'

কিন্তু, প্রতিশ্রুতির মাসখানেক বাড়তে বাড়তে বছরখানেক হয়ে যায়। নিজের ওপর কিছুটা রাগই হয় লাল্টুর। ইশ, কাজের সময় এইটুকু বুদ্ধি মাথায় খেলল না? পুলিশের কথায় কোনো উজবুক বিশ্বাস করে! বিমলদারোগারা সেদিন সবটা বলেনি। ডাকাতি শুধু একটা নয়, বেশ কয়েকটা। তার সঙ্গে তোলাবাজি, পেটো বাঁধা, মেয়েছেলে, এমনকী পুলিশ ঠ্যাঙানোর কেসও ছিল সুদামার। তবে ওই শেষটুকুর কারণে লাল্টু তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। সেই দুই মন্ত্রীর মিটমাট আর হয়নি। কাগজে লিখেছিল 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব'। লাল্টু তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, 'দূর মরা, আমাকে বন্ধ রেখে নিজেরা দ্বন্দ্ব করিস কেন? এদিকে ইয়ের গন্ধে রাতে ঘুম অবধি আসে না।'

কখনও আলিপুর কখনও দমদম। নিখরচায় কলকাতা পরিক্রমা। ঘড়ি বেঁধে যোগব্যায়াম, স্নান, খাওয়াদাওয়া। কার্পেন্ট্রি বা গার্ডেনিং-এর কাজ। সন্ধেবেলায় নাচ-গান-নাটকের রিহার্সাল। জেলারের মেজাজ খারাপ থাকলে অল্পবিস্তর ধোলাই।— মোটের ওপর সরকারি চাকরির মতো নিয়মবাঁধা জীবন। শুধু এক-আধদিন দু-ফোঁটা দিশির জন্য বুকটা বড্ড ছটফট করে– এই যা।

মাঝে একবেলার জন্য ও খোলা আকাশ দেখেছিল, নিমতলা শ্মশানে। বাবুরা এটুকু দয়া করেছেন। সারা জীবন যাকে খিটখিটে বুড়ো ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি, সেই বাবার জন্য ও সেদিন পাগলের মতো কেঁদেছিল।

ছাড়ার সময় জেল থেকে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা দিয়েছে। জীবনের প্রথম এক-নম্বরি উপার্জন। সে না হয় হল, কিন্তু ও যাবে কোথায়? ঘুরতে ঘুরতে পল্টুদার ডেরাতেই এসে পৌঁছায়। আসতেই উৎসব শুরু। ইংলিশ হুইস্কি, তন্দুরি মুরগি, কাজুবাদাম, ডিভিডি-তে হিন্দি সিনেমা।

রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে নেশার আমেজ। সিনেমায় গান শুরু হয়। নায়িকাটা পুরো চাবুক, নাচছেও হেব্‌বি! নতুন, কিন্তু মুখটা খুব চেনা-চেনা। টিভির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন কারেন্টের শক্ লাগে মাথার ভেতরে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লাল্টু এক্সপ্রেস-ওয়ের দিকে ছুট দেয়।

...

– কোন ভাগাড়ে ছিলিস এতদিন? ... ম্যাগা, কী গন্ধ!

– ঝামেলা করিস না। খাবার দিতে বল। ... তোর হোটেলের ছেলেগুলো কী রে? শালার টেবিলে এঁটো লেগে আছে।

– বলেছি না, চোর-ছ্যাঁচোড়দের-

– ফালতু বকিস না। গত একবছর আমি ওই লাইনেই নাই।– তোর দিব্বি।

লাল্টু পকেট হাতড়ায়। হুইস্কি-তন্দুরিতে প্রায় সব শেষ। খুচরো মিলিয়ে মাত্র দশ-পনেরো টাকা পড়ে আছে। একটা দশটাকার নোট ও টেবিলের ওপর রাখে, 'এই নে, অ্যাডভান্স পেমেন্ট। ... দেখছিস কী? গতর খেটে কামিয়েছি।'

– এতে সিঙ্গেল ওমলেট ছাড়া আর কিছুই হবে না।

– তাই-ই দে।

– তোর মতলবটা কী?

– বলব। তার আগে একটা কথার উত্তর দে।

– আবার! তোর মরণ হয় না?

সোমা রান্নাঘরে আসে। 'ইমতিয়াজ, চাউমিন নামলে সিঙ্গেল ওমলেট চাপাবি। পেঁয়াজ-লংকা বেশি দিবি।'

কড়াই ফাঁকা হতেই ছেলেটি স্টিলের গ্লাসে ডিম ঘুঁটতে শুরু করে।

'একটু টমেটো কুচিও ছড়িয়ে দিস।'

ছেলেটি বিনাবাক্যে নির্দেশ পালন করে।

'এক কাজ কর, ডাবল দে।'

আর একটি ডিম ভেঙে ছেলেটি আগের মতোই ঘুঁটতে থাকে।

– কিছু বলবেন দিদি?

– তুই ছাড়। ওমলেটটা আমিই বানাই।

*****

'শিলাদিত্য', ২০১৭

মানচিত্র

দ্বীপটা ডুবে গিয়েছিল। এখানকার মানচিত্র খুব বেশিদিন একরকম থাকে না। প্রায় প্রতিটি বন্যায় দু-চারটে দ্বীপ ডুবে যায়, আবার মর্জি মতো জেগেও ওঠে নতুন দু-চারটে। কাদা শুকোনোর আগেই একদল গৃহহীন মানুষ তল্পিতল্পা নিয়ে জায়গা দখল করতে ছোটে। কেউ পায়, কেউ পায় না। হাতাহাতি লাঠালাঠি হয়। রক্ত ঝরে। পার্টি অফিসের লোক আসে। বাঁদরের রুটিভাগের মতো মাটির ভাগ হয়। দেখতে-দেখতেই হোগলাপাতা বা খড়ের ছাউনির ছোটোছোটো ঘর গজিয়ে ওঠে গোটা দ্বীপ জুড়ে। প্রতিবছর এক চিত্র, মানুষগুলোর আস্তানা বদল হয়। ঠিকানা বদলায় না। মানচিত্র চিরকালই রাজনৈতিক, এখানে যার নাম সুন্দরবন।

শানুমিঞার দাদুর বয়স প্রায় নব্বই। বুড়োর কথায়— গত পঞ্চাশ বছরে নাকি এমন বন্যা হয়নি। এই দ্বীপটা ছোটোখাটো নয়, তবুও ডুবে গেল। শানুরা ছিল বর্ধিষ্ণু চাষি, দ্বীপের মাটিও ছিল জীবন্ত। কত জাতের শৌখিন ধান— দুধেশ্বর, চামরমণি, কলমকাটি, মাগুরডিমে, আরও কত কী! গোলায় উঠলে সারা পাড়া গন্ধে ম-ম করত। মগরাহাট, ক্যানিং, জয়নগরের পাইকার, আড়তদাররা মোটা দামে কিনতে আসত সেই ধান।

সে প্রায় তিনবছর আগের কথা। ডুবে যাওয়ার দু-বছর পর ফের ডাঙা জেগে উঠতেই হাজির সরকারি বাবুরা। নোটিশ ঝুলিয়ে দিল,– এই জমি নাকি সরকারের। ওরা অবাক, ‘তা কী করে হয় বাবু? ইখানে আমার তিনপুরুষের ভিটা, বিশবিঘা ধানিজমি!’

– আপনার জমি বন্যায় ডুবে গিয়েছে শানুমিঞা।

– কিন্তু, এ তো সেই জমি!

– কে বলেছে সেই জমি? এটা নিউ-বর্ন-ল্যান্ড, এর মালিক সরকার।

– হারানো ছেলে ঘরে ফিরলে সে বুঝি বাপের নাম পায় না?

– এসব কথায় কোনো লাভ নেই। আর তাছাড়া আপনার তো পুনর্বাসন হয়েছে, ক্ষতিপূরণও পেয়েছেন।

– সে তো মোটে দু-হাজার টাকা। একখান বলদের দামও হয় না।

– দেখুন, কোনো কমপ্লেইন থাকলে দরখাস্ত করুন, বিবেচনা করা হবে।

লেখাপড়া না জানলেও শানু জানে দরখাস্তে লাভ নেই। জমানো টাকায় আর ঘরে যেটুকু সোনাদানা ছিল, তা বেচে কোনোমতে এ ক-বছর চলেছে। এখন বাড়িতে হাঁড়ি চড়া দায়। ও পার্টি-অফিসে যায়। এক দল বলল,– তারা এখন আর

সরকারে নেই। অন্য দল খেদিয়ে তাড়াল,– এতদিন ওই দলে ভোট দিয়ে কোন মুখে সে তাদের কাছে এসেছে? অনেক হাতেপায়ে ধরে জবরদখলের অনুমতিটুকু আদায় করে।

হ্যাঁ, সরকারি জমি জবরদখল হতে সময় লাগে না। ও নিজের জমির কিছুটা নিজেই দখল করে চোলাইয়ের দোকান দেয়। ওর দাদু সেদিন বলেছিল, 'মোসলমানের পুলা হয়ে হারামের ধান্দা করবি বাপ!'

ও জবাব দেয়নি। হারাম? আল্লা যদি চাইত আমি হারামের পথে না যাই, তা'লে অমন দুধেল জমি গিলল ক্যানে? আর কী-ই বা করার আছে?– একবার নোনা জল ঢুকলে সেই জমিতে কি চাষ করা যায়!

চোলাইয়ের দোকান থেকে মোটামুটি চলে যাচ্ছে শানুর। সকাল-সন্ধে দু-বেলার ব্যবসা। সন্ধের ভিড় পাঁচমেশালি,— মহাজনের গোমস্তার লোকজন, চাষি, শোলার কারিগর, দর্জি, নানান ধান্দার লোক। মাঝি-মল্লারা আসে সকালে। সারা রাত সাগরে মাছ ধরার পর ভোরবেলা মহাজনের হিসাব চুকিয়ে, জাল শুকোতে দিতে-দিতেই রোদ চড়ে যায়। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে, শানুর দোকানে ভিড় জমায়। সেদ্ধ ছোলা, কাঁচা পেঁয়াজ, ফুলুরি বা চিংড়িমাছ ভাজার সঙ্গে ঘোলাটে কাঁচের গ্লাসে কাকচক্ষু তরল।

প্রথমে বুক জ্বলে, তারপর নিষিদ্ধ প্রেমের মতো নেশা চড়ে ধীরেধীরে। মাঝি-মল্লারা সন্ধের দিকেও আসে এক-আধজন। আর আসে পশ্চিমদ্বীপের ওই মেয়েগুলো। চকচকে সাজগোজ আর ঝকমকে জামাকাপড়ে দোকানের বাইরে খুঁটি ধরে দাঁড়ায়। মাঝেমাঝে শানুর ধাতানিতে কিছুটা দূরে সরে যায়, আবার ফিরে আসে। খদ্দেররা ফেরার পথে এদের নিয়ে যায় গুদামঘর বা নৌকার ছাউনিতে, কখনও জঙ্গলে। বিনিময়ে জোটে কয়েক কিলো চাল বা একঝুড়ি সবজি বা কিলোখানেক মাছের বরাত। কপাল ভালো থাকলে নগদ টাকাও জোটে কোনো-কোনো দিন।

এই ভিড়ে শুধু একজন আছে, কিছুটা অন্যরকম। তার আসল নাম তৌফিক শেখ। আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রঙের জন্য লোকের মুখেমুখে নামটা হয়ে গিয়েছে কালু। পাহাড়ের মতো চেহারা। গায়ে বাঘের মতো শক্তি। এমনকী ওর গায়েও কেমন যেন বাঘ-বাঘ গন্ধ! পার্টি-অফিসের এক ইংরিজি কাগজ পড়া বাবু বলেছিল, কী এক বিলাতিঠাকুর আছে, শানুর সাইকেলের নামে নাম— 'হারকিলিস', খুব নাকি জাগ্রত, এই কালু যেন তার কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তি!

সে মদ ছোঁয় না। তবু রোজ দু-বেলা ওর দোকানে আসে। ফুলুরি কী চিংড়িমাছ ভাজা খায়। ওই অবধিই। কারো সঙ্গে কথাও বলে না বিশেষ। ওর সুঠাম শরীর দেখে মেয়েছেলেগুলো হাজারটা ছেনালি করে। ওর সেদিকেও কোনো বালাই নাই। শানু ঠিক বুঝতে পারে না, ও আসে কী জন্য? এক-দু-বার জিজ্ঞেস করেছিল। গম্ভীর গলায় কালু বলেছে, 'মানুষ দেখি চাচা, জানোয়ারও দেখি। বলেন যদি আর আসব না।'

বেশি ঘাঁটাতে ভয় পায় শানু। ওই চেহারা, ওই মেজাজ, তার ওপর লোকে বলে, ওর নাকি পোষা বাঘ আছে একখানা! সুন্দরবনের লোক সে, বাঘের সঙ্গে প্রায় গেরস্থালির সম্বন্ধ। কিন্তু, এর আগে কেউ বাঘ পুষেছে বলে শোনেনি কোনোদিন।

সকালে ঘাটে নৌকা বাঁধতেই রোজের মতো মেছুনির দল মাছের বরাতের জন্য ঢলাঢলি করছিল, কালু পাত্তা দেয়নি। পাল্লাখানেক মাছ নিয়ে রওনা দিয়েছিল বনবিবির থানের দিকে। মহাজন ধমক লাগায়। ও মেজাজে বলে, 'ভাগের হিসাবে বাটা দিবেন কত্তা, অত কথায় কাজ নাই।'

– নৌকা কি তোর বাপের? হারামজাদা!

– না পুষালে বলেন, ফারখৎ করে দি।

ও কমকথার মানুষ। লোকজনের এত ফ্যাকড়া ভালো লাগে না। বাড়িতে মানুষ বলতে ও একাই। বাপ মরেছে নৌকা ডুবে– তখন ওর নয় কী দশ সাল বয়স। তার ক-মাস পরেই কলমিশাক তুলতে গিয়ে চাঁদবোড়ের কামড় খেল ওর মা, জায়েদা। ভাই ছিল একটা, দুধ ছাড়েনি তখনও। কালুর মনে আছে, ওর ভাই এনামুল যখন পেটে, হরেক জিনিস খাওয়ার সাধ জাগত জায়েদাবিবির— ডাল-গোস্ত, চষির পায়েস, কাছিমের ডিম, বাখরখানি বিস্কুট, আরও কত কী! ওর বাপ নিয়েও আসত রোজ রোজ। হেসে বলত, 'পোয়াতিকালে কত কিছুই না খেতে সাধ জাগে!'

মা-বাপ মরার পর ওই বয়সেই হারাধন দাসের নৌকায় দাঁড় ধরতে শুরু করে কালু। পাশের ঘরের মঙ্গলামাসি বুক দিয়েছিল এনামুলকে। সেই এনামুল বাঘের হাতে মরেছে। নিতে পারেনি, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তেই হাতের কাস্তে ঘুরিয়ে বাঘের মুখের ওপর চালিয়ে ছিল সে। মার খেয়ে জঙ্গলে পালিয়েছিল বাঘ। সে মরল চারদিনের মাথায়, কাকদ্বীপ হাসপাতালে। শরীরে আর খুন বাকি ছিল না। এনামুলের কাস্তেটা কালু সবসময় সঙ্গে নিয়ে ঘোরে।

শানুমিঞার দোকানে চেয়ার-টেবিল বলতে বাঁশের তৈরি ছোটো-ছোটো কয়েকটা মাচা। মাটির মেঝেয় গেঁথে বসানো। তারই একটায় একঠোঙা ফুলুরি নিয়ে বসে আছে ও, কাস্তেটা একপাশে রাখা।

শানু আড়চোখে ওকে দেখছিল। হঠাৎ গোলমাল শুনে অন্যদিকে চোখ ফেরায়। কাদের আর দুলালে আজ আবার লেগেছে! দুই স্যাঙাত রোজ একসঙ্গে আসে, এক টেবিলে খায়, নেশার ঘোরে খেস্তা-খিস্তি করে, আবার গলাগলি করে একসঙ্গেই ফিরে যায়। দুটোই পেট-কানা, জল পড়লেই গজল ধরে। ভেলিগুড়ের জলে কার্বাইড মেরে বানানো চোলাই, মাথায় চড়তে সময় লাগে না। কাদেরটা হাউমাউ করে চেঁচাচ্ছিল। দুলুও কম যায় না, খালাসির কাজ করতে করতে তার গলাতেও খুব তেজ, 'অত চিল্লাস না কাদের। মালের চোখে ছাল দেখতে খাল দেখিস, বড়ো-বড়ো কথা!'

– তুই আমার গিলাসে চুমুক দিয়েছিস ক্যানে? রোজ শালা তাই করিস। চার গিলাস কিনি, পেটে দু-গিলাসও যায় না... পয়সা কি তোর বাপের পুটকি মেরে আসে? উল্লুকা পাঠ্‌ঠা!'

কাদের কোনো এক কালে দিল্লি গিয়েছিল, এখনও রাগের মাথায় মুখে হিন্দি ছোটে। দুলুরও নেশা ধরেছে। সে হুংকার লাগায়, 'চোওওপ! ফের চিল্লাবি তো ধরে আমার বৌয়ের সঙ্গে তোর নিকে পড়িয়ে দিব। যা দজ্জাল মাগী,– বুঝবি শালা, চার থেকে দুই কী করে হয়।'

'এই দুলু!' এবার শানু ধমক লাগায়, 'ঘরের অউরত নিয়ে কুকথা বলিস বে-আদব! লাথ মেরে ভাগিয়ে দিব দুকান থেকে।'

– বুড়া বয়সে আর লাথালাথি কোরো নি শানুভাই, কোমরে খিঁচ ধরবে।

– চিনা-চিনা ঠেকছে... আরে, দশরথ না? কবে এলা? ভিতরে আসো।

– চিনতে পারলা তাহলে।

– চিনা কি আর যায়, প্রায় তিন সাল পরে এসছ। চুল সফেদ, গোঁপ নাই। তা, এখন কুথায় থাকা হয়?

– কলকেতায়। নরেনপুরে ফেলাট কিনেছি, নয় লাখ ট্যাকা দিয়ে।

'নয় লাখ!' চোখ কপালে ওঠে শানুর, 'কুথায় পেলা?'

– সে কথা পরে হবে। আগে দাও তো দু-গিলাস, তেষ্টায় গলা টাটাচ্ছে। তবে ওই দিশি মাল দিওনি। রাম-টাম কিছু আছে?

– খাঁটি বিলাতি মাল, ইসপেসাল কালেকসন। বসো, আনছি।

ঘর থেকে তার সেই 'ইসপেসাল কালেকসন' নিয়ে এল শানু। ফরিদমাঝির বেংতিজালে আটকেছিল। কোনো জাহাজ থেকে বোতলের পেটি জলে ফেলেছিল বোধ হয়। জাল ছিঁড়ে ফর্দাফাই, নতুন জালের দাম বাবদ সাতশ টাকার সঙ্গে বাড়তি আরও দুশো টাকা দিয়ে পেটিটা সে কিনেছে।

দশরথ উল্লাসে প্রায় লাফিয়ে ওঠে, 'এ তো শালা জাত ফিরিঙ্গি! কোত্থেকে পেলা?'

– তুমার নয় লাখের ফেলাট যেখান থেকে পেয়েছ, সেখানেই। ... মাছ খাও। জাল-নৌকার খবরে তুমার কী গরজ?'

হেসে ওঠে দশরথ, 'তা ঠিকই বুলেছ। আচ্ছা, তুমি ছিলা চাষি, মালের দুকান দিলা কুন বিগারে?'

– তুমি তো দুই-তিন সাল ইদিকে আসোনি। হাল-হকিকত জানো না। সেইবারের বানে ভিটা-মাটি সব চলে গেল সাগরের গভ্‌ভে।-

– গাঁয়ের লোক সরকারি বাঁধ কাটতে গেছিল ক্যানে? সেই লেগেই তো বানের জল ঢুকেছে।

– রাখো তুমার সরকার। শালারা সব ক-টা ভেড়ির মুখে বাঁধ মেরে গেছিল। ভেড়ি থেকে ক-ঘরের পেট চলে জানো না? সেখানে সাগরের পানি না ঢুকলে মাছ বাঁচে?

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। বাদবাকি খদ্দেররা একে-একে বিদায় নিয়েছে। কেউ হল্লা করতে করতে, কেউ টলতে টলতে, কেউ ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে। শুধু কালু ছিল একই রকম শান্ত। তবে আজ ওর দু-চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। কিছুক্ষণ পর দশরথও ফিরে যায়।

দোকানে তালা ঝোলাচ্ছিল শানু, অস্ফুটে একটা গালাগাল করে। দোকানের তেলেভাজার কারিগর মদনের কান এড়ায়নি, 'খিস্তি দিলা ক্যানে চাচা?'

– লোকটা জাত হারামি।

– ক্যানে গো, কী করেছে?

– তুই তো হিঁদু-ঘরের ব্যাটা, চাচার বিটিকে তোরা বুন ডাকিস। এ শালা ইবলিশের বাচ্চা নিজের সেই বুনের জাত মেরেছিল।

– সে কী গো! কবে?

– সে চৌদ্দো-পনেরো সাল আগের কথা। কলকেতার বাবুরা তখন সোঁদরবনের বাঘ দেখার নামে মেয়েছেলে লিয়ে ফুর্তি করতে আসতে লেগেছে সবে। এই শালা তখন মাছ, মুরগি, হরিণের মাংস লিয়ে যেত লঞ্চে। মদ-গাঁজাও রাখত। বাবুরা বললে ঘর-বিছানাও জুটিয়ে দিত ডাঙায়। শ্যাম্‌লী ছিল ইর চাচার মেয়া। বাবুদের গায়ের হাওয়া লেগি ইর তখন মাথা ঘুরে গেছিল। একরাতে নাশ করল মেয়াটাকে।

– কেউ কিছু বলেনি?

– কে বলবে? কেউ তো জানেইনি পরথমে। মেয়াটা বুবা-কালা ছিল যে। আর ক-দিন পরে উ-মেয়ার প্যাট ফুলতেই ই শালা গায়েব।

– মেয়াটার কী হল?

– খুদা জানে। কেউ বলত দশরথ উকে পছিমদ্বীপের মাগীপাড়ায় থুয়ে এসছে, কেউ বলত কালীঘাটে, কেউ বলত বোম্বাই না আরবে।

– তা'লে আজকে ইকে কিছু বললা না ক্যানে? সাধ করে আবার বিলাতি মাল খাওয়ালা!

– উরি বাপ, ইর কত ক্ষেমতা জানিস? তবে আল্লা কসম, জান করছিল, শালাকে জবাই করে ভাগাড়ে থুয়ে আসতে।

দশরথের কেউ কিচ্ছু করতে পারেনি। ওই ঘটনার বছর তিন-চার বছর বাদে দ্বীপে ফিরেছিল। তখন মাছ-মাংসের কারবার ছেড়ে শুরু করল বাবুদের লঞ্চে 'হাফ-গেরস্থ' জোগানোর ধান্দা। কারও সাহস ছিল না কিছু বলার। বাবুদের সঙ্গে রোজকার ওঠবোস, থানার দারোগাও তাকে খাতির করে। পার্টি-অফিসেও বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। ফি বছরের বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়ে লোকে যখন দলে দলে কারখানার মজুর হতে লাগল, ওর ব্যবসা তখন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। আয়ার কাজ, সেলাইয়ের কাজ দেওয়ার নামে শহরে পাঠাত এখানকার মেয়ে-বৌদের।

দিন গেল, বদলে গেল ঘাটে টাঙানো পতাকার রং। নতুন পার্টি-অফিসেও ভেট যেতে থাকল নিয়মিত। দশরথ নিজে তখন আর খুচরো কাজ করেনা। আট-

দশটা গ্রামে ছড়িয়ে রেখেছে দালাল, সে এখন পাইকার। আর সেই দৌলতেই নরেন্দ্রপুরের নয়-লাখি ফ্ল্যাট, নামে বেনামে আরও অনেক কিছু।

পরদিন সকালে রাতের পারিশ্রমিক বাবদ মাছের বরাত বুঝে নিতে তিন-চারটে মেয়ে ঘুরঘুর করছিল শানুর দোকানের আশেপাশে। খদ্দেরের আশায় এই সাতসকালেও মুখে 'ইস্নো-পাউডার', ঠোঁটে 'লিপিসটিক' মেখে হাজির আরও দু-চারজন। সবাই মোটামুটি মুখ চেনা। দোকানে আসার পথে একটা বারো-তেরো বছরের মেয়েকে সেই দলে দেখে থমকে দাঁড়ায় শানু।– 'এই ছুঁড়ি, তোর নাম কী?'

– বুলু।

– ঘর?

'ওই দিকে।' পশ্চিমদ্বীপের দিকে আঙুল দেখায় বুলু।

– এইটুকুন মেয়া, এ কামে লেগেছিস ক্যানে?

'না লামলে খাবে কী? বুলেন তো আপনার লগেই যাক উ।'– পাশের জন জবাব দেয়।

– চুপ কর ঢেমনি। তওবা তওবা!

বুলুকে কাছে ডাকে শানু, 'এই আকামে থাকিস না বিটি। জরুরত হলে আমার থেকে দশ-বিশ ট্যাকা লিয়ে যাস।'

বিশ টাকা নিয়ে বুলু ফিরে যায়। শানু জানে, এভাবে বেশিদিন চলবে না। বিশ টাকায় কী-ই বা হয়? কতটুকু সাধই বা মেটে? তবু,– বান আসবেই জেনেও মানুষ বাঁধের মাটি উঁচু করে।

– ছুঁড়িটা কে গো?

ও চোখ কুঁচকে তাকায়— দশরথ, মুখে ক্রূর হাসি। হঠাৎ ক্ষেপে যায় শানু, 'দোহাই মিঞা, রেহাই দাও। ওইটুকুন বাচ্চা!'

খ্যাকখ্যাক করে হাসছিল দশরথ, 'চারাপোনায় পুস্‌টি বেশি শানুভাই। এখুন আর দাঁড়াব না। একটা ফিরিঙ্গি মাল দাও দেখি, নতুন দারোগা এসছে থানায়।'

দশরথ বিদায় নিলেও রাগ পড়ে না শানুর। মনেমনে তার বাপ-বাপান্ত করতে থাকে।

ভুটভুটিবাঁধা আছে জেটিতে। চোখের তেজ কমেছে। অন্ধকারে জঙ্গলের পথে চলতে ভয়-ভয় করছিল দশরথের। বুলু নামের মেয়েটাকে তুলতে প্রায় আট-ন-শ টাকা খরচ হয়ে গেল। সে হোক, তার জহুরির চোখ, রতন চেনে। জানে, সুন্দরবনের চোলাই-ঠেকের খুঁটি ধরে দাঁড়ানোর মাল এ নয়। কলকাতায় পারুলমাসির কাছে ফেললেই হল। ছ-মাস 'টেরনিং' নিলেই নগদ বিশ-পঁচিশ হাজারে বিকাবে!

একদম আনকোরা মাল। পাল্লায় তোলার আগে নিজে একবার চেখে

দেখার ইচ্ছে হচ্ছে খুব। নিতাই বিশ্বাসের আড়তে যাওয়া যায়। আগে বাবুদের নিয়ে যেত সেখানে। গোটা দুই ঘর আছে।

এত রাতে পথে লোকজন ছিল না। কিন্তু, বাঁশঝাড় পেরোতেই গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ উদয় হয় কালু। হাতে চকচক করছে কাস্তে, চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত ভাঁটা— সাক্ষাৎ যমদূত! দশরথ আঁতকে ওঠে, 'কে তুই? কী চাস?'

কোনো কথা না বলে কালু হঠাৎ কোপ বসিয়ে দেয় দশরথের গলায়। কাটা-মুন্ডু ছিটকে পড়ে জঙ্গলে।

চোখের সামনে ব্যাপারটা ঘটতে দেখে ঠকঠক করে কাঁপছিল বুলু।

তুর কুনও ভয় নাই বেটি, তুই ঘরে যা।

দশরথের দেহটা কাঁধে নিয়ে কালু অনায়াসে হাঁটছিল। এই জঙ্গল হাতের তালুর মতো চেনা। বনবিবির থানে পৌঁছে হাঁক ছাড়ে। শরখড়ির ঝোপ থেকে গরগর করতে করতে বেরিয়ে আসে একচোখি বাঘিনী। কালু কবন্ধটা তার দিকে ছুঁড়ে দেয়, 'মানুষ খাওয়ার শখ হয়েছিল না একদিন? নে খা।'

চোখের সামনে নিজের ভাই এনামুলকে মরতে দেখে সেদিন ওর মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। কুড়ুল হাতে ছুটে এসেছিল জঙ্গলে,- বাঘটিকে মেরেই ফেলবে! খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছিল বনবিবির থানে। বাঘ নয়, বাঘিনী। সেখানেই ধুঁকছিল। কাস্তের ঘায়ে একটা চোখ গিয়েছে। বিষিয়ে উঠেছে মুখের জখম। পাশেই একজোড়া ছানা, তখনও নাড়ি ছেঁড়েনি।

কালু থমকে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ আম্মি-আব্বার কথা মনে পড়ছিল,- আহা, পোয়াতিকালে কতকিছুই না খেতে সাধ জাগে!

বাঘিনী বাঁচত না। ভাইয়ের জন্য কেনা ওষুধ কালু ছিটিয়ে দিয়েছিল জখমে। নিজের হাতে বনমোরগ, খরগোশ মেরে রেখে আসত বনবিবির থানে।

তুফানের খবর হয়েছে। আজ শানুর দোকানে ভিড় বেশ পাতলা। এই ভরসন্ধ্যায় নদীতে ডুব দিয়ে এসেছে কালু। সারা গা চুপচুপে ভেজা।

– চাচা।

– বল বেটা।

– হারামখোর মারলে কি হারাম লাগে?

শঙ্কিত হয় শানু, 'না।'

– তবে আমারও লাগেনি। একটা বোতল দাও।

– তুই তো ওসব খেতি'না!

– আজ খাব। দাও।

কথা না বাড়িয়ে শানু বোতল এনে দেয়। টেবিলে টাকা রেখে রওনা দিচ্ছিল কালু।

– কোথায় যাস বেটা?

– সাগরে। জাল ফেলতি হবে না?

– আজ তো তুফানের খবর আছে, রেডিওয় বলেছে।

– বলুক। আমি যাব।

– বাপধন আমার, আজকি যাসনি।

নিজের বুকে কিল ঠোকে ও, 'তুফান ইখানে উঠেছে চাচা। ইখানে। চৌদ্দো সালের বাদ।'

সঙ্গী দাঁড়ি দুজনকে ছুটি দিয়ে ফাঁকা নৌকায় বসেছিল কালু। দুই চুমুকে পুরো বোতল শেষ, বুকটা জ্বালা করছে খুব। 'শ্যামলী... শ্যামলী...'

তার নীরব মুখের দিকে ও নিশ্চুপ হয়ে চেয়ে থাকত শুধু। ভিনজাতের বলে তখন ঘর বাঁধতে পারেনি। কিছুতেই রাগ পড়ছে না কালুর। 'হারামির বাচ্চা, সেদিন নাশ করেছিলিস শ্যামলীকে, মাগীপাড়ায় ফেলে শিয়ালের মতো ভেগেছিলিস। শালা, সেদিন বোনকে খেয়েছিস, আজ সেই বোনের পেটে ধরা নিজের বিটিকেও খাওয়ার তাল করেছিলিস!'

ঢেউ-এর দোলায় নৌকা দুলছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে আসছে শরীর। নৌকার কষি খুলে দেয় কালু। দাঁড় ধরে। ষাঁড়াষাঁড়ির বানের মতো গমগমে গলায় চিৎকার করে ওঠে;—

'দরিয়ার পাঁচ পীর— বদর... বদর।'

*****

'বর্তমান', ২০১৫

শুবা

— কী মনে হয় বোসদা, এর দ্বারা হবে?

— সেই তো ভাবছি। একেবারে আনস্মার্ট, কোয়ালিফিকেশনও তথৈবচ। পনেরো বছর ধরে ইন্টারভিউ নিচ্ছি, এমন ক্যান্ডিডেট আজ অবধি দেখিনি। 'গ্র্যাজুয়েশান করোনি কেন?'– জাতীয় প্রশ্নে লোকে ইনডাইরেক্টলি উত্তর দেয়, জুতসই একটা অজুহাত দেখায়। এ কিনা ফস্ করে বলে দিল– 'ফেল করেছিলাম'!

বোসের মুখের কথা টেনে নিয়ে সান্যাল বলে, 'কেমন মিনমিনে ভয়েস। হাতদুটো সবসময় বুকের কাছে জড়ো করা,– যেন বরপণ না জোটানো মেয়ের বাবা! নার্ভাসনেসে তোতলায় আবার।'

— রঘুনাথের ছেলে, না–ও করা যাবে না। লোকটা এতবছর এখানে কাজ করেছে, এখন লিউকোমিয়ায় যখন-তখন অবস্থা। একে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড, তার আবার স্পেশাল কেস। কিছু একটা না করলে পরিবারটা পথে বসবে।

— রঘুনাথের আর এক ছেলে আছে না?

— হ্যাঁ, বড়োছেলে। একবারেই অপদার্থ। এ তাও কোনোমতে হায়ার সেকেন্ডারি উতরেছে, তিনি তো স্কুলের গণ্ডিও ডিঙোননি। কী এক চানাচুর কারখানায় কাজ করে।

— এও বা কী এমন পদার্থ? মাধ্যমিকের মার্কশিট যার গরুতে খায়! কোন ডিপার্টমেন্টে দেবেন, কিছু ভাবলেন?

— দেখে যা মনে হয়, আর যাই হোক, চুরি করার মুরোদ হবে না। পারচেজে দিলে কেমন হয়?

— খারাপ হয় না, ইদানীং ওখানে প্রেসারও বেড়েছে। তবে যা-ই বলুন বোসদা, ছেলেটার নামখানা কিন্তু খাসা, 'বিব্রত সরকার'! বেশ পলিটিক্যাল টার্মোয়েলের গন্ধ!

— যা বলেছ! ফর্মটা দাও, অ্যাডমিনে রেফার করে দিই।... দেখেছো! এ হে, ফর্ম ফিল-আপ করেছে, সাইন করেনি। ছোঁড়া সত্যিই ক্যাবলা।...

ভেতরে যখন এই কথোপকথন চলছে, বাইরের সোফায় বসে বিব্রত তখন ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফ্যালফ্যাল চোখে মিউট করা টিভি দেখছিল। কোনো এক গানের অনুষ্ঠান, অমন হাঁ করে শব্দহীন সঙ্গীতের কোন উচ্চাঙ্গ রস আস্বাদন করা যায়, ও-ই জানে।

জাত-খেলোয়াড় হয়, জাত-সাপ হয়, এমনকী আজকাল জাত-প্রেমিক

অব্দিও হয়; ও হল জাত-ক্যাবলা। প্রতিরাতেই ওর মশারিতে গোটা দশেক মশার পিনপিন, একদিন অন্তর অন্তর পাজামার দড়িতে গিঁট, সপ্তাহে দু-বার গলায় মাছের কাঁটা, সোফায় বসলে অনবরত প্যাঁচপোঁচ শব্দ, মোট কথা— জীবনটা যেন সেই ফুটো চৌবাচ্চায় জল ভরার পাতি-বুর্জোয়া পাটিগণিত, একের চোদ্দো ভরছে তো একের পনেরো ঝরছে, বড্ড বেশি ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি।

যাই হোক, চাকরিটা ও পেয়েই গেল। জীবনে এই প্রথম ভাগ্যদেবী এতটা সুপ্রসন্ন, নইলে বিড়ম্বনার শুরু জন্মের আগেই। ওর দাদা, সুব্রতর জন্মের মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই আরও একবার সরকারি মাতৃসদনে টিটেনাস ইঞ্জেকশন আর ফলিক অ্যাসিডের ওষুধ গেলার সময় ওর মাতৃদেবী শ্রীমতি শিউলি সরকারের প্রথম অভিব্যক্তিটি ছিল,— 'আপদ! কত বললাম, সবে একটা জন্মেছে, একটু সামলে চলো। কিন্তু না, রাতে বিছানায় পড়লেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো কানের গোড়ায় ফোঁসফাঁস। নে, এবার সামলা। ওই তো রোজগার, দুজনের সংসারই ঠিকমতো চলে না, তার ওপর দু-দুটো বাচ্চা। বললেই বলবে, একটু টেনেটুনে চালাও। আর কত টানব? মানুষ না ইলাস্টিক! ভারী তো এক পোয়া দুধ, তা দিয়ে আবার এবেলা হবে, ওবেলা হবে, উপিন-বিপিন খাবে!'

তবে শ্রীমতি সরকারকে খুব বেশিদিন দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়নি। ঠিক এগারো মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম দিয়েই তিনি কোমায় গেলেন, ডাক্তার বলল, জন্ডিস। আর তিনদিনের মাথায় রঘুনাথের পুরো জীবনটাকেই আস্ত 'জন্ডিস-কেস' বানিয়ে রেখে কোমা থেকে ফুলস্টপ। সদ্যোজাত দ্বিতীয় পুত্রটির কপাল সবসময় কুঁচকে থাকত, ঘুমের মধ্যেও মুখে যেন একরাশ বিরক্তি! মাতৃসদনের এক পরিচিতা নার্স রসিকতা করে বলেছিল, সুব্রতর ভাই বিব্রত। চারপাশে নানান গোলমাল, নাম নিয়ে নামতা করার পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশ, বার্থ-সার্টিফিকেটে বিব্রত নামেই পড়ল সিলমোহর।

এই হল নামকরণের ইতিহাস। মাদার ছবিতে, এদিকে মাদার-ডেয়ারিও সহ্য হয় না। অগত্যা, ডাক্তারের কথামতো শিশু বিব্রতর খোরাক হল ছাগলের দুধ। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর যখন কোনো প্রতিভারই প্রকাশ বা বিকাশ হচ্ছিল না, লোকে বলতে শুরু করে— এই ছাগবুদ্ধির জন্য ছাগদুগ্ধই দায়ী।

চাকরির প্রথমদিন। রওনা দেওয়ার আগে ও গেল বাবার আশীর্বাদ নিতে। ছেলের মাথায় হাত রাখে রঘুনাথ, 'মন দিয়ে কাজ করবি। কেউ যেন দুর্নাম করতে না পারে। ভগবান তোর মাথায় বুদ্ধি দিন। ব্যাঙ্কের বই নিয়েছিস?'

— হ্যাঁ।

— কোথায়?

— প্‌-অকেটে ।

— পকেটে! রাস্তায় যদি পড়ে যায়? দাঁড়া।'

নিজের অফিসযাত্রার দোসর চেন-কাটা ফ্যাকাশে কালো ব্যাগটা রঘুনাথ ছেলের হাতে তুলে দেয়।

— সামনের চেনটা সারাতে হবে। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের মুখে রামাধীন মুচি বসে। পাঁচটাকার বেশি কিছুতেই দিবি না। এই খাপে বাঁধানো খাতা আর পেন। রোজ রাত্তিরে পরদিনের কাজ লিখে রাখবি, তোর যা ভুলো মন! কেউ যেন বলতে না পারে রঘুনাথের ছেলে ফাঁকিবাজ। আর ভালো কথা, ট্রেনে উঠে ব্যাগ কাঁধে রাখবি না। পাশের লোকের অসুবিধা হয়। টানে ছিঁড়েও যেতে পারে।

ব্যাগ থেকে একটা হুক বের করে সেই হুকে ব্যাগ ঝুলিয়ে ধরে রঘুনাথ। 'এভাবে টাঙিয়ে দিবি। ঠিক আছে?'

হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করে বিব্রত চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সম্মতিতে কাঁধসমেত মাথা বাঁদিকে হেলিয়ে দিল বটে, তোতলামির ফাঁসে 'হ্যাঁ' কথাটা মুখেই আটকে রয়।

'হুক', বিশেষজ্ঞের বাহবা জোটা উচ্চমার্গের ক্রিকেট শটও নয়, ভীমবাহু মুষ্টিযোদ্ধার বাপের-নাম-ভোলানো ঠুঁসোও নয়। নেহাতই নিম্ন-মধ্যবিত্ত একটুকরো লোহার আঁকশি, ইংরেজি 'এস্' অক্ষরের মতো বাঁকানো, দু-প্রান্ত কিছুটা সূঁচালো। বহু নিত্যযাত্রী ট্রেনে এ রকম হুক-সমেত নিজের অফিসব্যাগ যেখানে সুযোগ পায়, ঝুলিয়ে দেয়। অনেক সময় একটি হুকে আশ্রয় পায় একাধিক দফতর-পুঁটুলি।

সে যাই হোক, পূর্বপুরুষের আশীর্বাদরূপে প্রাপ্ত ঝুলিয়ে রাখার এই সুব্যবস্থা-সমেত অফিসব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে ও রওনা দেয় স্টেশন-অভিমুখে।

বর্ষাকালে এ পাড়ার রাস্তায় চলতে হয় খুব সাবধানে। অঞ্চলটা একসময় ধানের জমি ছিল, এখন লোকালয় গড়ে উঠলেও দু-ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে না পড়তেই রাস্তা এমন রূপ ধারণ করে, যেন এই চত্বরের মাটি আজও পুরনো স্মৃতি বুকে আগলে রয়েছে!

বিব্রত শিবমন্দির চত্বরে পৌঁছে দেখে সুমিত্রা নাইট ডিউটি সেরে স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছে। ও আগরপাড়ার সাগর দত্ত হাসপাতালের নার্স। পাড়ারই মেয়ে, তবু সুমিত্রাকে দেখলে আড়াল থেকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরে যেন ব্যাঙ লাফায়। দু-কান গরম হয়ে আসে, হাত-পা কাঁপে, চলতে গেলে হোঁচট খায়, বলতে গেলে শুরু হয় তোতলামি! তবে আজ প্যান্টে কাদার ছিটে লাগা ছাড়া অন্য কোনো বিপর্যয় ঘটল না। রাতজাগার ক্লান্তিতে সুমিত্রা হয়তো ওকে খেয়াল করেনি। সে চোখের আড়াল হতে বিব্রত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। পরমুহূর্তেই গভীর থেকে উঠে আসে দীর্ঘশ্বাস।

দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মে আটটা কুড়ির ডাউন নৈহাটি লোকাল থামতে না থামতেই চারপাশের লোকজনের গুঁতোয় ও সেঁধিয়ে যায় ট্রেনের পেটে। উপদেশমতো ব্যাগ সমেত হুকটা ঝোলাতেই পাশে দাঁড়ানো এক মাঝবয়সি লোক প্রশ্ন করে, 'তুমি রঘুদার ছেলে?'

— হ্যাহ্-হ্যাঁ।

— হুক দেখেই চিনেছি, অবশ্য মুখেরও মিল আছে। নাম কী?

— বি-ইব্রত, বিব্রত সরকার।—

'হতেই হবে। পাবলিক ক্ষেপলে সরকার তো বিব্রত হবেই। চাদ্দিকে যা অবস্থা!'— একটু দূরে একজনের কণ্ঠস্বর বেশ উত্তেজিত। অন্যদিকের আর একজন রসিক চেঁচিয়ে ওঠে, 'মার মার!'

সামনের লোকটি বলে, 'আমি সাধন কর্মকার। রঘুদা আমাদের সঙ্গেই যাতায়াত করতেন, একরকম হুকের সম্পর্কও বলতে পারো। ওই হুকে আমার ব্যাগও ঝুলেছে কিনা। তা, অফিস যাচ্ছ?'

— হ্যাঁ কাকাবাবু।

— এই সেরেছে! আবার কাকাবাবু কেন ইয়ংম্যান? 'সাধনদা'-ই ডেকো।

— আচ্ছা।

— ব্যাগটা রাখতে পারি?

বিব্রত সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই আরও গোটা তিনেক ব্যাগ চটপট হুকে লটকে যায়।

— আলাপ করিয়ে দিই— স্বপন, নিতু, আর ও সমীর। তুমিও না হয় আমাদের দলে সামিল হয়ে যাও, আটটা কুড়ির ডাউন নৈহাটি আর ছ-টা একচল্লিশের আপ নৈহাটি, চার নম্বর কামরা।

আপ আর ডাউন নৈহাটি লোকালের ঝিকঝিকে ওর জীবন টিকটিক করে চলতে থাকে। অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হওয়ার কথাও নয়, হয়ওনি। সেই ক্রমাগত খাটাল হতে থাকা পাড়ার রাস্তা, সুন্দরীর মেজাজ-মর্জির মতো বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রতি রাতে মাতাল সুব্রতর হল্লা, বৌদি অসীমার পালটা চিৎকার, রঘুনাথের একটানা গোঙানি, আর হ্যাঁ, কখনও সখনও লুকিয়ে চুরিয়ে সুমিত্রাকে দেখা। সবকিছুই যেন বাড়ির পাশের পুকুরটার মতো, দমকা হাওয়ায় সামান্য ঢেউ ওঠে আর কচুরিপানার ভিড়ে হারিয়ে যায়।

এরই মধ্যে সেদিন ফেরার ট্রেনে খুব গোলমাল। কী সব অবরোধ-টবরোধ হয়েছে কোথাও। আপ নৈহাটি বাতিল। শিয়ালদা স্টেশন যেন জনসমুদ্র। এই ভিড়ে দলের লোকজনদেরও খোঁজা অসম্ভব। ও একবার মোবাইলে ধরার চেষ্টা করেছিল, লাভ হয়নি। কেমন-কেমন লাগছে, সেই ছোটোবেলা থেকে ওর খুব হারিয়ে যাওয়ার ভয়। সেই ভয় যেন জাঁকিয়ে বসছে ক্রমশ।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ঘোষণা— কৃষ্ণনগর লোকাল ছাড়ছে। শোনামাত্র জনসমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনটা যেন আস্ত হরিণ-গেলা অজগরের পেট! হুকের সাহায্যে ব্যাগ ঝুলছে লোহার তারজালিতে, আর বিব্রত ঝুলছে একটা হ্যান্ডেলের কিয়দংশ হস্তগত করে। এক পায়ের পাতা কোনোমতে জমির সন্ধান পেলেও অন্য পা শূন্যে।

উল্টোডাঙা ঢোকার মুখে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল ট্রেনটা। জোর ধাক্কায় মুঠো আলগা হয়ে গিয়েছিল, পড়ে যেতে যেতে হাতে ঠেকল সেই হুক, ও 'জয় মা' বলে আঁকড়ে ধরে অ্যান্টেনায় ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছিল ট্রেনের বাইরে।

সহযাত্রীরা কোনোক্রমে টেনে তোলার পরও ভয়ে হৃৎপিণ্ড যেন গলায় আটকে রয়েছে! একজন বলে, 'খুব জোর বাঁচলেন দাদা, হুক না থাকলে আজ টুক করে খরচা হয়ে যেতেন।'

ও তখনও হাঁফাচ্ছে। আর একজন বলে, 'রাখে হরি, মারে কে?'

ট্রেন চলতে শুরু করে। যথাস্থানে ঝুলিয়ে দেওয়ার আগে বিব্রত হুকটা কপালে ঠেকায়।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে সেদিন যেন ওর পুনর্জন্ম, কাঁকিনাড়ায় নেমে হুকটা তখনও ব্যাগে ঢোকানো হয়নি। মনে মনে বলে, ঠাকুর, আজ যেন ওর সঙ্গে দেখা হয়। 'ও' মানে সুমিত্রা। আর হুক ছুঁয়ে প্রার্থনার ফলেই কিনা কে জানে, স্টেশনের বাইরে আসতে সত্যিই সুমিত্রার সঙ্গে দেখা!

— বিব্রতদা না?

ওর মুখে দু-কান-বিস্তৃত হাসি, 'হ্যাঁ।'

— কোথায় গিয়েছিলে, অফিসে?

— হ্যাঁ।

— শুনেছি চাকরি পেয়েছ। খাওয়াবে না?

— হ্যাঁ।

— ধুর, কী শুধু 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' করছ? আচ্ছা, আমায় এত ভয় পাও কেন বলো তো? সেদিনও আমাকে দেখে শিবমন্দিরের পেছনে লুকোলে! আমি বাঘ না ভল্লুক?

— না।

— কী না? ধুর!

লজ্জায় ও পারলে নিজের পেটের মধ্যে লুকোয়, কোনোমতে বলে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

— আর কোথায়? হসপিটাল। এখন তো নাইট-ডিউটি... এই রে, ট্রেনের খবর হয়ে গেল! আজ চলি, খাওয়াটা পাওনা থাকল কিন্তু।...

সুমিত্রার চলে যাওয়ার পথে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর সারা দেহ খুশিতে খলবল করে ওঠে। কিন্তু, নাচের তালে রাস্তায় পা বাড়াতেই বিপত্তি,— ধপাস্!

ও নির্বিকার মুখে প্যান্টের ধুলো ঝাড়ছিল। সামনের চায়ের দোকানের লোকটি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে, 'শুকনো মাটিতে খামোখা পড়ে গেলেন দাদা?'

...

— সুমিত্রা, এই, কিছু বলছ না কেন?

— কী বলব?

— যা খুশি। চুপ করে বসে থাকলে হবে না।

— মা বলে, ছোটোবেলায় আরও চুপচাপ ছিলাম, কাঁদতামও না, সেজন্য

নাকি কেউ কোলেও নিত না।

— মা কী বলে, বাবা কী বলে, সে কথা নয়, তোমার কথা বলো।

'আমার কথা!' সুমিত্রা যেন লজ্জা পায়,— 'না, তেমন কিছু নেই।'

ও সুমিত্রার একটা হাত নিজের মুঠোয় ধরে। হাতটা মৃদু কাঁপছিল।

— ভয় করছে?

— একটু একটু।...

ও সুমিত্রার কানের পাশে মুখ নিয়ে কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ ঠকঠক শব্দ! ঘুমটা ভেঙে যায়। চাপা হাতে দরজায় কড়া নাড়ছে কেউ।

স্বপ্নটা বড়ো সুন্দর ছিল। খাটের ছত্রিতে অফিসব্যাগ টাঙানো, চেন খুলে ও হুকটায় একবার হাত ছোঁয়ায়। ঠিক তখনই দরজায় আরও একবার শব্দ, এত রাতে! কী ব্যাপার? কোনো বিপদ-টিপদ— ওর বৌদি অসীমা।

— শুয়েছিলে ঠাকুরপো?

— হ্যাঁ। কী হয়েছে বৌদি? বাবা—?

— ঘুমাচ্ছে। কম্পাউন্ডারবাবু এসেছিল, ইনজেকশন দিয়েছে।

— তবে কি দাদা—?

— মাল গিলে একটু আগেও চিল্লাচ্ছিল, শুনোনি? এখন বেহুঁশ। ছাইগাদায় পড়ে আছে। তোমার খবর নিতে এলাম। এখন চাকরি করছ, দু-দিন পরে সংসার করবা, ছেলেপুলে হবে। ... কিন্তু, আমার কী হবে ঠাকুরপো?

এসব কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না, বিব্রত চুপ করে দাঁড়িয়ে। অসীমা কিছুটা স্বগতোক্তির ঢঙে বলে চলেছে, 'গেল-মাসে পাঁচ বছর হল বিয়ের। এখনও কোলে একটা ছেলেমেয়ে এল না। আমি কী নিয়ে থাকি? তোমার দাদা একটা ঢোঁড়াসাপ— কামড় আছে, বিষ নাই।' অসীমা হঠাৎ খিমচে ধরে বিব্রতর গেঞ্জি, পিছোতে পিছোতে খাটের ছত্রিতে পিঠ ঠেকেছে। অসীমা ওর বুকে মুখ ঘষতে থাকে, 'আমাকে বাঁচাও'—

ও ছটফট করে, অসীমা ওকে খাটের দিকে ঠেলতেই ছত্রিতে ধাক্কা লেগে চেন-খোলা ব্যাগ থেকে হুকটা ছিটকে পড়ে তার কপালে, চাপা আর্তনাদ করে ওঠে। মুহূর্তের হতভম্বতা কাটিয়ে বিব্রত ছুটে পালায়।

বেশ খানিকটা কেটেছে, ক্ষতস্থানে আঁচল চেপে নিজের ঘরে ফিরে আসে অসীমা, 'দাদা ঢোঁড়াসাপ তো ভাই হেলেসাপ, পালাতেই ব্যস্ত!' রাগ পড়তে সময় লাগে না। চোখ ভিজে ওঠে, এতদিন হল এ সংসারে, তাও বাপের বাড়ির অমতে। স্বামী আছে শুধু সিঁথির সিঁদুরেই। সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ।

এত পরিশ্রম, তবু শরীরের যৌবন যেন দিন-দিন আরও প্রকট হয়ে উঠছে! পাশের বাড়ির মালতী, ওর সমবয়সি, আজ পাটের মতো চুল, খসখসে চামড়া, আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে আঠালো হাজা, ক্ষয়াটে ফাটা গোড়ালি নিয়ে আজ যেন ওর থেকে দশ বছরের বড়ো! সে অসীমার নামে কুৎসা রটায়, বাঁজা মেয়েমানুষ বলেই অসীমার এত ঠমক-ঠামক। ওর মুখের ভয়ে সামনে কিছু বলার সাহস না পেলেও

ও জানে, মালতীরা ওর শরীর দেখে ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরে।

তবে ঈর্ষা কি অসীমাও তাকে করে না? মাত্র তিন-চার মাসের ব্যবধানে মালতী এ পাড়ায় বৌ হয়ে এসে আজ দুই ছেলের মা। কিন্তু, অসীমাও তো চেষ্টা কম করেনি, পূজা-অর্চনায় ফল না পেয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিজের পরীক্ষা করিয়েছিল, কোনো খুঁত নেই। হীরাপুরের জোড়া-থানে মা মনসা আর বাবা শাহ ফরিদের নামে মানত রেখেছিল, কাজ হয়নি। অব্যর্থ তাবিজ দেওয়ার নামে গোহালবাটির জংলিবাবা যখন ওর গায়ে হাত দিল, ও বাধা দেয়নি— যদি বীজ ধরে, যদি—! নিজের ভেতরে একটা প্রাণের সন্ধান পাওয়ার জন্য ও নষ্ট হতেও রাজি।

অফিসে চিন্তিত মুখে বসেছিল বিব্রত। সেদিন রাতে পালাতে গিয়ে কাদায় আছাড় খেয়েছে, বাকি রাতটুকু কেটেছে শিবমন্দিরের চাতালে। সেদিন আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে গিয়েছিল। সারা গায়ে কাদা, অবশ্য কালির চেয়ে কাদার দাগ ভালো, ওতে তবু মাটির গন্ধ থাকে। একটা নখ উপড়েছে, ডান পায়ের আঙুলটা ব্যথায় টনটন করছিল। যা ঘটেছে, কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না! খুব ভয় করছিল।

সকালে শাসিয়ে গেছে অসীমা, 'আজকে কিন্তু ছাড়ব না। আবার যদি পালানোর তাল করো, দরজায় খিল তুলে চিল্লাব, লোক ডাকব। বলব, তুমি আমার সর্বনাশ করছিলা।'

কথাগুলো মনে আসতেই ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

'কী ব্যাপার? এসিতে বসেও ঘামছ! শরীর খারাপ নাকি?'— তপন নামের সহকর্মী ছেলেটির গলায় উদ্বেগের ছোঁয়া।

— না না।

— যাও, ষড়াননদা ডাকছে। আর শোনো, শেঠিয়া ইলেকট্রিক্যালস্-এর প্রবাল দত্তও রয়েছে দেখলাম। খুব সাবধান, মালটা খুব ঝানু, ওই ষড়াননও ওর হাতের মুঠোয়। তুমি তো সাদাসিধে লোক, অত ঘোর-প্যাঁচ বোঝো না। দত্ত কিন্তু টোপ ফেলবে, ওর পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই।

বিব্রত বেশ বিব্রত মুখে ষড়াননের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়।

— এসো এসো। ইনি শেঠিয়া ইলেকট্রিক্যালস্-এর মার্কেটিং ম্যানেজার। আর মিস্টার দত্ত, এ হল বিব্রত, বিব্রত সরকার। নতুন জয়েন করেছে। প্রিসিশন-এসির ফাইলটা ও-ই দেখছে।

— ইন্টারেস্টিং নেম, কোয়াইট আনকমন! নমস্কার।

— ন-অমস্কার।

কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা পেড়ে প্রবাল দত্ত ওর কুষ্টি-ঠিকুজি সব জেনে ফেলল।— 'প্রথমদিনের আলাপেই কাজের কথা বলতে খারাপ লাগছে। তাও-ফাইলটা কিছু এগিয়েছে?'

— আজ্ঞে নো-ওটিং হয়ে গেছে।

— আমাদের কী খবর?

— শেঠিয়া ইলেকট্রিক্যালস্ কো-ওয়ালিফাই করেনি।

ষড়ানন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'কেন?'

— টে-এম্পারেচার রেঞ্জ ম্যা-অ্যাচ হয়নি। আমরা মাইনাস ফাইভ থেকে ষাট ডিগ্রি সে-এন্টিগ্রেড চেয়েছি, উনাদেরটা শূ-উন্য থেকে পঞ্চাশ।

— এই সেন্টিগ্রেডের চক্করটা আবার কী?

'আজ্ঞে, সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়ালস্ টু এফ মাইনাস থার্টি-টু বাই নাইন।' রাশভারী মুখে বিব্রত ওর সব বিদ্যে উগরে দেয়।

'হা হা হা, ভালো বলেছেন। তবে সেন্টিগ্রেড দেখে আপনার গ্রেড কিছু বাড়বে কি?'

প্রবাল দত্ত বিব্রতর দিকে একটা খাম এগিয়ে দেয়, 'রাখুন, দেখবেন পাঁচ ডিগ্রি এমনিই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে।'

বিব্রত ঘাবড়ে গিয়ে ষড়াননের মুখের দিকে তাকায়, সে ইশারায় হ্যাঁ বলে, 'যাও, ফাইলটা নিয়ে এসো।'

প্রায় দম দেওয়া পুতুলের মতো নিজের জায়গায় ফিরে আসে। কিন্তু খামটা ব্যাগে ঢোকাতেই সজোর খোঁচা!

আজ ট্রেন থেকে নেমে হুকটা অন্য পকেটে রেখেছিল। আঙুলের মাথায় কুঁচফলের মতো একফোঁটা রক্ত। ও কয়েক মুহূর্ত ভেবে সটান এসে খামটা ছুঁড়ে দেয় প্রবাল দত্তের সামনে, 'আমার এসব লাগবে না। আর ফাইলের নোটিংও আমি বদলাব না স্যার।'

প্রবাল, ষড়ানন— দুজনেই বেশ অবাক। সিটে ফিরে আসতে তপন বলে, 'অভিনন্দন। ভেবেছিলাম হয়তো শেষ অবধি পারবে না। হুকের গুঁতোয় উতরে গেলে।'

সেদিন ফিরতি ট্রেনে সাধন কর্মকারের মেজাজ বেজায় খাপ্পা, মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়েছিল।

— কী হয়েছে সাধনদা?

— আর কী হবে? ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে। কাল তোমার বৌদির কানের দুল হারিয়েছিল। দুপুরে ফোন করে বলল, সেটা নাকি ওই হতচ্ছাড়া ছেলে হাতিয়েছে। সাহেব আমার লায়েক হয়েছেন। মায়ের গয়না বেচে কী ছাতার স্মার্ট-ফোন কিনেছেন! টিভিতে কোন এক খেলোয়াড় কী এক মেয়েছেলে হাতে নিয়ে দেখাল, ওমনি ছোটোলোকের মতো দোকানে দৌড়াতে হবে? ফোন স্মার্ট হয়েছে আর মানুষ আনস্মার্ট!

— টিভিতে দেখানোর কথা বলছেন, কোনোদিন যদি বকলেস দেখিয়ে বলে— গয়না, পরদিন দেখবেন লোকে তা-ই হামলে পড়ে কিনছে।

সাধন কর্মকার সত্যি-সত্যিই অবাক, 'কী ব্যাপার বলো তো? মুখে তো কথাই ফুটত না, আজ দেখি ফাটিয়ে দিচ্ছ!'...

ঠিক দিন সাতেকের মাথায় পরপর দু-দুটো অঘটন। স্টেশনে সেদিন

ব্রিগেড ফেরত জনতার ভিড়, ট্রেনে ওঠার মুখে ধাক্কাধাক্কিতে কাঁধের ব্যাগটা গেল পড়ে। ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা নেই, মাথা ঝুঁকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করতেই সামনের এক রসিক ভদ্রলোক বলে ওঠে, 'আহা থাক থাক, আর পায়ে হাত দিতে হবে না!'

— না না, আমার ব্যাগটা পড়ে গিয়েছে।

— এই ভিড়ে আর খুঁজে পাবেন না মশায়। বেলঘরিয়া-সোদপুরে ভিড় একটু পাতলা হোক, তখন না হয়—।

— কিন্তু, ব্যাগে একটা জিনিস ছিল যে।

'কী দাদা? প্রেমপত্র না পানুবই?'- ওদিক থেকে আর একজন খোঁচায়।

— বাবার দেওয়া জিনিস।

— তা নিয়ে অফিস গিয়েছিলেন! কী এমন জিনিস?

— ইয়ে, মানে একটা হুক।

— হুক! শালা ইয়ে নাকি!

ওপাশ থেকে একজন বলল, 'বুঝলেন না দাদা? অষ্টধাতুর হুক, হিরে বসানো, প্ল্যাটিনামে গিল্টি করা— উত্তরাধিকার বলে কথা।'

সামনের ভদ্রলোকের প্রায় গলায় ধমক, 'যত্তসব পাগল-ছাগলের দল, একটা হুকের জন্য ট্রেনসুদ্ধ লোককে হাঁকিয়ে মারছে।'

সোদপুরে ট্রেনটা প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু ব্যাগ? সাধন কর্মকার বলে, 'মনে হচ্ছে শিয়ালদা প্ল্যাটফর্মেই পড়েছে, বুঝলে? দাঁড়াও দেখি, আমার ভায়রা রেল-পুলিশে আছে, শিয়ালদাতেই পোস্টিং। ওকে ফোন করি। আজকাল বোমার ভয়ে লোকে বেওয়ারিশ মালে হাত দেয় না। পেয়ে যেতেও পারো।'

সন্ধেবেলায় কাঁকিনাড়ার স্টেশনরোডে বাজার বসে। ভদ্রলোকের রসিকতার মতো সূক্ষ্ম রাস্তা, তারও অর্ধেকটা জুড়ে সবজির ঝুড়ি। অটো, টেম্পো, বাস, রিক্সা, সাইকেল— সব মিলে আনাড়ির ক্যারাম খেলার দশা। শুধু ঠকাঠক আর ঠকাঠক, কেউ আর গলতে চায় না!

সাইকেলে বাড়ি ফিরছে বিব্রত, সাধন কর্মকারের আশ্বাসবাক্যেও ওর দুশ্চিন্তা কাটেনি। হুক নেই, যেন অঙ্গহানি ঘটেছে। মাথায় আকাশপাতাল দুশ্চিন্তা, ডানপাশের মোটরসাইকেলটা যে হঠাৎ ওর দিকে সরে এসেছে — খেয়াল করেনি, উলটোদিকে টেম্পো, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় টাল সামলাতে পারল না, ছিটকে পড়া মাত্র টেম্পোটা প্রায় ওর গায়ে উঠে এসেছিল, তড়িঘড়ি ব্রেক কষায় মাথার ঠিক ফুট-খানেক দূরে থামে!

জ্ঞান ফিরল প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পর। সাইকেল তুবড়ে গেছে, মাথা ফেটেছে, ডানহাতে যা ব্যথা— হাড় ভেঙেছে নিশ্চয়, গুঁড়িয়েও যেতে পারে। অজ্ঞান হওয়ার আগে এই তার শেষ স্মৃতি।

বিব্রত চোখ খুললে দেখে— হাসপাতাল। মাথার কাছে উদ্বিগ্ন মুখে ওর

দাদা। পাশে সাধন কর্মকার।– তার মুখে নিশ্চিন্ততার হাসি, 'যাক, জ্ঞান ফিরেছে।'

সুব্রতর গলায় নেশার চিহ্নমাত্র নেই, 'কেমন আছিস?'

ও ঘাড় নেড়ে জানায়, ভালো।

সাধন কর্মকার হালকা রসিকতার ছলে বলে, 'ব্যাগের দুঃখে অ্যাক্সিডেন্ট বাধিয়ে বসলে ভাই? এই যে তোমার ব্যাগ, পাওয়া গেছে। শুধু ছাতাটা বোধ হয় মিসিং।'

শরীরের সব যন্ত্রণা এক নিমেষে উধাও। ও ব্যাগ হাতড়ে হুকটা নিয়ে বুকে চেপে ধরে!

কাণ্ড দেখে সাধন কর্মকার কিছুটা অবাক, 'ও এখন রেস্ট করুক। চলো, আমরা না হয় পরে আসব।'

ঘরের এককোণে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিল অসীমা। বাকি দুজন বেরিয়ে যেতে কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে আসে, 'মাফ কোরো ঠাকুরপো, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। তাই।' অসীমার গলা ধরে আসছিল। কথাটা শেষ করতে পারে না। প্রায় দৌড়ে যায় দরজার দিকে।

হুকটা বেডের মাথার কাছে ঝোলানো। শরীরে ব্যথা থাকলেও ওর মন বেশ হালকা। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসছে।...

— কেমন আছ?

চোখ মেলে দেখে— সুমিত্রা। আবার সেই পুরনো বিব্রত, সেই দ্রুত হৃৎস্পন্দন, দু-কান-বিস্তৃত বোকা হাসি।

— কী গো, কেমন আছ?

— ভা-আলো।

— ডাক্তার কী বলল?

— ভালো।

— আবার সেই 'ভালো-ভালো'? ধুর, তোমাকে দিয়ে যদি—! কী-কী ওষুধ দিয়েছে দেখি।

বিব্রতর কানে কোনো কথা ঢুকছে না। সুমিত্রা ওষুধ দেখছে আর ও মুগ্ধচোখে দেখছে সুমিত্রাকে। এই প্রথম এত কাছে। সুন্দর একটা গন্ধ, আকাশ-নীল সালোয়ার। ... ওড়নাটা একটা কিছুতে জড়িয়ে গিয়েছিল, সুমিত্রা কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না, 'যাহ্, আটকে গেছে। কী এটা? হুক! এখানে কী করে এল? ধুর বাবা, একটু ছাড়িয়ে দাও না প্লিজ।'

পরম শান্তিতে চোখ বুজে আসে বিব্রতর।

— থা-আক না।...

*****

'দেশ', ২০১৫

ডুবসাঁতার

আখরিগঞ্জে রাত নামলে পদ্মার এপার থেকে রাজশাহী স্টেডিয়ামের আলো দেখা যায়। আগে আরও কাছাকাছি ছিল, পদ্মার প্রতি বছরের ভাঙনে দূরে সরে গিয়েছে। নদীর মাঝামাঝি নয়াচর— দু-দেশেরই দাবি, সেটি তাদের।

তবে এই কোন্দলের সালিশি নিয়ে এলাকার মানুষের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। সীমানায় এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে এপারের মানুষ জন খাটতে ওপারে যায়, বা ওপারের ছাত্র আসে এপারের স্কুলে পড়তে। উলটোটাও হয় অনেক সময়।

এদিকে, ক-দিন যেতে না যেতেই এপার-ওপারের বেশ কিছু মানুষ নয়াচরে আস্তানা পেতে ফেলল। এরা সবাই হেঁতালগাছের মতো, যতই কাটো আর যেখানেই ফেলো, মাটির স্পর্শ পেলেই শিকড় গজাতে সময় লাগে না!

বর্ষাকালে পদ্মার অলক্ষুনে মেজাজ আছে। দু-দেশের রক্ষীদের 'খাজনা'র তাগাদা আছে। আর আছে চোরাচালানকারীদের নিত্য আনাগোনা। তারা অবশ্য অন্নদাতাও বটে, কারণ চোরাচালান এখানকার বহু মানুষেরই মুখ্য জীবিকা।

ট্রাক বইতে পারে এমন বড়ো-বড়ো নৌকায় প্রতিদিন শয়ে শয়ে গরু, বস্তা-বস্তা চাল ওপারে যায় ক্ষিদে মেটাতে। আর ওপার থেকে শস্তা জামা-কাপড় আসে লজ্জা ঢাকতে— আদিম বিনিময় প্রথা। নৌকার খোলে বা তলায় ত্রিপলে মোড়া চোরাই মোটর-সাইকেলের ইঞ্জিন যায়। ফেরত আসে সস্তার পাম্পসেট। দু-দেশের রক্ষীরা যথেষ্ট দয়াশীল। মানুষ পিছু দশ, চালের বস্তা পিছু পঞ্চাশ, গরু পিছু একশ বা ইঞ্জিন পিছু শ-পাঁচেক টাকার 'মাধুকরী' চুকিয়ে দিলে তারা সাধারণত খুব একটা ঝামেলা করেনা। এই লাইনে পুরুষের তুলনায় অল্পবয়সি মহিলাদের চাহিদা বেশি। রক্ষীদের 'অন্যকিছু' দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যায়, টাকা বাঁচে।

নয়াচর থেকে প্রায় পনেরো-ষোলো মাইল দূরে গ্রাম্য মফঃস্বল এই সুবর্ণমৃগী। নামে হরিণীর চাঞ্চল্য থাকলেও জীবন এখানে বড়োই শান্ত। তেমনই নিস্তরঙ্গ রাত। তবুও মাঝেমাঝে শ্যামলের এমন হয়। সারারাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারে না। প্রায় কুড়ি বছর আগের সেই সময়টা যেন চোখের সামনে স্বপ্নের মতো, ছায়াছবির মতো ভেসে ওঠে।

ভাগীরথীর বুকে সাঁতার প্রতিযোগিতা। ও তখনও স্কুলছাত্র। গঙ্গানদী

যে চত্বরে পদ্মা-ভাগীরথীতে দু-ভাগ হয়েছে,— সেই আহিরনের ঘাট থেকে শুরু করে জঙ্গীপুর, লালগোলা, গয়েসবাগ, সীতেশনগর, জিয়াগঞ্জ, নশীপুর, লালবাগ, কাশিমবাজার হয়ে বহরমপুর গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত একাশি কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা। সেদিন স্কুলের প্রায় জনা চল্লিশেক সহপাঠী, সাত-আটজন মাস্টারমশাই, এমনকী স্বয়ং হেডমাস্টার রমেশবাবু হাজির হয়েছিলেন জিয়াগঞ্জের সদরঘাটে। পরে শুনেছে, মাইকে যখন ঘোষণা হচ্ছিল, 'আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে এই মুহূর্তে তৃতীয়স্থান দখল করে থাকা প্রতিযোগী ব্যাজ নাম্বার সাতাশ, এই জেলার গর্ব শ্যামল মণ্ডল।'– ওদের সে কী উন্মাদনা! স্বভাবত রাশভারী পঞ্চাশোর্ধ্ব রমেশবাবুও নাকি কিছুক্ষণের জন্য নিজের শৈশব ফিরে পেয়েছিলেন। কাশিমবাজার ঘাটের কাছাকাছি এসে শরীর যেন আর টানছিল না।

ঝিরঝির বৃষ্টিতে ভাগীরথীর হিমশীতল জল যেন সারা গায়ে কেটে-কেটে বসছে। তখনও প্রায় পাঁচ কিলোমিটার বাকি। ও তখন দ্বিতীয় স্থানে, বেশ কিছুটা এগিয়ে সদ্য ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া বিখ্যাত সাঁতারু আনিসুর আলম বৈদ্য। লাইফবোট থেকে গেমস্ টিচার সুবীরবাবু ক্রমাগত চেঁচিয়ে চলেছেন 'কাম অন শ্যামল, হাল ছাড়বি না, জিততেই হবে তোকে!'...

মাত্র চৌদ্দো বছর বয়সে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া সাঁতারুর সঙ্গে যুগ্মজয়ী হওয়া মুখের কথা নয়। স্বয়ং জেলাশাসক ওর হাতে মানপত্র তুলে দিয়েছিলেন। প্রথমস্থানের জন্য সোনার মেডেল ছিল মাত্র একটা। হাসিমুখে ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল আনিসুর আলম। বাকিটুকু স্বপ্ন!

স্বপ্নই তো। মানপত্রটা বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন রমেশবাবু। বছর দশেক আগে কাঁচ ভেঙেছে। বছর পাঁচেক আগে ফ্রেম। এখন 'লোকনাথ বস্ত্রালয়' লেখা পলিথিন গায়ে চাপিয়ে মুখ লুকিয়েছে ট্রাঙ্কের এককোণে। মেডেলটাও হারিয়েছে। গেমস্ টিচার সুবীরবাবু পৃথিবীর মানচিত্র খুলে দেখিয়েছিলেন— 'এই হল ইংলিশ চ্যানেল, একদিন তুই...'

সময়ের মারে জীবন এমন এক বিন্দুতে থমকে গিয়েছে, যাকে পৃথিবী দূরে থাক, দেশ কী রাজ্যের মানচিত্রেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় শ্যামল। পেরেকে ঝোলানো জামা। অন্ধকারে পকেট হাতড়ে বিড়ি-দেশলাই খুঁজে নেয়। কাঠি ঘষার শব্দ হতেই চাপা স্বরে সাধনা বলে, 'এত রাতেও তোমার বিড়ি ধরাতে লাগে? সাতসকালে আবার গণেশপুরে যাওয়ার আছে। ছেলেটা ঘুমায়। বিড়ির গন্ধে তার ঘুম ভাঙ্গাইয়ো না, ঘরের বাইরে গিয়া ধোঁয়া গেলো।'

ঘুমোয়নি সাধনা। পরদিন সকালে যার অনিশ্চিতের পথে যাত্রা শুরু, তার চোখে কি আর ঘুম আসে? গণেশপুরে ওর বাপের বাড়ি। সেখানে খোকাকে রেখে টুম্পাদির সঙ্গে যাবে আখরিগঞ্জ। বেশ কিছুদিন ধরে টুম্পা ওকে বারবার প্রস্তাবটা দিচ্ছিল। সাহসে কুলোয়নি। কোথাও একটা বাধছিল যেন।

সেদিন রোজের মতো আচার, পাঁপড়, কাসুন্দি, বড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল

ও। আগেরদিন অনেক রাত অবধি কাঁচা আম কেটে, কলাই ডাল ভিজিয়ে, প্রায় চার-পাঁচ কেজি বেসন মাখতে মাখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে ভোর চারটে বাজলেই খোকা খিদের চোটে কাঁদতে শুরু করে। ঘুম হয়নি। কোনোমতে শরীরটা টানতে টানতে বাড়ি ফিরেছে। রান্না করে নাকে-মুখে দুটো গুঁজতে না গুঁজতেই পাঁপড় বেলার সময় হয়ে যায়। রোদ থাকতে থাকতে কাজ শেষ না হলে সব কাঁচা থেকে যাবে।

খোকার সবে আটমাস। যখন-তখন ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করে। তাকে কোলে নিয়েই বেলতে শুরু করেছিল সাধনা। রুগ্নসন্তান বুকের কাছে ছটফট করে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে সামাল দিয়ে আবার চাকি-বেলন।

– ওকে আমার কোলে দে।

মুখ তোলে সাধনা, 'আরে টুম্পাদি, কখন এলা?'

– এই এখনই। ... ইশ্, কী দশা করেছিস ছেলেটার! সারা গায়ে বেসন মাখিয়ে-। তোর বর কোথায়?

'জানিনা।'– রাগের গলায় উত্তর দেয় সাধনা।

– হ্যাঁ রে, সে আর কোনো কাজ পেল না? শেষে কিনা পুকুরের ডুবুরি!

– কী করি বলেন দিদি? কথায় আছে— কায়েত কলম চিনে, রাজায় চিনে ভূম। আইগিলাই দুই ঠেঙ্গ চিনে, নাইপ্‌তা চিনে লোম।

– আর কিছু পারে না?

– ছাই পারে! হাতে-পায়ে ধইরা রহিমশেখের দোকানে কাজটা জোগাড় করলাম। ল্যাখাপড়া তো শিখছিল একদিন। কিন্তু হিসাব রাখতে কইলে রোজ যোগে ভুল করে। তাঁত কইলে ছাপাশাড়ি দেখায়, সিল্ক কইলে টাঙ্গাইল ধইরা টান দেয়। জন খাটতে গ্যালে মজুরিতে ঠইক্যা আসে। সাঁতার দিয়ে কবে নাকি একখান সোনার মেডেল পাইছিল। হাজারবার শুনাইছে সে কথা। কিন্তু, ঘরে সোনা তো দূরে থাক, এককুচি ইমিটেশনও দেখি নাই আজ অবধি।

– রোজগারপাতি কিছু হয়?

– ছাই হয়। হইলে কি আর ছেলেরে কোলে গুঁইজা পাঁপড় বেলতে লাগি? ওই তো ওইটুক পুকুর। কয়জনই বা যায়, কয়জনেরই বা সোনাদানা হারায় যে ডুবুরির ডাক পড়বে? এই সুবর্ণমিরগিতে কারই বা ভরি-ভরি সোনা আছে?

– এই ভাবে কি তোর ছেলের অপারেশনের টাকা জমাতে পারবি?

মুখ কালো হয়ে আসে সাধনার। টুম্পা বলছিল, 'সেই কথাটা আর একবার ভেবে দেখিস। তুই বললেই আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

সাধনা অসহায়ের মতো নিজেদের আবাসের দিকে তাকায়। অভাব অনটনের পূর্ণগ্রাসে বাড়িটার যেন ক্ষুধার্ত চেহারা। বাইরের দেওয়ালে প্লাস্টার নেই। ভেতরে স্যাঁতসেঁতে, ফুলে ওঠা, ঝরতে থাকা অতিবৃদ্ধ চুনকাম। বারান্দার ছাদ থেকে হোল্ডারটা ঝুলছে ইলেকট্রিক বাল্বের সঙ্গে প্রায় দু-বছরের বিরহযন্ত্রণা বুকে। বড়ি-পাঁপড়ের ব্যবসার সৌজন্যে ডাল-ভাতটা জুটে যায়। কিন্তু, ওদিকে

খোকা জন্ম থেকেই ভুগছে। ডাক্তার বলেছে, হার্টে নাকি কী একটা সমস্যা, চিকিৎসার জন্য লাখখানেক টাকার দরকার।

প্রবল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খুব রাগ হয়। বিড়বিড় করে ওঠে— 'পোলাপানদের সাঁতার শিখাইয়া দু-বেলা অন্ন জোটানোও মুশকিল হইত, তাও কিছু কই নাই। কত শখ থাকে মাইনষের, এক-আধটা শাড়ি, সিনিমা-বায়োস্কোপ। কোনোদিনও মুখ ফুটে চাই নাই। কোলের ছেলেটার চিকিৎসা দরকার। কইলাম, কিছু একটা কাম-কাজ করো। ওই পুকুরের জলে নিজের সারাটা জীবন ভাসাইয়া, সংসার ডুবাইয়া শেষে কিনা ধরল ডুবুরির কাজ! আজ অবধি পাঁচপয়সাও কি ঢুকছে ঘরে? ওই পুকুরই একদিন সবকিছু গিলবে।'

মহাদেবের দোকানের বেঞ্চে বসেছিল আবদুল হোসেন। পঞ্চায়েত প্রধান। তার ডাকে হাঁটা থামায় সাধনা।

– এই বৃষ্টি-বাদলায় অন্ধকারে বেরিয়েছিস ক্যানে? সাপের ভয় নাই?

– দেখেন না, রাত নামছে তবু ঘরে ফিরনের নাম নাই। দুপুরে খাইতে অবধি আসে নাই।

– নিজের ঘরের লোককেও চিনিস না! দেখ গিয়ে, পুকুর ধারেই বসে আছে। ... ছোঁড়াটা মাছ হব-হব করে মানুষ হয়ে জন্ম লিয়েছে।

– আমি যাই মামা?

সাধনা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। আবদুলমিঞা হাতঘড়ি দেখে। না, ইঞ্জিনিয়ার আজ আর আসবে না। বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছে বোধ হয়।

...

টুম্পা বহুদিন ধরে আখরিগঞ্জ-রাজশাহী করছে। লাইনের সবকিছু তার জানা। তবু তার সঙ্গে যেতে প্রথমে সায় পাচ্ছিল না সাধনা। এখনও যে পুরোপুরি মনস্থির করে ফেলেছে, তা নয়। আর তাছাড়া ওর যত টাকার প্রয়োজন, চাল বা কাপড়ে হবে না। ঘড়ি, মোবাইল, সিমকার্ড, চোরাই গয়না— এসব ধরতে হবে।

তবে আসল জিনিস হল হেরোইন। এই জিনিস পার করতে মেয়েরাই সম্বল। তিন-চার প্যাকেট তলপেটে অন্তর্বাসে গুঁজে খুব সাবধানে বর্ডার পার করতে হয়। প্যাকেট-পিছু পাঁচশটাকা রোজগার। শুধু ভিড়ে মিশে থাকার জন্য লোকদেখানো চালের পোঁটলা রাখতে হয় হাতে।

সাধনা হিসেব কষতে চেষ্টা করে, 'এক-একবারে চার প্যাকেট, তার মানে দুই হাজার। চার-পাঁচ মাসে কি একলাখ হইব? কয়বার বরডার পার হইতে লাগব তার লগে? যা হয় হোক, কিছুটা তো হইব, বাকিটুক না হয় বাড়িখান বন্দক রাইখ্যা-।'

খোকা সকালবেলায় কান্না ধরলে কিছুতেই থামতে চায়না। অনেক দূর যেতে হবে, সকাল-সকাল রওনা দিতে না পারলেই মুশকিল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, 'মর, তুই কাইন্দা মর। শয়তান পোলাতে হাড়মাস কালি কইরা খাইল!'

শ্যামল ক্ষীণ গলায় আপত্তি জানায়, 'শুধু-মুধু খোকারে গালি দিতাছ ক্যানে?'

– গালি ও-রে দিই না, দিই আমার কপালরে। ও কি আর বাঁচনের জন্যি আইছে! আইছে আমারে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া আধমরা করতে। সবই আমার কপালের দোষ। এমন সংসার যেন শত্তুরের ভাগ্যেও না জোটে।

কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে লুঙ্গির কষি থেকে তিন আঙুল লম্বা একটুকরো সোনার হার বের করে শ্যামল।– 'এই দিয়া কিছু হয় না? খাঁটি সোনা।'

সাধনা কপাল কুঁচকে তাকায়, 'কোত্থেকে পাইলা?'

– গেল বিষ্যুদবার দত্তবাড়ির ছোটোজামাইয়ের গলার হারখান পুকুরে হারায়ছিল। খুঁইজা দেওনের সময় ছিইড়া রাখছি। টের পায় নাই।

কোনো কথা না বলে হারের টুকরোটা তোরঙ্গে ঢুকিয়ে রাখে সাধনা। শ্যামল অপরাধীর মুখে দাঁড়িয়ে। 'কই কি, বর্ডারে না যাইলে হয় না? শুনছি ওখানে মাইয়াগো আব্রু থাকে না।'

ও উত্তর দেয় না। চোখ ফেটে জল আসছে। লোকটা বোকা ছিল, অকম্মা ছিল। কিন্তু, চোর ছিল না। না, আর কোনো দোনামনা নেই।

ট্রেন থেকে নেমেই প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানের পাশে উদ্ভট সাইনবোর্ডটা চোখে পড়েছিল অরিজিতের। 'ডুবুরি-ডুবুরি-ডুবুরি। পুকুরঘাটে, নদীতে হারানো সোনা-রূপার গহনা যত্ন সহকারে খুঁজে দেওয়া হয়। যোগাযোগ: হাবুলের চায়ের দোকান।

বিজ্ঞাপনটি বেশ মজার। ডুবুরি মহাশয়ের অবস্থা যে মোটেই সুবিধের নয়, সেটা পরিষ্কার। যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে 'হাবুলের চায়ের দোকান'-এর উল্লেখ দেখে বোঝা যায় , বিজ্ঞাপনদাতার একটা মোবাইল জোটানোরও সঙ্গতি হয়নি। কত লোকের কত রকম পেশা থাকে। অরিজিৎ ভাবে, ঘরের ইঁদুর-আরশোলা মারাও তো অনেকের পেশা। গালভরা নাম পেস্ট কন্ট্রোল।

অরিজিৎ নিজে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। পেশার কারণে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নানান দেশ ঘুরে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের প্রোজেক্টে। তিনজন জুনিয়রও এসেছে সঙ্গে। সফরের উদ্দেশ্য মূলত দুটি— প্রোজেক্টের জমি নির্বাচন আর সেই সঙ্গে কিছু মাপজোখ। 'সুবর্ণমৃগী থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট' ওর স্বপ্ন। সফল রূপায়ণ মানে মুকুটে উজ্জ্বলতম পালকটি যোগ হওয়া। মুহূর্তের জন্য একটা বিজাতীয় চিন্তা ধাক্কা দেয়,– প্রতিটি পালক মানে কোনো না কোনো পাখির রক্তপাত।

এখানে আসার পর থেকেই দেখেছে, লোকজনের কথায় ওদের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।— 'সাহেব কি গেরামের রাস্তা চিনতে পারবেন?' 'সাহেব কি এই বেঞ্চিতে বসতে পারবেন?' 'গাঁ-গেরামের জল কি সাহেবের পেটে সইবে?' 'ফ্যাকটারির নাম করে সাহেব কি পুলিশ দিয়ে গেরামছাড়া করাবেন?' মাঝে মাঝে মনে হয়, কোথাও কিছু একটা ফাঁক থেকে যায়নি তো? আর ফাঁক থেকে ফাঁকি?

আবদুল হোসেনের বাড়িতে বসেছিল সে। এলাকার লোকজন, বিশেষ করে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত লোকজনকে পাশে না পেলে কোনো প্রোজেক্টই যে সফল হয় না, তা ভালোভাবেই জানে।

গতকালই আসার কথা ছিল। জলকাদার রাস্তায় গাড়ির সাইলেন্সার বিগড়ে যা-তা কাণ্ড। আসা তো হয়-ই নি, উলটে জল ঠেঙিয়ে ইরিগেশন ডাকবাংলোয় ফিরতে ফিরতে রাত ন-টা বেজে যায়।

আপাতত গত একঘণ্টা ধরে সে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনাটা মোটামুটি সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছে। গ্রামের লোকের কৌতূহল অনেক এবং অদ্ভুত। একজন প্রশ্ন করে, 'হাতের কাছে লালবাগ-জিয়াগঞ্জ থাকতে আপনারা পাড়াগাঁয়ে ফ্যাকটরি খুলবেন ক্যানে?'

– প্ল্যান্টের জন্য লাগে ফাঁকা জমি। লালবাগ-জিয়াগঞ্জের মতো মফঃস্বল শহরে অত জমি তো নেই, তাই। আর প্রোজেক্টটা একবার শুরু হতে দিন, তখন কি আর সুবর্ণমৃগী পাড়া-গাঁ থাকবে? দেখুন না, হল্ট স্টেশন জাংশান হল বলে।

শহরের 'পড়ালিখা করা' লোকদের এরা সমীহ করে, ঠিক বিশ্বাস করে না। প্রশ্নকর্তা বুঝতে পারছিল না, ভবিষ্যতের এই ছবি সুখের না ভয়ের। আবদুল হোসেন হেসে বলে, 'কী জানেন সাহেব, এককালে গেরাম দিয়ে শহর ঘিরার কথা শুনেছি। এখন শুনি লোকে শহর দিয়ে গেরাম ঘিরতে চায়! শুনলাম গাঁয়ের পুকুরটা নাকি আপনার বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভিতরে পড়বে?'

– সম্ভাবনা আছে। তবে চিন্তা নেই। তেমন কিছু হলে আর একটা পুকুর কাটিয়ে দেওয়া হবে।

– গাঁয়ে পাঁচ-ছ-ঘর জেলে আছে। তাদের কী হবে?

– কেন, নতুন পুকুরে মাছের চাষ করলেই হল। সে আমরা না হয়-।

– পুকুরে মাছের চারা ছাড়লে ছয়-সাত মাস লাগে পাকাপোনা হতে। তদ্দিন তারা খাবে কী? কথাটা বিবেচনা করবেন।

কিছুটা সময় গেল। এখন ভিড় অনেকটা পাতলা। বোরখা-পরা একজন মহিলা চা দিয়ে গিয়েছে। প্রথমবার চুমুক দিয়েই বমি আসে। চা তো নয়, চিনির সরবত! ওষুধ গেলার মতো এক চুমুকে প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে ফেলে।

– সাহেবের বাসা কি কোলকেতায়?

– হ্যাঁ। তবে কাজের জন্য অনেক জায়গা ঘুরতে হয়।

– কোথায় কোথায়? দিল্লি, বোম্বাই-?

– আরও অনেক জায়গায়।

– বাহ, আপনি দেখি পুরো দুনিয়া ঘুরেছেন! রাজনীতি-টীতি কিছু করেন? কোন পার্টি?

'সরি, আমি ওসবের মধ্যে নেই।' ও হাসার চেষ্টা করে, 'আপনারা?'

– আমরা ধরেন সবকিছুই। সে কি আজকের কথা? সেই সত্তর-বাহাত্তর সাল। আমরা ছিলাম তিন ভাই। বড়োভাই ধরেন বরাবরের জন্তা। ঘরে এক-

আধটা কমরেড থাকা ভালো। ছোটোভাই গেল সেদিকে। আমি আর যাব কুতি? মুক্তিসূর্যের দিকে মুখ ঘুরালাম।

অরিজিৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। নিজেকে কোনোমতে সামলে বলে, 'আপনার ছেলেমেয়েরা?'

– দুই ছেলা এক মেয়া। বড়োটা আছে আমার লাইনেই। ছোটোটা লালে ছিল, জোড়া-ফুল ধরেছে। মেয়া কোলকেতায়। 'ইস্‌কটিসে' পড়ছে, 'এসুসি' করছে, বিয়া দেয়ার দায়িত্ব উয়াদের।

এর উত্তরে কী বলা উচিৎ জানা নেই। অরিজিৎ চুপচাপ বসেবসে উসখুস করতে থাকে।

– আপনার কি লেট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব?

ক্যাম্পের বাইরে মাটিতে ভাবলেশ শূন্য হয়ে বসে আছে সাধনা। পতিতপাবনী মা গঙ্গা পদ্মা-রূপে বইছে আপনমনে। সরকারি বোল্ডারের বাঁধন ভেঙে মাটির চাঙড় ঝুপঝাপ আছড়ে পড়ছে নদীর বুকে। কিছু দূরে এক আধপাগলি বুড়ি প্রবল আক্রোশে পাথর ছুঁড়ছিল নদীর বুকে, 'রাক্ষুসী, সব গিলেও তোর শান্তি নাই রে? ঘর খেয়েছিস, জমি খেয়েছিস, ছেলেটাকেও গিললি নিমকহারাম মাগী!'

প্রায় তিনঘণ্টা পর ছাওনি থেকে টুম্পা ফিরল। খোঁড়াচ্ছে।– 'উফ, শয়তান মিলিটারিগুলা গায়ে-গতরে ব্যথা করে দিয়েছে রে। একটানা সাত-সাতজন, শালাদের শিরায়শিরায় যেন ভাঁটির আগুন! চল, একটু আদা দেওয়া চা খাই, এতটা রাস্তা যেতে হবে আবার।'

চায়ের গ্লাসটা হাতেই ধরা, সাধনা চুমুক দিতে পারছে না। বুকটা এখনও টনটন করছে। 'সেরাচ' করার নামে ওর সারা শরীর ময়দা-ঠাসা করার পর হঠাৎ বুকটা সজোরে মুচড়ে ধরেছিল ওদের একজন। সাধনা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠেছিল। ব্লাউজের ওপর কয়েক ফোঁটা দুধ ফুটে উঠতে সে কী অসহ্য অসভ্য অঙ্গভঙ্গি সেপাইগুলোর! কেউ যেন গনগনে কয়লা চেপে ধরল দু-কানে। অন্য একজন ওর শাড়ির গিঁটের দিকে হাত বাড়াতেই প্রায় রে-রে করে ওঠে টুম্পা, 'ওকে ছেড়ে দ্যান স্যার। ওর মাসিক। আমাকে বলেন।'

ওরা দুজন বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগোয়। সাধনার কান্না পাচ্ছে না, ঘেন্নায় মরতে ইচ্ছে করছে। পরমুহূর্তেই খোকার মুখখানা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ব্লাউজের মধ্যে আজকের রোজগারের টাকা ক-টা ঘামে ভিজে গিয়েছিল। ও টাকাগুলো আঁচলে বাঁধে।

স্ট্যান্ডে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। টুম্পা ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট ওর হাতে দেয়। জিনিসটা ওর চেনা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনা পয়সায় বিলি হয়। টুম্পা বলে, 'এটা রাখ। রোজ রোজ তো আমি বাঁচাতে পারব না। এ লাইনে এসব একটু সহ্য করতে হয়। ওই মিলিটারির কোনো ভরসা নাই। পেটের সঙ্গে রোগও বাধিয়ে দিতে পারে। ... কী রে, গুমরে আছিস কেন? লজ্জা করিস না। কয়েকবার এলেই

দেখবি আর গায়ে লাগছে না। আরে পাগলি, লজ্জা-শরম বড়োলোকি ব্যাপার-স্যাপার। প্রাণেই যদি না বাঁচি, লজ্জা কি চিতায় ঢালব?'...

গণেশপুর থেকে ফিরে প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে স্নান করেছে সাধনা। ধুঁধুলের ছোবড়া দিয়ে সর্বশক্তিতে সারা গা ঘষেছে পাগলের মতো। ওই লোকগুলো যেন ওর শরীরে আলকাতরার কালি ঢেলেছিল একরাশ। হাজার মগ জল ঢেলেও মনে হচ্ছিল, এই শরীরে ঘরে ঢুকবে কেমন করে?– ঘরে তো মা লক্ষ্মীর আসন!

এতক্ষণ জলে ভিজে এখন জ্বর-জ্বর লাগছে। নুনছাল উঠে সারা গা জ্বলছে। কোনোমতে ভাতে ভাত রেঁধে শুয়ে পড়ে সাধনা। ওর খিদে নেই। খোকার চোখে ঘুম নেই। নেই ঘুম পাড়ানোর তাগিদ। আপন খেয়ালে হাত-পা ছুঁড়ছে খোকা।

সন্ধে নেমেছে, আর সেই সঙ্গে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। ভেতরের ঘরে ইফতারে বসেছিল আবদুলমিঞা। কান সজাগ হয় তার। বাইরে কে যেন ডাকছে। একটা খেজুর আর একচুমুক জল মুখে ফেলে বিরক্ত মুখে দরজা খোলে।

– আরে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! এই অবেলায়? ভিতরে আসেন।

– সাহায্য লাগবে আবদুলসাহেব, খুব জরুরি। এখানে একজন ডুবুরি আছে না? চেনেন?

– ক্যানে চিনব না? ও তো আমাদের শ্যামলা। সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান ছিল। ব্যাপার কী?

– আর বলবেন না, আজ পুকুরের দিকে সার্ভে করছিলাম। একটা যন্ত্র জলে পড়ে গিয়েছে। আমরা খোঁজাখুঁজি করেছি, পাইনি। ওই ডুবুরি লোকটি যদি-?

– রাতের বেলা কি সেও কিছু করতে পারবে? কাল সকালে হয় না?

– আমাদের কাছে পাঁচব্যাটারির টর্চ আছে। দরকারে গাড়ির হেডলাইট জ্বালানো যাবে। প্লিজ্ হোসেনসাহেব, এখন পাওয়া গেলে হয়তো বা নষ্ট হবে না। কিন্তু, সারারাত জলের তলায় পড়ে থাকলে ওটা পুরোপুরি ড্যামেজ হয়ে যাবে। ডিজিটাল থিয়োডোলাইট। খুব দামি যন্ত্র।

রাতের বেলা পুকুরে ডুবুরি নামানোর কথা আজব ঠেকলেও যন্ত্রের নাম শুনে আবদুলমিঞার মনে হয়— ব্যাপারটা বেশ গুরুতর হয়তো। দু-চারজন লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই। ভিড়ের মধ্যে একজনকে হাঁক দেয় সে, 'হারাণ, শ্যামলাকে খবর দে তো। সাপ-খোপ দেখে যাস বাপ।'

পুকুরপাড়ে বসেছিল শ্যামল। আঙুলের ফাঁকে পাঁচশ টাকার নোট। মাথার চুল থেকে টপটপ জল ঝরছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গাড়ি 'ইস্টার্ট' দিয়েছে। তিনি খুব খুশি, কথা দিয়েছেন, 'পোরজেক্‌ট' শুরু হলে সেও 'ফ্যাকটিরি'তে কাজ পাবে।

মাঝপুকুরের একটা বিশেষ বিন্দুতে ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। চোখে-মুখে

অদ্ভুত উত্তেজনা। ঘরমুখো ভিড় থেকে একজন শুধায়, 'ওই শ্যামলা, বাড়ি যাবিনা?'

– আপনি যান কত্তা, এট্টু জিরায়েনি।

যন্ত্রটা বিলক্ষণ ভারী হলেও গড়িয়ে অনেকটা দূর নেমে গিয়েছিল। সেটা কথা নয়।– খোঁজার সময়কী যেন ঠেকল ওর পায়ে, একটা চাকতিমতো, ধাতুর! মুহূর্তের জন্য একটা অসম্ভব আশায় নেচে উঠল বুক। কিন্তু, দম ফুরিয়ে আসছিল, আর পুকুরপাড়ে অত লোকের ভিড়!

ওর সঙ্গে পড়ত এনামুল। ফার্স্ট হত বরাবর। একদিন মাঠ থেকে ফেরার পথে তাকে সাপে কামড়ায়। শেষ সময়ে ওর হাত ধরে বলেছিল, 'মাফ করিস ভাই, সাঁতারে জিতার পর চারদিকে শুধু তোর নাম শুনে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরতাম। তাই একদিন তোর ব্যাগ থেকে মেডেলটা চুরি করে ফেলে দিয়েছিলাম পুকুরে। মাফ করিস।'

এতদিনে কতবার যে খুঁজেছে! পুকুরপাড় ফাঁকা হতেই ও জলে ঝাঁপ দেয়। পাড়ে বসেই মেপে নিয়েছিল জায়গাটা। কিন্তু, কোথায় গেল? এখানেই তো ছিল! একটা হিলহিলে সাপ কোমর ছুঁয়ে যায়। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই শ্যামলের, পাগলের মতো হাতড়ে চলে পুকুরের নীচের পচা পাঁক। শ্বাস ফুরিয়ে আসছে, জল ঢুকছে নাক-মুখ দিয়ে। খুব কান্না পাচ্ছে 'হায় ভগবান, আবার হারাইল?'

যেন নিজের শবদেহ নিজেই বইতে বইতে ঘরে ঢোকে শ্যামল। সারা দেহে কাদা, শ্যাওলা। ইঞ্জিনিয়ারসাহেবের দেওয়া টাকাটা নিঃশব্দে সাধনার মাথার কাছে রেখেই ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে। ঠিক যেন আর একটা ধ্বস নামে পদ্মার বুকে।

দু-হাঁটুর মধ্যে গোঁজা মাথাটা মাঝেমাঝে কেঁপে উঠছে। সাধনা হ্যারিকেনের তেজ বাড়ায়, 'কী হইল? শুনতাছো? কই গো, উত্তর দ্যাওনা ক্যান?'

ও শ্যামলের দু-কাঁধ ধরে অল্প ঝাঁকুনি দেয়, 'কী হইছে তুমার? দত্তগো হারের ব্যাপারডা জানাজানি হইছে নাকি? কেউ কিছু কইছে?'

শ্যামল কোনোমতে মাথা নাড়ে,– না। ওর চোখদুটি অস্বাভাবিক রকম লাল। 'আজ পুকুরে ডুব দিয়া মেডেলখান হাতে ঠেকেছিল। বাবা কয়েছিল দুই-তিন ভরি হইব। ভাবছিলাম, তুমার... তুমার আর বরডারে যাওন লাগব না। আবার হারায়ে গেল।'

দুপুর থেকে সাধনার দু-চোখে যেন শুখার মরশুম। তবে, শ্যামলকে কাঁদতে দেখে ওর চোখেও মেঘ জমছিল। আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রুত চোখ মুছে নেয়। 'কাইন্দো না। কপালে নাই, কী করবা কও? আর তাছাড়া পাইলেও তো আর এক ঝঞ্ঝাট। বেচতে যাইলেও পাঁচ লোকের দশ কথা। কী করে পাইলি? শ্যাষে আবার থানা-পুলিশ! বেইচা অতগুলান টাকা একলগে আনোনও তো আর এক ভ্যাজাল, রাস্তায় চোর ছ্যাচড়া পকেটমার কি কম!– ভালোই হইছে।'

ও শ্যামলকে বুকে টেনে নেয়, 'এখনও কাঁদতাছ ক্যানে? ইঞ্জিনিয়ার

সাহেবরে কাজের কথা শুধাইছো?’

– হ।

– কী কইলেন তিনি?

– অরাজি হননি। পোরজেক্‌ট শুরু হইলে ডাকবেন কইছেন।

– তা হইলে আর চিন্তা কী? আর তো মাত্তর কয়েক মাস। তারপর...

খোকা তখনও শুয়ে শুয়ে হাত-পা নাড়ছিল। সাধনা বলে, ‘কেমন হাত-পা ছুঁড়তে আছে দেখো!– য্যান্‌ নদী পারাইতে আছে। অরে সাঁতার শিখাইবা?’

শ্যামল উত্তর দেয় না। সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে সাধনাকে।

*****

‘সংবর্তক’, ২০১৪

বেহেশ্ত

– এ কী রে হাবলা, সারা গা তো ফালাফালা করে ফেলেছিস!

– উ কিছুক লয় দাদাঠাকুর। কাটে বুলেই না ট্যার পাই শরীলের খুন এখুনো হ্যাজেনি খো।

– এক-একটা কাণ্ড করিস বটে! দাঁড়া, লাল ওষুধ দিচ্ছি, লাগিয়ে নে।

– শুধুমুধু ওষুধ খরচা করেন ক্যানে। এইটুকুন 'খাম, গাঁদাপাতা থেঁতলি লাগি দেলে এক বেলায় মিলায় যায়। এক মুঠ মুড়ি দ্যান না হয়, গালে ফেলি কাজটুক সম্পন্নে করি। ইউরিয়া-মুড়িটা দিবেন, খেতি ভাল্লাগে।

খেজুর গাছের ডালের গোড়ার দিকের সাদা, নরম অংশটা কেটে নিল হাবুল। কচি নারকেলের শাঁসের মতো খেতে। ইউরিয়া দেওয়া ফুলকো, নোনতা মুড়ির সঙ্গে জমে ভালো। গায়ে হাত-পায়ে অনেক জায়গায় কেটে-ছড়ে গিয়েছে। খেজুরের কাঁটা বিঁধে আছে কাঁধে। নিজের মাথায় জড়ানো গামছা খুলতে খুলতে ও রসের হাঁড়ি নামিয়ে রাখে। মজুমদারবাড়িতে গোটা চারেক খেজুরগাছ। রস খাওয়ার বায়না ধরেছিল এ বাড়ির ছোটোনাতি টুকুন। বাড়ির কর্তা সুখময় মজুমদারের সঙ্গে গাছ প্রতি দশ টাকা, দু-হাঁড়ি রস আর কুড়িখানা 'বেগ্যা' বা ডালে রফা হয়েছে ওর।

'বুড়িগাছের মিঠা রস, উর থিকে হয় নলেন গুড়। ছুঁড়িগাছের রস খেওনি, প্যাট হড়কাবে।'– হাবুল নখ দিয়ে কাঁটাটি খুঁটে তুলে নিজের থুতুর সঙ্গে এক চিমটে মাটি চেপে ধরে। নইলে কিটকিটে ব্যথা হত পরদিন থেকে। তিনদিনের মাথায় কুলাটি। মাটিতে কাঁটার বিষ মরে যায়।

'মাটিতে মরি যায় সব বিষ!' ও নিজের মনে মনে বলে ওঠে, 'মসলিনও তো-।'

মসলিন,– ওর বিবি। যেমন নাম, তেমন তার চেকনাই। তেঁতুলে মাজা তামার বাসনের মতো গায়ের রং। আগুন-ধরানো শরীর। একদিন তাকে ঘাট থেকে ভেজা কাপড়ে ফিরতে দেখে লোহার বদলে নিজের ঠ্যাঙেই হাতুড়ি চালিয়েছিল প্রাণকেষ্ট কর্মকার! ঘুণধরা কাঠ বৃষ্টির জলে ভিজলে যে গন্ধ, মসলিনের গায়ে তেমনই একটা গন্ধ পেত হাবুল। ও বিশ-পঁচিশ হাতের গাছ একবেলায় ফেঁড়ে দেয়, তাগদ নেহাত কম নয়। তবু সন্ধেরাত থেকে রাতদুপুর অবধি ধামসা-ধামসি করার পরও শুয়ে শুয়ে গুনগুন করত মসলিন। চাঁদের আলো যেন পিছলে যেত গায়ে। হাবুল তখন দাওয়ায় পিঠ ঠেকিয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে ভেবে কূল পেত না,

'উ মাগী দিতিছিল না লিতিছিল?'

মসলিন খেজুর পাতার পাটি বুনত। কড়ের সুতো দিয়ে মাছ ধরার জালও। হাটে বিক্রি হত পঞ্চাশ-ষাট টাকা করে। সেদিন হাটবার, বিকেল থাকতেই ঘরে ফিরেছে মসলিন। তার পসরা বিক্রি হতে সময় লাগে না। দু-দশ টাকা ঠকতেও গা করে না খদ্দেররা।

একচিলতে উঠোনে, দা দিয়ে খেজুরপাতা ছাড়াচ্ছিল হাবুল। কয়েক গোছা কাঁচের চুড়ি কিনেছে মসলিন। রিনরিন শব্দ কানে আসতেই হাবুলের মেজাজ চড়ে যায়। কিছু না বলে দ্রুত হাতে দা চালাতে লাগে। উঠোনের একপাশে গোটা চারেক গোলাপ গাছ। মসলিনের হাতে লাগানো। হাট থেকে পোয়াটাক কাদাচিংড়ি এনেছে সে, গাছের গোড়ায় দিলে গোলাপের রং খোলতাই হয়। হঠাৎ একটা পাতা ছাড়ানো খেজুরের ডাল দিয়ে তার পিঠে সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়।– 'কুন নাগরকে ফুল দিয়ার শখ জেগিছে তুর?'

এক-এক কোপে এক-একটা গাছ সাবড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। নিতাই মোড়লের শুঁড়িখানায় না বসলে মনটা জিরোবে না।

টুকুনের বয়স সাত কী আট। বড়োকর্তা নিজের হাতে কঞ্চি কেটে ধনুক বানিয়ে দিয়েছেন। একহাত করে লম্বা কয়েকটা পাটকাঠি তীরের মতো ছুঁড়ছিল সে। হালকা কাঠিগুলো একটু গিয়েই এঁকেবেঁকে যায়! ব্যাপারটা মনঃপূত হয় না, 'ধুত, ও দাদান, তীর তো যাচ্ছেই না! রাবণ মরবে কী করে?'

– এট্টু সবুর করো ছোটোবাবা, ভালা তীর বানা দেতিছি মুই।

মুড়ি ক'টা শেষ করে হাবুল একটা রাংচিতা গাছ কেটে আনে। গাছের ছালটা গোল-গোল নলের মতো টুকরো করে পরিয়ে দেয় পাটকাঠির মাথায়।– 'ইবার দেখো দেখি।'

তীরটা অনেকদূর গিয়েছিল। টিনের ছাউনি দেওয়া ঘুঁটের ঘর অবধি। টুকুন মহোল্লাসে সেদিকে ছুটে গিয়েই 'উ মা গো' বলে বসে পড়ে মাটিতে। ওর কান্নায় বাড়ির সবাই ছুটে আসে,– চোখে মুখে আতঙ্ক। সাপে কামড়েছে নির্ঘাত!

'মুই এট্টু দিখব দাদাঠাকুর?'

হাবুল ক্ষতস্থানে চোখ বোলায়।– 'সাপ লয়, বিছায় কাটছে।'

ও আগাছার জঙ্গল থেকে একটা বেড়াগাছ উপড়ে আনে। কিছুটা ছিঁড়ে হাতের তালুতে ডলে নেয় খানিক। 'এটো লাগায় দ্যান, যন্তন্না কমবি।'

অবাক কাণ্ড! মিনিট খানেকের মধ্যেই থেমে গেল টুকুনের কান্না! খুশিতে একটা একশ টাকার নোট হাবুলের হাতে গুঁজে দিলেন সুখময় মজুমদার।

টুকুনের মামা এসেছে তার দিদির দেশের বাড়ি ঘুরতে। গাছটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল সে। 'আরে, এ যে বেলেডোনা গাছ! এ তো বেশ কাজের লোক মেসোমশায়, একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে হয়।'

হাবুল প্রমাদ গোনে,– সেরি সে! ইসব লোক লিয়েই যত্তি ঝামলা। এখন

হাজারটা পোশনো করবি। জবাব না দেলি বিপদ, বাবুলোক কী থেকি কী ভাবে! জবাব দেলি আবার 'ধ্যার, ঢপ মারছিস', 'ধুস্ , এমন হয় নাকি'– যত্তি রকম বেকার বাহাস। কথায় আছে, ল্যাংটা গাঁড়ে তসর পরে, খসর-খসর করে। ইদের হল সেই হাল। মুখে বলে 'জানতি চাই', ইদিকে কথায় কথায় শুধু নিজের চার পয়সার বিদ্যাটুকুনই জাহির কত্তি চায়, নিজেই সব জানে!

– ক্ষ্যামা দ্যান বাবু, মেলা কাজ। আটবাড়ি গাছ-ছাড়ানি আছে, রসগুলানও লে যেতি লাগব দুপুর ধরার আগে।

হাবুল, রসিক বাগের গুড়ের কারখানায় হাঁড়িগুলো জমা দেয়। কারখানা গুড়ের হলেও গেঁজে ওঠা রস থেকে তাড়িও তৈরি হয়– আড়ালে। ও এক ভাঁড় চেয়ে নেয়। সঙ্গে আধশক্ত চিনির কাঁদ, দানা বাড়ানোর জন্য ঝোলাগুড়ে মিশেল দেওয়া হয়। তাড়ির সঙ্গে মুখে দিলে ভালো ঝিম ধরে নেশায়।

একঢোঁক গিলতেই গলাটা জ্বলে গেল। শালা, য্যানে লাড়িভুঁড়ি সব টের পাওয়াতে পাওয়াতে পেটে নামছে! সামনে একটুকরো সবজিক্ষেত। আলের দু-পাশে হলুদ আর ফুলকপির চাষ। ক্ষেতের ওপারে বেদেপাড়া। ডানদিক ঘেঁষে সার সার কোমর সমান উঁচু দরমার ঘর। এও এক নেশার আয়োজন। পুরিয়াখোরদের যখন শেষ অবস্থা হয়, কিছুতেই আর নেশা ধরে না, তখন এখানে আসে। বেদের হাতে টাকা ধরালে তারা দরমার ঘরের জানালা খুলে দেয়। খদ্দের জিভ পেতে ছোবল খায় অর্ধেক বিষ ঝাড়া সাপের। আমেজে ঝিমোয়।

কারখানার ভেতর এফ.এম. রেডিওয় গান বেজে ওঠে হঠাৎ। বেদেপাড়ার থেকে চোখ সরিয়ে চিনির কাঁদটা জিভে ঠেকায় হাবুল।

– কী গো, ওদিকপানে ড্যাবড্যাবাচ্ছো ক্যানে? সাপ দিখার শখ জেগিছে বুঝি?

টগর, রসিক বাগের বউ। চতুর্থ না পঞ্চমপক্ষ মনে নেই। প্রায় ষাট বছর বয়স রসিকের। এই বউ তার কোনো একপক্ষের মেয়ের সঙ্গেই ইস্কুলে পড়ত। বাপ-মা মরা মেয়ে, মামার ঘরে মানুষ। শুনেছিল, দু-হাজার টাকা কন্যাপণ দিয়ে রসিক একে ঘরে তুলেছে। কথাবার্তা, চেহারায় ছিরিছাঁদ নেই কিছু। কেবল তার শরীরের জায়গা বিশেষ বেঢপ।

– কী গো, রা কাটো না ক্যানে? ওপারের শংকর-টকিজে ইংরিজি বই লেগেছে। 'আনাকুন্ডা' না কী যেন। মস্ত বড়ো সাপ, মানুষ অবধি গিলে ল্যায় নাকি! চলো না, একসঙ্গে সাপ দেখে আসি।

কেমন যেন শুয়োর-শুয়োর গন্ধ! হাবুলের গা ঘিনঘিন করে ওঠে, একঢোঁকে অনেকটা তাড়ি গিলে নেয়।

'কীসের এত দেমাক তুমার?' মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা দেয় টগর, কোমরের নীচটা খুব বেশি দুলছে। হাবুল বুঝতে পারে না, এই মেয়েটিকে দেখলেই কেন এত ঘেন্না লাগে! ঘেন্না কি তবে মনে রাখার একটা ছুতো মাত্র? নাকি এমনই কিছু

হওয়ার কথা এখন?

দূর থেকে ভ্রূকুটি হানছে টগর, চোখে তাচ্ছিল্যের ভাব। রকমসকম দেখে গা রি-রি করে ওঠে। শেষদিকে মসলিনের হাবভাবও ঠিক এমনধারা হয়েছিল। ভয় লাগত হাবুলের, খুব ভয় লাগত। রাগ চড়লেই যখন-তখন দু-চার ঘা বসিয়ে দিত। সে টুঁ শব্দটুকু করত না কোনোদিন। মরা মাছের মতো ঠাণ্ডাচোখে তাকিয়ে থাকত, মুখে বাঁকা হাসি। হাবুলের দম আটকে আসত। শুধু মনে হত তুলোর আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে মসলিন। একবার হাওয়া লাগলেই পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।– হাবুলকেও।

আর হলও তাই। কোত্থেকে এক বাবু এসে জুটল ডাকবাংলোয়। রোগা লিকলিকে হাত-পা। হাঁটা দেখে মিয়েছ্যালা-মিয়েছ্যালা লাগে। গলায় ক্যামেরা, কাঁধে ঝোলা আর বগলে তিন-ঠ্যাঙা তক্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াত এদিক-ওদিক। একে-ওকে দাঁড় করিয়ে কী সব আঁকাঝোঁকা করত। হাবুল অবাক হয়ে দেখত,– লোকটা ফচাং ফচাং ফটোক তুলে খালি,– বুড়া হাবড়া, ল্যাংটা ছেলে ছোকরা, কুত্তা বিলাই, যা দেখি সব! তখন জ্যৈষ্ঠমাস। রক্তচোষা গরম। দিনমান কুড়ুল চালিয়ে আর যেন প্রাণ ছিল না শরীরে। ক-চুমুক ধেনো টানতে নিতাই মোড়লের দোকানে গেল হাবুল। একটু দূরে হরি বাঁড়ুজ্জের বৃষোৎসর্গের ক্ষ্যাপা ষাঁড় প্রবল আক্রোশে গুঁতিয়ে চলেছে ছাইয়ের গাদা। নাসির আর প্রসাদ এর মধ্যেই মাটিতে গড়াচ্ছে। রোজের মতোই আবোলতাবোল বকছে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। হাবুলকে তারা খেয়াল করেনি। হঠাৎ প্রসাদ বলে ওঠে, 'শালা, বাঁড়ুজ্জির বাপটা অত ভুঁসভুঁসাচ্ছে ক্যানে বে?'

– পাল দিবার সিজিন উঠ্যাছে কিনা, তড়পাছে উ-শালা।

– বকনা দিখালেই তো ঠাণ্ডা হতক। বাপ্পোৎ, লিশার সুময় যত্ত উৎপাত!

– তেমুন ডাগর বকনা আর কই বে যে ই শালাকে সামলাবে?

– ক্যানে? হাবলার বউটা আছে তো। ষাঁড় কী বে, এক পল্টন মিলিটারিও ঠেকি দিবে উই মাল।

খিল্লি যেন থামে না, আর সেই সঙ্গে কুৎসিত সব অঙ্গভঙ্গিও। হাবুলের মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সজোরে লাথি কষায় প্রসাদের পাছায়।

রক্তারক্তি হয়ে যেত, নিতাই মোড়ল থামিয়ে দিল তাই রক্ষে। প্রসাদলাথি খেয়েও দমেনি। চেল্লাতে শুরু করে, 'আমাকে কেলিয়ে কী করবি রে হারামি? তোর বিবি যে ফটোকবাবুর লেগে দিনমান লটরপটর করে দেখতি পাস না? আঁচল ফেলে ল্যাংটা বুকের ফটোক উঠায়।'

সেই শুনেই তো-

...

থুঃ! চিনির কাঁদের সঙ্গে একটা মরা মাছি পড়েছে মুখে।

– ফেলি দে, ফেলি দে, বুকের যতক ঘিন্না থুক মেরি ফেলি দে।

কালো আলখাল্লা। মাথায় ফেট্টি। কাঁধে হাজারটা তাপ্পি দেওয়া ঝোলা। হাতে একখানা চিমটে। গলায় নানান রঙের ছোটোছোটো পাথরের প্রায় গোটা দশেক মালা।— জয়নাল ফকির। সামনে আসতেই তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে হাবুল।

– আরে উঠ ব্যাটা, উঠ। কান্দিস ক্যানে? ও বুঝিছি, নারীচক্রে মুন আটকিছে তুর। ছটফট করতিছে বঁড়শি-গিলা পুনামাছের মতো। বঁড়শি কাট ব্যাটা, নইলি দম আটকায়া মরবি। মরেও শান্তি পাবিনি। ছাল ছাড়ায়ি ভাজা-ভাজা করবে তুকে। বঁড়শি কাট।

চিমটে বাজিয়ে গান ধরে ফকির।

কেনে রে মন এমন হলি?
যাতে জন্ম তাইতে মলি?
ও তোর ঘুরতে হবে লক্ষ গলি,
হাতে পায়ে বেড়ি সার করে॥

ডুকরে ওঠে হাবুল, 'মুই বড়ো গুনা করিছি ফকিরসাহেব। জাহান্নুমেও জাগা হবি না মুর।'

'আমার গুরু কী বলে জানিস?' বুকে চিমটে ঠেকায় ফকির,– 'এইখানে থাকে আলেকসাঁই, খোদা। আবার এইখানেই থাকে শয়তান। কী বুঝলি?'

হাবুল উত্তর খুঁজে পায় না।

– ইখানেই বেহেশ্‌ত, ইখানেই দোজখ। গাড্ডায় পড়েছিস, খোদাকে ডাক। খুদ বেহেশতে চলি যাবি।

– কী করি ফকিরসাহেব?

'খোদা জানে। সে-ই বুলবে। আমি কে?' ফকির নিজের গলা থেকে একখানা মালা হাবুলকে পরিয়ে দেয়।– 'দম আটকায় যদি, হাতের মুঠায় আঁট করি ধরবি। আলগা হবে বঁড়শি।... যেমন মুর্শিদ, তেমন খোদা ... মনে কেউ করো না দ্বিধা...'

ফকির গাইতে গাইতে চলতে শুরু করে। মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে।

সেই রাতে নিতাই মোড়লের শুঁড়িখানা থেকে হাবুল কুড়ুল হাতে ছুটতে শুরু করেছিল। নাসিরদের কথায় সত্যি-মিথ্যার হিসেব থাকে না অনেকসময়। কিন্তু, তখন ওর মাথায় খুন চেপে গিয়েছে।

ডাকবাংলোর কাছাকাছি আসতেই একদল কুকুর পিছু ধাওয়া করে। খুবই হাঁকডাক করছিল। হঠাৎ একটার মাথায় কুড়ুলের কোপ বসাতেই চিরকালের মতো ডাক বন্ধ হয়ে গেল সেটির। বাকিরা পালাল ভয়ে। হাবুল চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দে বাংলোয় ঢোকে। 'কী রে বাবু, খুব ফটোক তুলার শখ জেগিছে তোর, তাই না?'

কুড়ুল থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। পাজামা ভিজে যাওয়ার দশা শহুরে লোকটির! না চিনলেও আন্দাজ করতে পারছিল হাবুলের পরিচয়। আতঙ্কে প্রায়

কেঁদে ওঠে যেন, 'আমি কিছু করিনি, বিশ্বাস করো। শুধু ছবি নিয়েছি কয়েকটা।'

-হারামি শালা কুত্তার বাচ্চা! মু-ও শুধু তোর মুন্ডুখানা লিব। দিবি?

প্রাণভয়ে হাতে-পায়ে ধরছিল লোকটি। কিছুটা শান্ত হয় হাবুল, 'ই রাতেই গেরাম ছেড়ি পালা। ফির কুনওদিন যদি ইখানে এইছিস, ঠ্যাং কেটে লিব।'

হুমকি শুনেই তড়িঘড়ি গোছগাছ শুরু করে লোকটি। মালপত্রে থাবা মেরে হাবুল বেশ কিছু টাকা আর একখানা হাতঘড়ি ছিনিয়ে নেয়।

রাত প্রায় দশটা। সশব্দে দরজা খুলে হাবুল ঘরে ঢোকে। দেশি মদের তীব্র গন্ধ। ছিনতাইয়ের হাতঘড়ি আর রক্তমাখা কুড়ুল দেখে শিউরে ওঠে মসলিন। ছুটে এসে ঠাসঠাস চড় কষাতে থাকে ওর দু-গালে, 'বল হারামি, কী করেছিস তুই? কারে খুন করি এলি?'

হাবুল তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। 'তোর সুহাগের নাং-কে কেটে এইছি খানকিমাগী। ভাবিস ট্যার পাই না?'

ভয়ে, ব্যথায় ফোঁপাচ্ছিল মসলিন, 'জানুয়ার, ইবলিশের বাচ্চা!'

– খুব যে দেখি দরদ! কান খুলি শুনে রাখ, যার যার লেগে আশনাই করবি, সবকটাকে ধরি ধরি যদি না কাটি, মুই এক বাপের ব্যাটা না।

রাগে, অপমানে মসলিন চেঁচিয়ে ওঠে। 'ভারী আমার মরদ রে! মুই তোকে ডরাই নাকি? তুইও শুনে লে, যা করিছি বেশ করিছি। আবার করব। হাজারবার করব।'

হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় হাবুলের। কুড়ুল চালিয়ে দেয়।

আজ শীতের রাতেও বৃষ্টি নেমেছে জোর। বাজ পড়ছে কড়কড় শব্দে। ওর মা বলত, শয়তানের পিঠে কোড়া মারছে আল্লায়! হাবুল নিজের ঘরে ঢুকল চোরের মতো। নাসির, প্রসাদরা রটিয়ে দিয়েছিল, ফটোকবাবুর সঙ্গে ভেগেছে ওর বউ। জানে না। ওরা কেউ জানেনা, ঘরের বউ ঘরেই আছে!

সামান্য বিছানাটার পাশে মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে ও হু-হু করে ওঠে, এখানেই তো-। আধমরা জন্তুর মতো মেঝের মাটি আঁচড়ায় হাবুল, প্রতিটি রাতেই।...

কিছু সময় পর বৃষ্টি ধরে আসে। হাড়কাঁপানো হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। বুকের ভিতরটাও যেন হিম।

– হাবলা, ঘরে আছিস?

দরজা খোলাই ছিল। রসিক বাগের লোক।

– বাবু পাঠালে। ওষুধ বানাইছিস?

ও নিঃশব্দে লোকটির হাতে একটা পুরিয়া ধরিয়ে দেয়।

– বাবু শুধাতে কইছেন, তোর মাল খেলি আর উঠবে না তো? তইলি কিন্তু-!

– কুনও ভয় নাই। লিয়ে যা।... দাঁড়া, মু-ও যেছি তুর লেগে।

...

হাবুলকে দেখে কপাল কুঁচকোয় রসিক, 'কী ব্যাপার, তুই?'

– কিছু লয় কত্তা, নিজের হাতে মালটা বানাইলাম কিনা, ত্যাজ দেখতি এইছি।

– হারামজাদা যেন কালীপুজোর লংকাফটকা বানিয়েছে! 'তেজ দেখতে এলাম'!... তোর আসল মতলব কী বলতো? খুব সাবধান হাবলা। মনে রাখিস, তোর বউ যে সেদিন পালায়নি,সে আমি জানি। আমার সঙ্গে যদি একফোঁটাও চালাকি করতে যাস, সব ফাঁস করে দেব। দেখব, ফাঁসির দড়ি থেকে তোকে বাঁচায় কোন শালা!

– মিছাই রাগ করতিছেন। নিজের হাতে বিষটা বানাইছি, কী গতি হয়– দেখতে সাধ লাগে।

– ঠিক আছে ঠিক আছে। মেলা কথা বাড়াস নি আর। চুপচাপ গুদামে গিয়ে বস।

ডাক পড়ে ঘণ্টাখানেক পর। ঘরে তখন রসিক আর তার সেই সাগরেদ। গ্যাঁজলা উঠেছে টগরের মুখে, বুক-পেট স্থির। টলতে টলতে ঘরে ঢুকল হাবুল। ভুরভুর করছে তাড়ির গন্ধ।

– ফোকটের মাল দেখেই গিলে এলি শুয়োর। ড্রামখানা এঁটো করেছিস নাকি?

– মাফ করেন কত্তা।

– বেজন্মা শালা! ভালো করে দেখ, বেঁচে নাই তো?

চোখ দেখে হাবুল, নাড়িও। 'খুদ আল্লারও সাধ্যি নাই ই-কে জাগি' তুলার। যদি গুনাহ্ না ধরেন, একটা কথা বুলব কত্তা?'

– কী?

– মুর হাতেই যখন গেল, মু-ই না হয় পার করি দি এ-রে?

একটু ভেবে নেয় রসিক, 'ঠিক আছে।'

জাঁতাকলের পাথর বাঁধা হয়েছে টগরের বুকেপিঠে। তিনজনে ধরাধরি করে সেই লাশ একটা ছোটো নৌকায় তোলে। হাবুল নৌকার লগি ধরে।

– এট্টা পোশনো করি কত্তা?

বিরক্ত হয় রসিক, 'কী?'

– মেয়িটা ক্যানে মরল?

'তাতে তোর কী কুত্তার বাচ্চা?'– রসিক হিসহিসিয়ে ওঠে।

– কিছু না। এমনিই-।

লগিতে চাপ দেয় হাবুল। স্রোতে পড়তেই বেগ নেয় নৌকা। কিছু দূর এগিয়ে ফকিরের মালাটা জলে ফেলে দেয়। 'পরের বার গলায়লিব।' লগি তুলে দাঁড় টানতে থাকে।

মেঘ কেটে চাঁদ উঠেছে আকাশে। টগরের গায়ে পিছলে যাচ্ছে তার আলো। হাতের চেটোয় জল নিয়ে ওর মুখের গ্যাঁজলা ধুয়ে দেয় হাবুল। শক্ত বাঁধনের মধ্যে নিজের হাতদুটো গলিয়ে টগরের মুখটা তুলে ধরে;-

– ওপারে ভালো সিনিমা লেগিছে। দেখতি যাবি? যাবি নাকি রে– মসলিন?...

জলে ভারী কিছু পড়ার শব্দ হয়। জোরে দুলে উঠে প্রায় যেন উলটে যায় নৌকাটি। তারপর, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যায় কুয়াশার ভিতর।

*****

'ঋত্বিক', ২০১৫

রূপকথা

কায়রো শহরের এক প্রান্ত। সরকারি গেস্ট-হাউসের পাঁচতলা। সুমন অন্যমনস্ক, ওর চোখ জানালায়। সেদিকে কিছু দূর অবধি একটা শহরের গঠন। তারপর নীলনদ, তারপর ধু-ধু মরুভূমি। তারপর– যেন দিগন্তের প্রহরীর মতো জেগে সুদীর্ঘ সময়ের নীরব সাক্ষী,একদল পিরামিড।

আজ সারাদিন মনটা বড়ো অস্থির। ঘরের বিছানা, মেঝে, টি-টেবিল সর্বত্র বই-কাগজ ছড়ানো ছেটানো। ল্যাপটপ চালু রয়েছে টানা দশ-বারো ঘণ্টা। এখনও গোটা চল্লিশ ওয়েবপেজ খোলা। একটা সময় অবধি এদেশে যে-ই এসেছে, প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নথি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে গবেষণার নামে। ১৯৫২ সাল নাগাদ এখানের কেপটিক মিউজিয়াম পড়ে থাকা বাদবাকি নথিপত্র গোছাতে শুরু করে। অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা, অবশিষ্টের পরিমাণও কম নয়। এক নাম-না-জানা নারী পাঁচহাজার বছরের বিশাল ইতিহাসের কোন পাতায় লুকিয়ে আছে কে জানে? কে জানে আদৌ আছে কিনা!

ডোরবেলের শব্দ হতেই বিরক্তি লাগল। নির্ঘাত হাউসকিপিং! ও দেখেছে, হোটেল বা গেস্টহাউসে ঠিক তখনই ডোরবেল বাজে, যখন লোকে খুব জরুরি কাজে ব্যস্ত, বা নিদেনপক্ষে বাথরুমে কি বিছানায়! আজ ছুটির দিন, একটানা পড়াশোনার ইচ্ছেয় ইন্টারকম নামিয়ে রেখেছিল। দরজার 'ডু নট ডিসটার্ব' ট্যাগও কি এদের চোখে পড়ে না? বেলটা দ্বিতীয়বার বেজে উঠলে দরজা খোলার তাড়ায় ল্যাপটপের তার পায়ে জড়িয়ে সেটি সশব্দে ছিটকে পড়ল মেঝেয়। পাখার হাওয়ায় একগুচ্ছ কাগজ সারাঘরে ছড়িয়ে যায়। বিরক্তিতে মুখে গালাগাল এসে গিয়েছিল প্রায়, তখনই তৃতীয় বেল।

মিউজিয়ামের কিউরেটর নিশার খান। মাঝবয়সি ভদ্রলোক আদতে পাকিস্তানি। এদেশে এসেছিলেন গবেষণার কাজে, আর ফিরে যাননি। পোশাক-আশাক, চালচলন দেখে মনে হয়, ভদ্রলোকের জন্ম কোনো খানদানি পরিবারে। এখনও বুক পকেটে আতরমাখা রুমাল। ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত, 'কী ব্যাপার? মোবাইল বন্ধ, ইন্টারকম নামিয়ে রেখেছ, দরজায় 'ডু নটডিস্টার্ব',– ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

– আরে না না। ভিতরে এসো।

ঘরের অবস্থায় চোখ বুলিয়ে নিশার খানের গলায় রসিকতা খেলে যায়, 'কী ব্যাপার বন্ধু? মনে হচ্ছে ঝড় উঠেছিল!'

সুমন হাসল, 'সেরকমই কিছু একটা ধরতে পারো।'

– খুব সাবধান। হৃদয়ে ঝড় তোলার বিষয়ে সুন্দরী নারীরা চিরকাল বদনাম। তেমন কিছু নয়তো?

– একেবারেই নয়, তা বলি কী করে?

ওরা দুজনেই হেসে ওঠে। মুখোমুখি দুটি ছোটো সোফা। নিশার খানের হাতেকিছু কাগজ। সেসব টেবিলে রেখে সে বলল, 'সুখবর আছে। এই রহস্যময়ীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।'

সুমন সোজা হয়ে বসে। ওর চোখে-মুখে উৎসাহ। নিশার খান বলতে থাকে, 'তবে কিছুটা অনুমানও বলতে পারো। খুব সম্ভবত ইনি একুশতম রাজবংশের ষষ্ঠ ফারাও সিয়ামুনের এক রাণী। সময় ৯০০ বা ১০০০ বি.সি.ই.। এই সিয়ামুনের জীবন একটু অদ্ভুত। ইতিহাসে তিনি একমাত্র ফারাও, সিংহাসনে বসার প্রায় চার-পাঁচবছর পর যার বিবাহ হয়। নাবালক ফারাওদেরও এত বিলম্ব হত না। কারণ শুনলে হয়তো অবাক হবে, যে যুগের যা প্রথা। ফারাওদের বিবাহের সময় পাত্রীর 'রয়ালব্লাড' বা রাজরক্ত বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। আর তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বিবাহ হত রক্তের সম্পর্কের মধ্যেই। রাণী মানে তো শুধু রাজার স্ত্রী নয়; বন্ধু, রাণী একটা পদ। বিখ্যাত ফারাও তুতেনখামুনের কথাই ধরো। তার রাণী আনেক-সুন-আমন তারই পিতার ঔরসজাত কন্যা। আবার অনেক ঐতিহাসিকদের মতে এই আনেক-সুন-আমনের প্রথম বিবাহ হয় বারো বছর বয়সে। তার নিজের পিতার সঙ্গে। যাই হোক, সিয়ামুনের কথায় ফেরা যাক। খুব কম বয়সে তার পিতার মৃত্যু হয়। সিয়ামুন তার একমাত্র সন্তান। ফলে, উপযুক্ত পাত্রীর অভাবে তিনি বেশ কিছুদিন অবিবাহিত ছিলেন। এরপর হঠাৎ এই রহস্যময়ীর সঙ্গে বিবাহ। এর নামজানা যায়নি। এমন অসামান্য রূপসী এক রাণী, অথচ ইতিহাস তার বিষয়ে একদম নীরব!

– আচ্ছা, ফারাও সিয়ামুনের বিষয়ে আর কী কী জানা যায়?

– বিশেষ কিছু নয়।

– কেন?

– ঔরঙ্গজেবের পর কতজন মুঘলকেই বা ইতিহাস তেমন ভাবে পাত্তা দিয়েছে? ঐতিহাসিকরা চিরকালই হিসেবি। সিয়ামুন না ছিলেন র‍্যামসিসের মতো মহান, না ছিলেন থৎমোসের মতো যুদ্ধবীর। ফারাও খুফুর মতো গিজার পিরামিডও নির্মাণ হয়নি তার আমলে। তার সমাধিও পাওয়া যায়নি। ভ্যালি অফ্ দ্য কিংগসেও না। ঐতিহাসিকদের নজরে তখন ইজরাইল। সিয়ামুনের সমসময়ে সেখানে বিখ্যাত রাজা ডেভিড আর সলোমনের রাজত্ব। তবে বাইবেলে মাত্র একজন যে ফারাওয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, খুব সম্ভবত তিনি এই সিয়ামুন। হ্যাঁ, উনাস নামের এক সঙ্গীতজ্ঞ ছিল সেই সময়ে। মিশরের তানসেন বলতে পারো,

শ্রেষ্ঠ কানুন বাদক।

– কানুন?

– বীণা জাতীয় এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

সুমন আশাহত, 'এক মিউজিশিয়ানের কথা আছে, আর রাণীর নেই? আশ্চর্য!'

– সত্যিই আশ্চর্য। ভাবতে অবাক লাগে, একজন রাণীর প্রতি ইতিহাস সম্পূর্ণ উদাসীন কেন?

– এই নারীর প্রকৃত পরিচয় হয়তো সেখানেই লুকিয়ে।

– হয়তো। খোঁজো বন্ধু, তাকে খোঁজো। দেখো, সময়ের গারদ থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারো কিনা। কোনো সাহায্য লাগলে অবশ্যই বলবে, নিশার খান সবসময় প্রস্তুত।

– মাঝেমাঝে আশঙ্কা হয়। যেখানে এত বড়োবড়ো গবেষক, আপনি নিজেও এত বছর ধরে তার খোঁজ পেলেন না, সেখানে আমি কতদূর-?

– আমরা রসকষহীন অ্যাকাডেমিক লোক। যতটুকু খুঁজেছি, খুঁজেছি সেই চিরাচরিত বই-পড়া রাস্তায়। তুমি তো আর তা নও। কথায় আছে, 'কাফেরে বেদার দিল পেশে সনম, বেহ্ যে দীদারে কেখুফ্‌ত অন্দর হরম্।'– কাবা পাথরের মাঝে ঘুমন্ত ধার্মিকের থেকে জাগ্রতচিত্ত কাফের শ্রেষ্ঠতর। যাই হোক, কয়েকটা থিসিস আর এই বইটা তোমার জন্য এনেছি। দেখো কোনো সূত্র পাও কী না।

– ধন্যবাদ।

– এবার উঠব বন্ধু।

– এক কাপ কফি অন্তত-?

– অন্য কোনোদিন। আরও দেরি হলে বেগমসাহেবা আমাকেই মমি বানিয়ে আমারই মিউজিয়ামে রেখে আসবে। চলি, খুদা হাফিজ।

– খুদা হাফিজ।

সোফায় গা এলিয়ে সুমন সিগারেট ধরাল।– 'কে তুমি রহস্যময়ী?'

ঘটনার শুরু মাসখানেক আগে। ও এদেশে এসেছিল এক ই-গভর্নেন্স প্রোজেক্টের কাজে। এ শহরে পর্যটকদের খোরাকের অভাব হয়না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আজ পিরামিড, কাল স্ফিংসের মূর্তি, পরশু ইজিপ্সিয়ান মিউজিয়াম,– এদিক-ওদিক ঘোরাও চলছিল টুকটাক। এমনই একদিন বিকেলের দিকে ও হাজির হল নিশার খানের মিউজিয়ামে। বন্ধ হতে তখন মাত্র ঘণ্টাদুয়েক। ভেবেছিল, ছোট্ট একটা মিউজিয়াম, এমন কী-ই বা থাকবে? ঢোকার পরও শুরুর দিকে মনে হচ্ছিল ওর ভাবনা ভুল নয়। সেই এক ভাবলেশহীন গাইড, অমুকের পানপাত্র, তমুকের স্বর্ণ-মুখোশ, ওই আমলের নথি, সেই আমলের সিলমোহর, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুটা নিরুৎসাহেই ঢুকেছিল এদের মমি-ঘরে। সেখানে পরিচিত চেহারার গোটা তিনেক মমির পর হঠাৎ চমক! কাঁচের ক্যাপসুলের ভিতর এক অপূর্ব সুন্দরী

যেন চোখ বুজে দাঁড়িয়ে! এই বুঝি কথা বলে উঠবে! এর শরীরে পরিচিত ধাঁচে কোনো ব্যান্ডেজ-জাতীয় কিছু নেই। সময়ের খণ্ডগ্রাসে পোশাক মলিন, কিন্তু তার রূপ কালজয়ী!

কথায় আছে 'উপমা কালিদাসস্য'। না, এই সৌন্দর্যের কোনো উপমা হয় না। শুধু অস্ফুটে বলতে ইচ্ছা করে,– 'মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে, বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা...'।

'সাবধান, ওর দিকে এভাবে চেয়ে থাকলে আর কিন্তু দেশে ফিরতে পারবে না।' সুমন চমকে গিয়েছিল। চারপাশ কখন ফাঁকা হয়ে গেছে, ও টের পায়নি। আগন্তুক হেসে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা। আমি নিশার খান, এখানকার কিউরেটর।

– শুভ সন্ধ্যা। আমি সুমন্ত রায়।

– মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধু।

– ওহ, দুঃখিত। আমি আসলে-।

– ও কিছু নয়, প্রথমদিন আমারও এমন হয়েছিল। কী জানি, হয়তো রোজ হয়, যতবার একা এর মুখোমুখি দাঁড়াই। তাই দেখো না, এদেশে এসেছিলাম থিসিস লেখার কাজে, শেষে এখানেই চাকরি নিয়ে ফেলেছি।

– কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না, এটা মমি!

নিশার খান নিঃশব্দে হাসে, 'তোমার ঘরে ফেরার তাড়া না থাকলে চলো, লাইব্রেরিতে বসি। মিউজিয়াম বন্ধ হলেও লাইব্রেরি রাত দশটা অবধি খোলা থাকে। হাতে কফি নিয়ে কথা বলা যাবে।'

সুমন সাগ্রহে রাজি হয়। কথায় কথায় জানতে পারে, বছর চারেক আগে আবিষ্কৃত এই অজ্ঞাত পরিচয় মমির বয়স নাকি প্রায় তিন হাজার বছর।

সেদিন ওর কৌতূহলের যেন সীমা নেই,– 'অজ্ঞাতপরিচয় কেন? পাঁচ-ছ'হাজার বছর আগের নার্মের, ইরিহোর-দের পরিচয় পাওয়া যায়, আর তিন হাজার বছরের মমি অজ্ঞাতপরিচয়?

– ইনি তো আর ফারাও ছিলেন না ।

– ফারাও না হলেও অবশ্যই রাজপরিবারের কেউ। মুকুটে সোনার কোবরা, এত আধুনিক মমিফিকেশন-এ তো সাধারণের জন্য নয়।

– ঠিক জায়গায় ধরেছ। মিশরীয় বিশ্বাসে মৃত্যুর পর বৃহত্তর জীবনের পথে মমিফিকেশন একটা ধাপ। এটা সত্তর দিনের প্রক্রিয়া। যেখানে প্রথমে মৃতদেহের হৃৎপিণ্ড বাদে শরীরের ভিতরের বাকি সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এমনকী মস্তিষ্ক অবধি বের করে নেওয়া হত। এরপর সেই শরীরের ডিহাইড্রেশন, তারপর বাকি পদ্ধতি। যতদূর মনে হয়, এর ক্ষেত্রে এসব কিছুই হয়নি। কেন? কেনই বা এই ধরনের মমি আর একটিও পাওয়া যায়না? সবচেয়ে বড়োকথা, এই নারীর পরিচয়ই বা কী?– গত দু-বছর ধরে উত্তর খুঁজে চলেছি।

– আমিও খুঁজতে চাই।

নিশার খান হাসে, 'সুস্বাগতম। এই রহস্যময়ী আসলে বহ্নিশিখা, আর

আমরা দুই নাছোড়বান্দা পতঙ্গ।'

সুমন লাইব্রেরির সদস্যপদ পেয়ে যায়। সেই থেকে ওর রোজনামচা– কোনোমতে অফিসের সময়টুকু পার করেই একছুটে লাইব্রেরি, তারপর রাত দশটা-এগারোটায় গেস্টহাউজে ফিরেও হয় কোনো বই না হয় ইন্টারনেট তোলপাড় করে খুঁজে যাওয়া।

'ফারাও সিয়ামুনের রাণী'! টেবিল থেকে বইটা হাতে তুলতেই কী একটা যেন মেঝেয় পড়ল। নিশার খানের অ্যাকসেস্ কার্ড। মোবাইলটা একবার হাতে নিয়েও রেখে দেয় সুমন। রহস্যময়ী যেন ওকে ডাকছে।...

তন্দ্রা এসেছিল। গ্র্যান্ড-ফাদার্সক্লকে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজতেই ও চমকে ওঠে। বেশ ভয় করছে এখন। কয়েক ঘণ্টা আগে লাইব্রেরিতে ঢুকেছে। তারপর নিশার খানের অ্যাকসেস্ কার্ড ব্যবহার করে মিউজিয়াম সেকশানে অতি সন্তর্পণ প্রবেশ। পেশার গুণে ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা সিস্টেমটিকে বাগে আনতে বেগ পেতে হয়নি। ধীর পায়ে মমি-ঘরে ঢুকতেই কেমন একটা ভয় বুকে ধাক্কা মারে হঠাৎ। ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। একবার ভাবে, কেন এলাম? এমন পাগলামি না করলেই ভালো হত।

এখন সকাল অবধি মিউজিয়ামে বন্দি। চারপাশে হাজার হাজার বছর পুরনো সব জিনিসপত্র, এতগুলো বিকট-দর্শন মমি। ও ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী নয়, তবুও গা ছমছম করছে।

চোখ পড়ে সেই রহস্যময়ীর দিকে। গারদ-আঁটা ঘুলঘুলির ওপারে পূর্ণিমার চাঁদ, আর এই কাঁচের ক্যাপসুলের ভিতর যেন স্বয়ং সৌন্দর্যের দেবী! সেই আনত দৃষ্টি, চাঁদের আলো আর মেঘের ছায়া খেলা করছে মুখে। ঠোঁটদুটো এই বুঝি কথা বলে ওঠে! কয়েকটি লাইন সুমনের মনে উঁকি যায় হঠাৎ;-

আজ রাত্রে উঠুক শুধু চাঁদ
সব ছায়াপথ রইল না হয় বাকি
স্বপ্ন-সত্য বিমুগ্ধ একাকার
মন-জুড়ে ওই প্রাণের ডাকাডাকি...

'শুনছ?'

হঠাৎ নারীকণ্ঠে চমকে গিয়েছিল সুমন। একবার মনে হয় শোনার ভুল। কিন্তু না, পরক্ষণেই আবার, 'শুনছ, তোমায় বলছি।'

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলছে– পালাও। অথচ পা-দুটো যেন পিরামিডের পাথরের মতো ভারী! ও চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে?'

– আমি মারমিইথ। এত রাতে আমার খোঁজেই তো ছুটে এসেছ। এই তিন হাজার বছরের মানুষটিকে চিনতে পারছ না?

– কিন্তু তু-তুমি তো... তুমি তো-!

– হ্যাঁ পর্যটক। আজও সেই যন্ত্রণা বয়ে চলেছি। দীর্ঘ তিন হাজার বছর। এক প্রতীক্ষা। পাপবোধ।

– পাপবোধ? প্রতীক্ষা? কেন? আচ্ছা, তুমি তো ফারাও সিয়ামুনের রাণী, তাই না?

– আমি ছিলাম অতি সাধারণ একটি মেয়ে। হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্য ওই রাণী পরিচয় পেয়েছিলাম বটে। আমার পিতা একদিকে রাজপুরোহিত, আবার উচ্চপদস্থ কারো মৃত্যু হলে তার ডাক পড়ত মমি প্রস্তুতির কাজে। থাইবস্ নগরীর একপ্রান্তে আমাদের আবাস, পিতার গবেষণাগার।...

শুনতে শুনতে যেন তিন হাজার বছর আগের সময়টা সুমনের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ওই তো থাইবস্ নগরী। ওই তো রাজপ্রাসাদ, নীলনদের তীরে ফারাওয়ের প্রমোদ-উদ্যান! তখন সূর্যাস্তের সময়, দিনের শেষ রক্তরাগ বুকে বয়ে চলেছে নীলনদ।

প্রতিদিনের দৃশ্য, তবু সিয়ামুন যতবার দেখে, ততবার যেন স্বর্গ নেমে আসে চারপাশে। উনাসের বীণা সুর ঢালছে অকৃপণ ভাবে। স্বয়ং প্রকৃতির দেবী যেন স্বমহিমায় উপস্থিত!

সিয়ামুন তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে। কিছুদূর থেকে একদল কিশোরীর উচ্ছল হাসি শোনা যাচ্ছিল। সেদিকে চোখ যেতেই সে স্তম্ভিত, 'দেবতাদের রাজা আমুনের নামে শপথ, এমন সুন্দরী আমি আজ অবধি দেখিনি! মৃগনয়নার অমন স্নিগ্ধ রূপ, অমন বিম্বাধর ওষ্ঠ! উনাস, উনাস তুমি বলো, এ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী কিনা?'

উনাসের কণ্ঠে বিনয়, 'আপনার রুচির সমালোচনার স্পর্ধা আমার নেই সম্রাট।'

– তুমি শিল্পী, আমার একমাত্র বন্ধুও।

– সে সম্রাটের উদারতা। আমি সামান্য এক বাজনদার।

সিয়ামুন কিছুটা অধৈর্য, 'তা হোক। তুমি বলো, সে রাজেন্দ্রাণী হওয়ার উপযুক্ত কিনা?'

– আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।

মাঝেমাঝে উনাসের এই ধরনের আচরণ তাকে প্রচণ্ড হতাশ করে। সম্রাট হওয়ার শাস্তি অনেক। যত ইচ্ছেই হোক না কেন, সোনার আসন ছেড়ে সে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে পারে না। সম্রাট চিরকালই নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব। এদিকে সিয়ামুনের বুকে ভাবের আধার। উনাসকে পেয়ে মনে হয়েছিল, এত দক্ষ শিল্পী, হৃদয়টিও নিশ্চয় তাপস। কিন্তু তার বন্ধুত্বের আন্তরিকতাকে উনাস ভেবেছে রাজ-অনুগ্রহ। বস্তুত, উনাসের জীবনে একমাত্র তার বীণাটি ছাড়া অন্য কিছুই নেই। সে বিনয়ী, কৃতজ্ঞ, কিন্তু বন্ধু নয়।

রোজের নিয়মমতো পরদিন সকালে মন্দিরে যায় সিয়ামুন। রাজপুরোহিত তাকে স্বাগত জানায়। সে প্রতিনমস্কার করে, 'আপনার গবেষণা কতদূর?'

– প্রায় অন্তিমপর্বে। এরপর দেহ সংরক্ষণ সম্ভব হবে আরও উন্নত উপায়ে। বৃহত্তর জীবনের পথ সুগম হবে।

– দেবতাদের কাছে আপনার সাফল্য কামনা করি। আসুন, পূজা আরম্ভ করা যাক।

– অস্থির হৃদয়ে পূজা সম্পূর্ণ হয় না। আপনার মুখমণ্ডলে বিনিদ্র রাত্রিযাপনের চিহ্ন। কোনো দুশ্চিন্তা?

– দেবতারা আমাকে ক্ষমা করুন। কাল গোধূলিতে যেন স্বয়ং দেবী হাথোর এসেছিলেন মানবীমূর্তিতে। সেই থেকে অন্য কিছুই যেন ভাবতে পারছি না।

– কোথায় দেখেছিলেন তাকে?

– প্রমোদ-উদ্যানের নিকটে, নীলনদের তীরে।

– সম্রাট, যার অনুসন্ধানে আপনি ব্যাকুল, সম্ভবত সে আমার কন্যা মারমিইথ।

– আপনার কন্যা? মারমিইথ, অপূর্ব নাম! তাকে আগে তো কখনও দেখিনি?

– সে শৈশবে মাতৃহারা। এতকাল তার মাতুলালয়ে ছিল।

– আমি তাকে বিবাহ করতে চাই। আপনার অনুমতি দিন।

– পিতা হিসাবে এই প্রস্তাব হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো। কিন্তু, একজন রাজপুরোহিত সম্মতি দিতে পারে না। সে অত্যন্ত চঞ্চলমতি। আর তাছাড়া,– সিন্ধুপ্রদেশের এক শাস্ত্রজ্ঞ পরিব্রাজক শৈশবে তার ভাগ্যগণনা করেছিলেন। মারমিইথের বিবাহিত জীবন বিষয়ে তিনি সন্তোষদায়ক কিছু বলেননি। আপনি যদি একজন সাধারণ যুবা হতেন, মারমিইথ আপনার স্ত্রী হলে হয়তো আপত্তি কিছু ছিল না। কিন্তু সে রাণী হওয়ার উপযুক্ত নয়।

– ও কিছু নয়। তার বয়স অল্প, অনভিজ্ঞ। আপনি অনুগ্রহ করে সম্মতি দিন।

– এর ফলে যদি কোনো অকল্যাণ হয়? ফারাওয়ের বিপদ তো শুধু ফারাওয়ের বিপদ নয়।

– আমার পরিবার শতাধিক বছর ধরে দেবতা আমুনের উপাসক। দৃঢ় বিশ্বাস– তিনি নির্দয় হবেন না।

সিয়ামুনের বারংবার অনুরোধে রাজপুরোহিত আর অমত করতে পারে না। বিবাহের বিষয়ে সেই যুগে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিশোরী মারমিইথ কিছুটা লোকমুখে তার সৌভাগ্যের প্রশংসা শুনে রাজি হয়ে যায়। সারা থাইবস্ নগরী মেতে ওঠে উৎসবে। প্রায় এক পক্ষকাল ধরে পান-ভোজন, নৃত্যগীত। এমনিতে শত্রুভাবাপন্ন হলেও ইজরাইল থেকে যুবরাজ সলোমন স্বয়ং আসেন শুভেচ্ছাবার্তা বহন করে।

...

– এর মধ্যে এমন কিছু তো দেখলাম না। তোমার তো সুখেই থাকার কথা?

– হ্যাঁ, হয়তো সুখেই থাকতাম। কিন্তু-।... বিবাহের অনুষ্ঠানের পর মন্দির

থেকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় এক অসাধারণ সঙ্গীত ভেসে আসছিল। সে এক মাতালকরা সুর! সবার দৃষ্টি তখন আমার দিকে, আমি উন্মাদের মতো খুঁজে চলেছি– কে ওই সঙ্গীতস্রষ্টা? সে উনাস।

একদিকে নতুন পরিচয় ফারাও সিয়ামুনের রাণী। অন্যদিকে হৃদয়। সে এক দুর্বিষহ সময়-যাপন! ফারাও আমাকে প্রচণ্ড স্নেহ করতেন, প্রেমের অভাব ছিল না একবিন্দুও। কিন্তু আমি এক যান্ত্রিক দাম্পত্য ছাড়া আর কিছু ফিরিয়ে দিতে পারছিলাম না। এক-একদিন মনে হত, এই পাপবোধের চেয়ে মৃত্যুও হয়তো কম যন্ত্রণাদায়ক!

এভাবে কিছুদিন গেল। ফারাও বারবার প্রশ্ন করতেন,– সবসময় কেন অন্যমনস্ক থাকি? আমি এড়িয়ে যেতাম। এদিকে বিবাহের পরই পিতা রাজপুরোহিতের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে, জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে লোহিতসাগর পাড়ি দিয়েছেন। নিকটে এমন কেউ নেই, যার সঙ্গে নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারি।...

উনাসের বাসগৃহ ছিল প্রাসাদের উত্তরপ্রান্তে। একদিন, ফারাও তখন রাজসভায়, হঠাৎ প্রবেশ করি উনাসের কক্ষে। সে দৃশ্যত স্তম্ভিত। বলল, 'উনাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

একবার ভাবছি, এ কী করছি! ফিরে যাই, কিন্তু স্থির হয়ে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত পর থেকেই যেন একটি বাজপাখি প্রবল আক্রোশে বুকের ভিতরটা ছিন্নভিন্ন করতে শুরু করল।– না, ভাগ্যে যা থাকে থাকুক, 'উনাস-।'

'আদেশ করুন মহারাণী।'

'মহারাণী নই, আমি মারমিইথ।'

'দেশবাসীর কাছে, আমার কাছে, আপনি তো মহারাণীই।'

'হোক। তবু আমাকে আমার নামে ডাকো।'

'তা কীভাবে সম্ভব? আমি সামান্য বাজনদার। মহামান্য ফারাওয়ের-।'

'সে জানিনা।... আচ্ছা, কয়েকমুহূর্তের জন্য তুমি আমায় রাণী না ভেবে মাত্র কিছুদিন পূর্বের সেই সাধারণ মারমিইথ ভাবার চেষ্টা করো।'

'আমার কাছে আপনি সেদিনও সম্রাটের হৃদয়বল্লভা ছিলেন।'

'কিন্তু আজ তোমার জন্য-!'

'মহারাণী, আমায় ধর্মসংকটে ফেলবেন না। আপনি হৃদয়ের পূজারিনী হতে পারেন। কৃতজ্ঞতা আমার ধর্ম। অনুগ্রহ করে নিজের কক্ষে ফিরে যান।'

...

– জানো পর্যটক, রাগে দুঃখে অপমানে সেদিন আমার যে কী হয়েছিল জানি না! রাজসভা থেকে ফিরে আমার বিধ্বস্ত রূপ দেখে ফারাও কারণ জানতে চাইলেন। আমি সব কিছু বলে দিলাম।

– সে কী!

– হ্যাঁ। ফারাওয়ের হৃদয়ে যেন ঝড় উঠেছিল সেই রাত্রে। কোনো পুরুষই

এমন ঘটনায় রক্তদর্শন না করে শান্ত হয় না। আর সে যদি রাজপুরুষ হয়, তাহলে তো-! তিনি খড়্গ হাতে তুলতেই আশঙ্কায় শিউরে উঠলাম। চরমতম সর্বনাশটি থামানোর প্রচেষ্টায় তাঁর পায়ে ধরে অনুরোধ করছিলাম বিরত হতে। তিনি উপেক্ষা করলেন। রওনা দিলেন প্রাসাদের উত্তরপ্রান্তে।

কিন্তু, ফারাও যত দ্রুততায় রওনা দিয়েছিলেন, ক্রমশ তাঁর গতি হ্রাস পাচ্ছিল। উনাসের বীণাও ঝড় তুলেছিল সেই রাত্রে। দুই পুরুষ-হৃদয়ের ঝড় যেন একাত্ম হয়ে যাচ্ছিল তখন। একসময়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইলেন উত্তর দিকে। তারপর ধীর পদক্ষেপে মন্দির-অভিমুখে এগিয়ে গেলেন। খড়্গটি পড়ে রইল উদ্যানের মাটিতে।

পরদিন সকালে উনাসকে নিজের কক্ষে ডেকে পাঠালেন।

'উনাস।'

'আদেশ করুন।'

'মারমিইথ কাল তোমায় কিছু বলেছে? কী হল? নিশ্চুপ কেন? উত্তর দাও।'

'আমায় ক্ষমা করুন, আমি নির্দোষ। দেবতার নামে শপথ করে বলছি।'

'একবারের জন্যও কি তোমাকে অপরাধী বলেছি? অকারণ ক্ষমাভিক্ষা করছো কেন?'

উনাস নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন একইসঙ্গে ভীত, বিস্মিত, হতাশ ও ক্রুদ্ধ!

ফারাও বললেন, 'তুমি তাকে বিবাহ করো।'

'ধৃষ্টতা মার্জনা করুন,এ কী সম্রাটের আদেশ?'

'সে প্রশ্ন কী প্রাসঙ্গিক? ধরে নাও এক বন্ধু ও প্রেমিকের অনুরোধ।'

'আমার অক্ষমতা ক্ষমা করুন সম্রাট।'

'যদি বলি, এটি ফারাও সিয়ামুনের আদেশ।'

উনাস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'সেক্ষেত্রে আমি নিরুপায়।'

...

– তারপর কী হল?

– বিবাহের পর নগরীর প্রান্তে একটি গৃহে বাস করতে শুরু করি। কিন্তু উনাসকে পেয়েও যেন পেলাম না। রাজপ্রাসাদ ছাড়ার পর থেকে কোনোদিন তাকে বীণা বাজাতেও দেখিনি। সে যেন এক চলন্ত মৃতদেহ! তার নিজস্ব বিষয়ে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হত। সে বিবাহে সুখী কিনা– জানতে ভয় করত। তাকে আয়ত্ত করলেও অধিকার কিছুই ছিল না। আর কিছু না পেয়ে একদিন প্রশ্ন করলাম, 'এখনও কেন আমায় মারমিইথ নামে ডাকো না?'

'আমি অপারগ।'

'একবার বীণা বাজাও অন্তত।'

'বীণা আমি ভেঙে ফেলেছি। আর কোনোদিনই সে বাজবে না।'

'কেন এভাবে শাস্তি দিচ্ছ উনাস?'

উনাস হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'তার আগে বলুন তো, আমি কেন শাস্তি পেয়েছি? কী অপরাধে? রাজ-নির্দেশে আপনি আমার স্ত্রী, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরে আপনার পাশে ওই বীণা কোথায় রাখব? তাই এই হাতদুটোদিয়ে– এই-এই হাতদুটো দিয়ে তাকে গলা টিপে খুন করেছি।'

'তুমি ভুল করেছ উনাস। ওই বীণা, ওই সুর-!'

...

'আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম পর্যটক, একেবারে নিঃস্ব। এরপর একদিন সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। অনেক খুঁজেছি তাকে। যেখানে শুনেছি কোনো বীণার সুর, ছুটে গিয়েছি সেদিকে। পরক্ষণেই মনে পড়েছে– সেই বীণা তখন ভেঙে গিয়েছে।

তারপর একদিন যেমন ফারাওকে হঠাৎ সবকিছু বলে দিয়েছিলাম, তেমনই হঠাৎ একছুটে চলে এলাম পিতার গবেষণাগারে। তার আবিষ্কৃত সেই মমি সংরক্ষণের রাসায়নিক তরল নিজের হাতে নিজের শরীরে ঢালতে শুরু করলাম। বাকিটা পান করলাম একনিঃশ্বাসে। উনাসের মুখে আমার নাম অন্তত একবার শোনার আগে এই শরীরে যাতে পচন না ধরে।

সুমন যেন হতবাক, 'তার মানে এই এতগুলো বছর তুমি-?'

– দীর্ঘ তিনহাজার বছর।... আজ জীবিত নাকি মৃত জানিনা। কিন্তু, আজও প্রতীক্ষায়।

কথায় কথায় ভোর হয়ে এসেছিল। আশেপাশে পাখির ডাক, আর সেই সঙ্গে যেন দূর থেকে ভেসে আসছে মিশরীয় বীণার সুর! সহসা মারমিইথের কণ্ঠে চাঞ্চল্য, 'ওই তো, ওই তো! শুনতে পাচ্ছ, তুমি শুনতে পাচ্ছ? পর্যটক, দোহাই তোমার, এই কাঁচের বাক্সটা তুমি ভেঙে দাও। আমার শরীর থেকে দূর করে দাও এই রাসায়নিক। আমায় মুক্ত করে দাও পর্যটক, মুক্ত-।'

সুমনের ভীষণ ভয় করছে। মমির ক্যাপসুলটা অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল, হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ! চারদিকে ছিটকে যায় কাঁচ। যেন একটা ধাক্কা খেয়ে ও ছিটকে যায় ঘরের একপাশে। জ্ঞান হারায়।

কয়েক ঘণ্টা পরে আধো-ঘুম আধো-জাগরণে ওর চোখের সামনে বারবার ভেসে আসছে মারমিইথের মুখ। তখনও যেন বলছে– 'আমায় মুক্ত করে দাও পর্যটক। আমি আজও প্রতীক্ষায়।'

যেন খুব কাছেই একটা ঝরনা। জলের ঝাপটা আসছে চোখেমুখে। হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসে সুমন। সামনে চিন্তিত মুখে নিশার খান। হাতে জলের বোতল।

– সুপ্রভাত। কেমন বোধ করছ?

– ভালো।

– এসে দেখি মমি-ঘরে অজ্ঞান হয়ে রয়েছ। ক্যাপসুলটা ভাঙল কীভাবে?

– বললে বিশ্বাস করবে?...

মিউজিয়ামের অফিসঘর। সুমন একটা সোফায় আধশোয়া। টেবিলের একপাশে বইয়ের র‍্যাক। একপাশে কিছু কাগজপত্র। সারা ঘরে মিশরীয় লোকশিল্পের নিদর্শন। উত্তরের জানালার ওপরে ঝোলানো রয়েছে একটি কানুন। সুমনের চোখে পড়তেই বিদ্যুৎচমকের মতো ছুটে যায় সেদিকে। বীণার তারে আঙুল ছোঁয়ায়।– কী আশ্চর্য, যন্ত্রটা তেমন যেন অচেনা ঠেকছে না!

নিশার খানও হতবাক।– এই সুর ও পেল কোথায়?

*****

'শিলাদিত্য', ২০১৪

ভূমিকা

অ্যাম্বুলেন্সটা সজোরে ছুটছে। কখনও ডানদিক ঘেঁষে কখনও বাঁয়ে। অফিসটাইমের যানজট, ট্রাফিক সিগন্যাল— কোনো কিছুরই তোয়াক্কা না করে।

পলাশের হঠাৎ মনে হয়, জীবনটাও যদি এমন হত, কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করার অবাধ স্বাধীনতা? গাড়ির গতি আর রাস্তার দুর্গতির কারণে পাশফেরানো সিটে বসে থাকা দায়। ও প্রায়ই ডানে-বামে হেলে পড়ছিল। উলটোদিকের স্ট্রেচারে যে মহিলা শায়িত, যার জন্য এই দুর্দান্ত গতি, সে ঘুমিয়ে না জেগে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়ালে মানুষ ছটফট করে। আর অসহ্যের সীমাও অতিক্রম করলে কেমন একটা নেশা ধরে। একটা আধাঘুম-আধাজাগ্রত দশা হয়। সংসার মহিলার আজ সেই দশা করেছে। জগৎসংসার ভুলিয়ে ছেড়েছে আর কী! শেষ ভরসা হাসপাতাল।

গরম তেলে মুচমুচে ভাজায় পরিণত হওয়ার আগে চারাপোনার গায়ে-হলুদ হয়। সুনন্দা, অর্থাৎ স্ত্রী নামক এই মহিলার সঙ্গে বিয়ের সময় পলাশেরও তা হয়েছে। সে কী পেল্লাই তোড়জোড়, অদৃশ্য এক দাঁড়িপাল্লার একদিকে উঠল ওর ডিগ্রি, বেতন, বিয়ের আগের একটু কালচার-টালচার, বাড়ির সম্ভাব্য-গ্যারেজ স্পেস, পরিবারের জনসাংখ্যিক ক্ষুদ্রতা, মায় অফিসে যে নিজের জলের বোতল নিজে ভরতে হয় না— তার জন্য গ্রুপ-ডি স্টাফ্ আছে— এই খবরটুকুও! পাল্লার অন্যদিকে উঠল চামড়ার শেড, রবীন্দ্রসঙ্গীত, পাতুরির রেসিপি, গ্র্যাজুয়েশনে মাত্র দু-নম্বরের জন্য ফসকে যাওয়া ফার্স্টক্লাস, জীবনে কখনও প্রেম না করার সু-ইতিহাস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবুও পাল্লাটা একটু এদিক-ওদিক হচ্ছিল। নির্লজ্জ লোকেরা এসব ক্ষেত্রে সরাসরি দেনা-পাওনায় চলে যায়। ওদের দুই পরিবার শিক্ষিত, আধুনিক; তাই এই পর্বে পাল্লায় উঠতে শুরু করে অধিবাস আর ফুলশয্যার তত্ত্বের গোঁজ। একদিকে ঢাকেশ্বরীর বেনারসী, অন্যদিকে রেমন্ডসের স্যুট। একদিকে নববধূর মেক-আপ কিট, তে 'কিট'দষ্ট অন্যপক্ষের পালটা চাল, এই নে জামাই-এর জুতো। তত্ত্বের বদলে তত্ত্ব, গোলের বদলা গোল। শালা তুই ব্রাজিল তো আমিও জার্মানি! যদিও পলাশ 'তত্ত্ব' মানে 'থিওরি' বা মতবাদ বলেই জানত!

এরপর, রীতিমতো বংশ তুলে র‍্যাপিডফায়ার। ঠাকুর্দার ধুতি তো ভায়রার শাল, ননদের শাড়ি তো শ্যালকের জিন্স্। অবশেষে, বহুব্যায়ে বহুক্লেশে দাঁড়িপাল্লায় সমতা বিধানের পর ওরা দুজন একযোগে বলল, 'যদিদং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং

মম'। (স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল, ইহারা দুই দেহ এক প্রাণ হইলেন। বি.দ্র.- 'প্রাণ' শব্দটি খলনায়ক অর্থে নয়।)

রাতে বিয়ে তো পরদিন বাসি-বিয়ে। বিয়ে ব্যাপারটা হয়তো একরাতেই বাসি হয়! এরপর বৌভাতে গোটা দুই নিরীহ ছাগলের প্রাণের বিনিময়ে পলাশকুমার পাইকারি দরে আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছার হরিলুটে অংশ নিল (এখানে 'ছাগল' অর্থে ছাগলই বোঝাচ্ছে)। সন্ধে নামতেই পিলপিল জনস্রোত। ঘামে ভেজা তসরের পাঞ্জাবির শাসন অগ্রাহ্য করে গায়ে এঁটে বসা এক সাইজ ছোটো স্যান্ডোগেঞ্জির উঁকিঝুঁকি। কোঁচার আতঙ্কে নড়াচড়া প্রায় সিঁধেল চোরের মতো। অবুঝ বাঁদরের তেলমাখা বাঁশে ওঠার অঙ্কের মতো পা টিপে-টিপে চার কদম এগিয়েই পিছনপানে ভীত দৃষ্টি, পরিস্থিতি নিরাপদ তো? পুরুষের কোঁচা নারীর ভাগ্যের মতো, যখন তখন খুলে যায়!

যাই হোক, এহেন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' পরিস্থিতিতে ওকে প্রায় সাড়ে-ছ-শ পরিচিত, অপরিচিত, অর্ধপরিচিত, সদ্যপরিচিত মানুষজনকে ক্রমাগত ঘাড় নেড়ে যেতে হচ্ছিল। একবার ওর বাবা এসে বলেন, 'ইনি সুজিতদা, আমরা একসঙ্গে চাকরিতে ঢুকেছিলাম।' ও ঘাড় নাড়ল। দাদা কোত্থেকে একজনকে বগলদাবা করে এনে বলল, 'এ পারিজাত, আমার ব্যাচমেট।' ও ঘাড় নাড়ল। মায়ের মিতেনি, কাকার কমরেড, বোনের জাস্ট-ফ্রেন্ড, বৌদির গোপন প্রেমিক, ক্যানকেনে কনেযাত্রী— সবার প্রতিই ওই ঈষৎ স্কন্ধ-আন্দোলন। জেঠু-স্থানীয় একজন বললেন, 'বৌমা ভালোই হয়েছে। তবে আর একটু সেদ্দ হত।'

ও আঁতকে ওঠে- 'অ্যাঁ?'

ভদ্রলোক পান চিবোচ্ছিলেন। নিস্পৃহ মুখে বললেন, 'মাংসটা।'

রাত একটা নাগাদ সব কিছু সাঙ্গ, এবার ফুলশয্যা। এদিকে নববধূ জানালেন, সারাদিনের ধকলে তিনি ক্লান্ত, খুব নাকি ঘুম পাচ্ছে। রোমের পতনে নিরো বেহালা বাজিয়েছিল, আর রোমান্সের পতনে ও ব্যালকনিতে গেল সিগারেট ফুঁকতে। না, এ হতে পারে না। সাত টাকা পিস দরে কেনা একশ আটটা গোলাপে সাজানো খাট, মিহি আলো, আকাশে আধখানা চাঁদ, মন্দ্রসপ্তকে নববধূর ফুরর-ফুরর নাসাবাদ্য— সব মিলিয়ে বেশ প্লেটোনিক পরিবেশ। এমন সময় কিনা-! নিজের চিন্তায় নিজেই হঠাৎ লজ্জা পেয়ে ও আলো নিভিয়ে দেয়।

তাপ-গতিবিদ্যা বা থার্মোডিনামিক্সের সূত্র অনুসারে দুটি অস্তিত্বের নিজের-নিজের বিশৃঙ্খলার যা যোগফল, অস্তিত্ব দুটি জুড়ে দিলে সেই বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে যায়। বিয়ে নামক বস্তুটি চারিত্রিক ভাবেই উত্তপ্ত, আর ওতে গতি না থাকুক দুর্গতি বিলক্ষণ থাকে। ফলে, একবছর যেতে না যেতেই বিয়েটা কেমন একটা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী কর্মরতা হোক বা দুষ্কর্মরতা, আধুনিকা হোক বা প্রাগৈতিহাসিক, ঘরোয়া হোক বা বারোয়ারি, সঙ্গীতজ্ঞা হোক বা সঙ্গীত-অজ্ঞা;- 'তোমার মতো লোকের বিয়ে করাই উচিৎ নয়'— এই বাক্য সমস্ত পুরুষকেই হজম করতে হয়। পলাশও তার ব্যতিক্রম নয়। ফুলশয্যার সেই চাঁদ তখন

কালের অমোঘ নিয়মে শেষমেষ ঝলসানো রুটিতেই পর্যবসিত। আক্ষরিক অর্থেই 'যদিদং হৃদয়ং তব',– দুজনেই সবসময় ভাবে, কী করলে অন্যজন জব্দ হবে! একবার এক বন্ধুর সঙ্গে লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে চলতে চলতে পলাশের এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল। বিজ্ঞ-বিজ্ঞ মুখে ওর সেই বন্ধু বলল, 'তোদের জীবনে একটু অ্যাডভেঞ্চার দরকার। বড্ড ম্যাদা মেরে গেছিস। ওদিকে দেখ।'

একটি মেয়েলি পোশাকের দোকান। শো-কেসের পুতুলের গায়ে সাংঘাতিক রকম ফিনফিনে সব রাত্রিবাস। ওরে বাবা, এ বস্তু পুতুলের গায়ে দেখলেই শরীর আনচান করে, দাম দেখে আরও বড়ো ঝটকা!– বলে কী? চার হাজার! রাত এগারোটায় গায়ে চড়িয়ে সোয়া-এগারোটায় যে-জিনিস একটানে খুলতে হয়, তার জন্য কিনা এক মাসের মুদিখানা-খরচ!

ওর ওই তো বউ,— লাল থেকে ফ্যাকাশে হওয়া বিপত্তারিণীর সুতোয় শোভিত যার বাহু, অন্তত কয়েক গোছা সেফটিপিন যার কণ্ঠে সবসময় ঝোলে তান্ত্রিকের গলায় রুদ্রাক্ষের মতো,– সেই বঙ্গবধূর অঙ্গে এ বস্তু রঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু জাগাবে না। ও বলল, 'মাঝরাতে যে বাড়ির খাটের তলায় ইঁদুরছানা নকুলদানা ধাওয়া করে, সে বাড়িতে এই জিনিস? বৈষ্ণবের পেটে বিরিয়ানি সহ্য হয় না বাপ!'

ততদিনের একটি নিদারুণ উপলব্ধি— বউরা আসলে শৌখিন গাড়ির মতো। বাপের বাড়ি নামক শোরুম থেকে বেশ ঝকঝকে-তকতকে বেরোয় বটে, তারপরেই শুরু রোজ রোজ স্পেয়ার পার্টস বিগড়ানোর পালা। আজ মাথাধরা, কালবুক ঢিপঢিপ, পরশু অম্বল, তরশু দাঁতে ব্যথা, বাপরে বাপ! এদিকে বছর-তিনেক যেতে না যেতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সাবানের বিজ্ঞাপনের ঢঙে 'ওয়ান প্লাস ওয়ান ফ্রি',– যমজ। শিশুদ্বয়ের পিতামহ হাসপাতালেই তাদের ডাকনাম ঠিক করে ফেললেন– গৌর-নিতাই। একুশশতকের দোরগোড়ায় এমন মধ্যযুগীয় নাম? কোনো মানে হয়? অবশ্য ছন্দ মিলিয়ে তাদের ভালোনামও রাখা হয়েছিল,– শুভব্রত আর দেবব্রত।

এদিকে তারা যত বড়ো হয়, গৌর-নিতাইয়ের বদলে জগাই-মাধাই-ঘটিত গুণ তত বেশি করে প্রকাশ পেতে শুরু করে। উত্তরপুরুষের নাম নির্বাচনে চরম অদূরদর্শিতার প্রমাণ রেখে ওর পিতৃদেব একদিন বহুদূরের যাত্রায় রওনা দিলেন। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি! শেষদিকে বৃদ্ধ পিতার শিশুসুলভ আচরণ, প্রাগৈতিহাসিক চিন্তা-ভাবনা— এসব নিয়ে অস্বস্তির অন্ত ছিল না। তার যৌবনের গ্যাসবেলুন-মার্কা গল্প নিয়ে নীরব ব্যঙ্গের অন্ত ছিল না। কথায় কথায় 'আমার বাড়ি', 'আমার পরিবার', ইত্যাদি সামন্ত প্রভু গোছের কথাবার্তায় বিরক্তির অন্ত ছিল না। কিন্তু, সেদিন তার জীবনের অন্তে মনে হচ্ছিল— কী যেন একটা নেই, কী যেন একটা চলে গেল।

শ্মশানের সেই মুহূর্তগুলি, সমস্ত মায়া-মমতা, জ্বালা-যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে এক বৃদ্ধ চলেছে তার শেষ যাত্রায়। সত্যি, মুখাগ্নির চেয়ে নির্মম, নিষ্ঠুর সত্য একজন

সন্তানের জীবনে আর নেই। উনুনে হবিষ্যি ফুটছে টগবগ করে। কুশাসনে বসে হঠাৎ ওর মনে হয়, আজ থেকে ও-ই এই পরিবারের মাথা।

অবশ্য ক-দিন যেতে না যেতেই প্রমাণিত হয়, ও মাথা হলে ব্রতদিগের মাতৃদেবীটি গর্দান! গর্দান যেদিকে যায় মুন্ডুও যায় সেদিকে। বেগড়বাঁই করলে ঘাড় মটকে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

একজন ছাপোষা পুরুষ বা তার জীবনের শতকরা নব্বই ভাগই বড়ো মর্মান্তিক। বুক ফুলিয়ে বলার মতো কিছুই থাকে না। কয়েক দশক আগেও 'দুই ছেলের বাপ' হওয়ার মধ্যে বেশ একটা সামনের টেবিলে পা তুলে চেয়ারে বসার মতো আমেজি ব্যাপার ছিল। ও নিজে বাবা হয়ে দেখল সেসব হিসেব উলটে গিয়েছে!

এখন দুনিয়ার ইক্কিরিমিক্কিরি-ধাইকিক্কিরি মার্কা ইংরেজি গান না শুনলে ছেলেরা গাঁইয়া হয়। গণ্ডাচারেক বান্ধবীর সঙ্গে ফস্টিনষ্টি না করলে আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ে যায়। ছেলের বাপ হয়েও কপালে কি জামাইবরণ নাচছে? তারপরে ওই আইটি না ভাইটি কী-এক হয়েছে, একমাত্র ও লাইনেই নাকি বরাত খোলে। মানিকজোড়ের বয়স পনেরো হতেই কম্পিউটার কেনা হল বটে। কিন্তু মাথায় ঢুকত না যন্তরটির সঙ্গে কী এমন পড়াশোনা, যে ঘরের ছিটকিনি না তুলে করা যায় না? পাড়ার দে-বাবুকে দেখত, এতবড়ো ইঞ্জিনিয়ার। রায়বাবুকে দেখত, এতবড়ো ডাক্তার। গোটা এলাকা এদের একডাকে চেনে। ও প্রায়ই ভাবত, পনেরো বছর বয়সে তারা লেদমেশিন ঘাঁটতেন, না ছুরি-কাঁচি হাতে পেটকাটা প্র্যাকটিস করতেন?

শুভ চাকরি পেয়েই বম্বে চলে গিয়েছিল। ফ্ল্যাটও কিনেছে সেখানে। তারপর সেই যে বিদেশ গিয়েছে, এখন সে দেশেরই নাগরিক। 'বিদেশযাত্রা তো নয়, অগস্ত্যযাত্রা! এদিকে বুড়ো বাপ যে বিন্ধ্যপর্বতের মতো সেই থেকে বাঁকা-পিঠে দাঁড়িয়ে, কোন শালা কেয়ার করে?'

পলাশ লজ্জা পায়, নিজের ছেলেকে 'শালা' বলাটা ঠিক হয়নি। মাঝেমাঝে ফোন-টোন করে অন্তত। অবশ্য বাবার সঙ্গে কথা মাত্র দুই— 'তোমার ব্যথা কেমন আছে?' আর 'ঠিকমতো ওষুধ খাচ্ছ তো?'

বছর পাঁচেক আগে স্পন্ডিলাইটিসের ব্যথা উঠেছিল। চারবছর হল সেরেও গিয়েছে। সাত ঝামেলায় ছেলে তা ভুলে যায়! তার মায়ের প্রশ্নও মাত্র দুই, 'কবে আসছিস?' আর 'ওখানে মাছ-টাছ পাওয়া যায়?' পলাশ দেখে, সারাজীবন বিষ্ণুপুরের তাঁত আর উত্তমকুমারে কাটানো আহাম্মক মহিলা ছেলের মুখে বরফের পাবদা আর ইলিশ-তুল্য মিল্কফিশের গল্পেই আনন্দে আত্মহারা। যেন বিশ্বজুড়ে কয়েকটি মাছের আড়ত খুললেই সব মাৎসন্যায় থেমে যাবে!

সারাজীবন ল্যাঙটের কাপড়ে ফুলপ্যান্ট বানিয়ে হাতে রইল পেনসিল, চিবিয়ে ঝুরঝুরো করলেও পেট ভরে না। ভেবেছিল রিটায়ার করে পি.এফ., পেনশনের ভরসায় লেংচে লেংচে চিতেয় উঠবে;– কপালে নেই। উদরে লাথি

মেরে উদার-অর্থনীতি পালনের সখ হয়েছে সরকারে!

সেদিন সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ও বাজারের পথে। অঞ্চলের পুরনো বাসিন্দা, যেখানেই যাক চেনা মুখ একজন না একজন পাবেই। আজও তাই। কিছুক্ষণ বিভিন্ন রকম সবজির দামের ছ্যাঁকায় যখন হাঁড়িমুখ করে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ পাশের গলির শ্যামবসাকের সঙ্গে দেখা। মুখোমুখি হতেই একগাল হাসি, 'কী ব্যাপার দাদা, সকাল সকাল মুখটা এমন ব্যাজার কেন?'

– মুখ ব্যাজার বাজারের দয়াতেই। বেগুন যে বেগুন, সে কিনা আমেরিকান ডলারকে টেক্কা দেয়!

– সে আর কী করবেন বলুন! তা আছেন কেমন?

– বড়ো দুশ্চিন্তায় আছি। চাকরি তো আর বছর-খানেক। এখন আবার তোমাদের এই সরকারের জ্বালায় পেনশনটুকুও হাতে পাব কিনা বুঝছি না। সব বাজারে খাটবে!

– আগেই খারাপ ভাবছেন কেন? পেনশনের টাকা বাজারে এলে অর্থনীতির উন্নতিও হতে পারে।

– শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে ঘরের বউ-মেয়েকেও বাজারে নামিয়ে তোমাদের ওই 'অনর্থ'-নীতির কোনো উন্নতি তো হল না। সেখানে বিদুরের খুঁদকুড়ো পেনশনের টাকা কোন বাঘ মারবে?

– আপনি বড্ড পেসিমিস্টিক।

– উঁহু, বাছুর।

– বাছুর?

– হ্যাঁ বাছুর। যাদের জন্মই হয় অনাহার আর অপুষ্টিতে ভুগতে। নইলে না পাবে দুধ, না থাকে সন্দেশ-রসগোল্লার অস্তিত্ব। যাক গে, আর সময় নেই। দশটা এক হলেই হাফ্-ডে, চলি।

আসলে জীবন বোধ হয় ওই উদার-অর্থনীতির মতো। সবকিছু ফিক্সড ডিপোজিটের নিরাপদ জিম্মায় রেখে শুয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাবে,– তা চলবে না চাঁদ। পাকা শেয়ার-খেলুড়ের মতো পোর্টফলিও বানাতে হয়, কড়া নজর রাখতে হয়, সময়মতো স্ট্র্যাটেজি, কম্পোজিশন— এসবের অদলবদল করতে হয়। পুরুষের অস্তিত্ব শুরুই হয় রোজগেরে হওয়ার পর থেকে। তার আগে সে 'ছেলে', পুরুষ নয়। প্রথম ক-দিন চাকরি অন্ত প্রাণ, যেন কর্মযোগের তপস্বী।– আবোদা বলদের লেজ মুচড়ে দিলে যেমন শিং উঁচিয়ে ছোটে! বিয়ে-থা হলে কিছুদিন বউ অন্ত প্রাণ। তখন রূপ লাগি আঁখি ঝুরে। ব্যাকগ্রাউন্ডে রসলুনবাঈয়ের ঠুমরী। 'সাঁঈয়া মো সে কাহে করত ঠিঠৌরি'। জীবনের খেলাঘরে শুধু তুমি আর আমি। গাধার পিঠে ভারী বোঝা চাপানোর আগে তেলমালিশের মতো ব্যাপার।

এরপর ছেলেপিলে। কাঁধে চড়িয়ে চিড়িয়াখানা, তিন নম্বর মাপের ফুটবল, প্লাস্টিকের ফটফটাফট পিস্তল, টুনটুনির বই, কেজি কেজি চকলেট। যাতে বিশ বছর পর কথায় কথায় শোনানো যায়, 'তোর জন্য এত করলুম!' তারপর কিছুদিন

বাপ-মা;- অম্বলের রুগিকে রোজ দু-বেলা মোসাম্বির রস খাওয়ানোর হিড়িক! সম্পত্তির ভাগ বা পাপস্খালন— যে কোনো কারণেই হতে পারে।

মোদ্দা কথা, ভবিষ্যৎ নির্ভর করে– কে কত পোক্ত আর হিসেবি ইনভেস্টর, তার ওপর। বেশিরভাগ লোকই গুলিয়ে ফেলে। সংসার তখন বার্ধক্যের বারাণসীর বদলে যেন যুদ্ধ শেষের কুরুক্ষেত্র। দুই বুড়োবুড়ি একে-অপরকে একই কথা বলে যায়,– 'সারাটা জীবন জ্বালিয়ে খেল'। প্রথমে নিঃশব্দে, পরে সশব্দে। এমনিই এই বয়সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে খানিকটা সতীন-সতীন ভাব আসে। আহা, দু-পাশে যুযুধান দেবযানী-শর্মিষ্ঠা, মধ্যে অকালবৃদ্ধ যযাতির মতো সংসার। কলির পুরুদের বয়েই গিয়েছে যেখানে-সেখানে যৌবন খরচ করতে!

দু-হাতে দুটি বাজারের ব্যাগ নিয়ে কোনোমতে টাল সামলাতে সামলাতে পলাশ বাড়ি ঢোকে। ছোটোছেলে দেবু খবরের কাগজ বগলে বাথরুম অভিসারে। এ'ছোঁড়া সব সময় একসঙ্গে অন্তত দুটি কাজ করতে চায়। স্নান করতে করতেই দাঁত মাজে। খেতে খেতেই জামা বদলায়। পলাশ বিড়বিড় করে ওঠে, 'কী ছাতার চাকরি করে কে জানে, সব সময় ব্যস্ত!'

– আবার শুরু করলে? চুপচাপ অফিস যাও আর আমাকেও যেতে দাও।

– চুপচাপ অফিস যাও!– নিজে বাথরুমে ঢুকলে কচি মেয়ের মতো পাক্কা একঘণ্টার মামলা, বাপ কি রাস্তার কলে লাইন দেবে? এক-এক সময় মনে হয়, ভগবান একটা লেজ যদি দিত, এই ছাতার সংসারে লংকাকাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়তুম।

সুনন্দার হাতে ব্যাগ হস্তান্তর করার সময়ও ওর ব্যাজার-মুখ, 'তিনদিনের আগে বাজারের কথা বলবে না, এই দিয়ে চালাও।'

– মুখটা মোছো। এহ্, ঘেমেনেয়ে একসা হয়েছে একেবারে! সবসময় ছেলেটাকে খ্যাচখ্যাচ করো কেন? এমনিই ওর মনখারাপ।

– সে মন সবারই খারাপ। তা স্যারের কী হয়েছে?

– অপর্ণার সঙ্গে ঝগড়া-।

– সে আবার কে? ওহ্, বান্ধবী? বাঁচা গ্যাছে।

– ও মা, সে কী কথা! ওদের এতদিনের সম্পর্ক-?

– তোমার সামনে নাকে কাঁদছিল বুঝি? ওকে বলো– দুঃখ করে লাভ নেই, নির্ঘাত শাঁসালো পার্টি জুটেছে। হাতের কাছে স্পিডবোট থাকলে কি কেউ সাধ করে ডিঙ্গিতে ওঠে?

– তোমার মুখে কিছুই আটকায় না! মেয়েটা মোটেই তেমন নয়, আমি কথা বলেছি।

– তাহলে মহারাজই ধেড়িয়েছেন। গাঁটে-গাঁটে রজতজয়ন্তী পার হওয়া মেয়েকে ডাকে কিনা 'বেবি'! এই খোকা-খুকু দিয়ে প্রেম হয়! আর তাছাড়া অমন রূপে গণেশ গুণে মহিষাসুরকে কে-ই বা সহ্য করবে? বীরপুরুষের যত বীরত্ব তো শুধু মেয়েদের সঙ্গে। ক-দিন আগে শুনছিলুম তিনি টেলিফোনে ধমকাচ্ছেন,– কোথায় তুমি? কার সঙ্গে? দাদার বন্ধু? কেমন বন্ধু? ওখানে কী করছ?... ছেলে

'প্রেম' তো করে না, 'সন্দেহ' করে।

– তোমার সবসময় যত আজেবাজে কথা।

– জানোই তো, ঘাঁটাও কেন? যাকগে, নবাবজাদাকে গোসলখানা থেকে বেরোতে বলো। আমার কি অফিস-টফিস কিছু নেই? লাটসাহেবের বাচ্চা! ডিউড-অফ-এঁরেদা তো নয়, যেন ডিউক-অফ-এডিনবরা!

প্রতিটা দিনের শুরু মোটামুটি এইরকমই। সত্যি বলতে কী গোটা জীবনটাই বড্ড গতানুগতিক। হুড়মুড়িয়ে আসা সকালে বাজার যাওয়া নিয়ে কালোয়াতির শুরু, রাতে মশার পিনপিনের সঙ্গে তালে তালে নিজেকে চড়িয়ে আর থাবড়ে সঙ্গত দিতে-দিতেই বয়স হঠাৎ ষাটের কোঠায়।

তবে এদিন সকালটা ছিল গতানুগতিকতার বাইরে, স্নান-খাওয়া সেরে অফিসে রওনা দেওয়ার মুখে রান্নাঘরে হঠাৎ শব্দ! বাবা-ছেলে ছুটে এসে দেখে এঁটো বাসনগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে। ঘরের একপাশে লুটিয়ে জ্ঞানহীন সুনন্দা!

কিডনি প্রস্তরীভূত। লিভারের ভার বেড়েছে ঋণের বোঝার মতো। স্নায়ুতন্ত্রও হরতালে উদ্যত। এক দশক আগে অবসরপ্রাপ্ত জরায়ু তার আয়ুষ্কালের শেষ প্রান্তে হিক্কা তুলছে।— এক কথায় মধ্যবিত্তের 'মাসের শেষ'। পোড় খাওয়া গৃহিণী বলেই সুনন্দা এই অবস্থায় চালিয়ে যাচ্ছিল এতদিন!

ডাক্তার বলল, অন্তত গোটা তিনেক অপারেশন ছাড়া সানসাইন অসম্ভব। হাসপাতাল বলল, প্যাকেজ নিলে খরচ কম পড়ে। পলাশের আশ্চর্য লাগছিল, প্যাকেজ? এ কি হাসপাতাল, না ট্রাভেল এজেন্সি? আর এই কম খরচের নমুনা! টাকার অঙ্ক নিযুত ছাড়িয়ে কোটির কাছাকাছি প্রায়! ঠিক তখনই আড়কাঠি-গোছের একজন লোক হাতের তালুতে লুকানো একটি ছবি দেখিয়ে বলল, 'লাগবে নাকি? একদম ফ্রেস মাল আছে দাদা, ফুলগ্যারান্টি। কমের মধ্যে করিয়ে দেব।'

ছবিটি অন্য এক হাসপাতালের। সেখানে ইনোগুরেশন অফার চলছে। কিছুটা কম খরচে হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে ইনস্টলমেন্টের সুবিধা। আরও একবার গোটা কলকাতার চক্কর কেটে ওরা সেই হাসপাতালে পৌঁছালে সেখানের আপ্যায়িকা জানাল টেন পারসেন্ট অ্যাডভান্স দিলে ইনস্টলমেন্টের সুবিধা হবে। তবে দেখাশোনা ফ্রি, কেনাকাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। পলাশ হিসেব কষে দেখে, এদের এই 'টেন পারসেন্ট'-এর কলেবর তার একবছরের সেন্ট পারসেন্ট বেতনের চাইতে ঢের বড়ো! অগত্যা দেবুর ক্রেডিট-কার্ড এখন গৌরী সেন। আপ্যায়িকা গালে টোল ফেলে ওদের গোটা-কতক কাগজে সই-সাবুদ সারতে বলল।

ব্যাংকের লোন-এগ্রিমেন্ট আর হাসপাতালের বন্ড,— এই দুই বস্তুর যথাক্রমে ধনে ও প্রাণে মারার প্রতিটা শর্ত খুঁটিয়ে পড়তে হিমালয়তুল্য বুকের পাটা লাগে। নিজের সাক্ষরতার জন্য আফসোসও হতে পারে। যাই হোক, ভর্তি হতে খুব বেশিক্ষণ লাগে না। ডাক্তার জানাল, রুগি সেদিন অবজারভেশনে থাকবে, অপারেশন পরদিন সকালে।

'এক্সকিউজ মি। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে, এখানে আর থাকা যাবেনা স্যার।'– উর্দিপরা একজন নার্স পলাশের সামনে। পলাশ দ্রুত নিজেকে সামলে নেয়।

– মিনিট-পাঁচেক থাকতাম, বুঝতেই তো পারছেন-।

নার্সটির গলায় পেশাদারিত্ব, 'পারছি স্যার। কিন্তু এটা ফিমেল ওয়ার্ড, অন্য পেশেন্টরা অবজেকশন জানাতে পারে।'

করিডোর ধরে ধীর পায়ে লিফটের দিকে যেতে যেতে পলাশ পিছনে ফিরে তাকায়। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দরজাটা কাঁচের। তার গায়ে বাষ্প জমে ভিতরের বেডে সুনন্দার মুখটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক করে ওঠে— আজ ওদের দুজনের মাঝে ওই ঝাপসা আবরণ ক্রমশ যেন ওদের একে-অপরের থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে! কেমন একটা ভয় গ্রাস করছে ওকে। বাষ্প শুধু দরজায় জমেনি, ভিজে যাচ্ছিল ওর দু-চোখের জানালাও।

দিন দুয়েক হল সুনন্দা হাসপাতালে। পলাশের চোখে ঘুম নেই। অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় এপাশ-ওপাশের পর একটা চেয়ার টেনে ও জানালার মুখোমুখি বসে। চোখের সামনে মাঝরাতের রাস্তা যেন ওর জীবনের মতোই সারাদিনের ব্যস্ততা ফুরিয়ে এখন শূন্য। এলোমেলো হাওয়ায় দু-একটা কাগজের টুকরো পলিথিন উড়ছে। আবর্জনার বাঁটোয়ারা নিয়ে দুটি কুকুরের মন্থর বচসা। বাকিরা এখানে-ওখানে গুটলি পাকিয়ে। স্ট্রিটল্যাম্পের নীচে পাড়ার পাগলটা ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। পলাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'ভাগ্যের কী পরিহাস, এতবড়ো পরিবারের ছেলে। সে কিনা আজ রাস্তায় শুয়ে শীতে কাঁপছে!'

ছেলেটির জন্য খুব মায়া হচ্ছিল। ও নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে আসে। ছেলেটির গায়ে ওর কম্বলটা বিছিয়ে দিতেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ওর হাতে জোর কামড় বসিয়ে দেয়। পলাশ ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠতেই আশেপাশের কুকুরগুলো ডাকাডাকি শুরু করে।

দেবুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তাকে ছুটে আসতে দেখে ছেলেটি পলাশের হাত ছেড়ে দেয়। ছেলেটির গায়ে বাড়ির কম্বল দেখে দেবুর রেগে যায়।– 'মাঝরাতে সমাজসেবার শখ জাগল তোমার!'

দেবু ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে, ব্যথা তখনও কমেনি। মনটা বড়োই অস্থির। সুনন্দা হাসপাতালে, একাকিত্ব অসহ্য লাগছিল। নিজের ভিতরটা নিজেকেই যেন বিদ্রূপ করে চলেছে, 'কী রে বুড়ো, অমন পাংশুটে মুখে বসে আছিস কেন? উউউ, প্রেম যেন উথলে উঠছে! মনে রাখিস, বুড়ি টসকে গেলে তুইও ছবি। তখন নিজের জীবনের এমন হতচ্ছেদ্দ দশার জন্য দায়ী করার আর লোক পাবি না। তবে তোর কোনো ভরসা নেই, বউ গেলে তখন ছেলেদের কাঠগড়ায় তুলবি। শালা গুবরে পোকা, তোর গোবর মেখেই সুখ!'

পেরিয়ে আসা জীবনে বহুবার ওর মনে হয়েছে— ঠিক এমন নয়, অন্যকিছু

চাই। এই 'অন্যকিছু' পেলেই জীবনটা শুধরে যেত। এক-এক সময়ে এই কাঙ্ক্ষিত 'অন্যকিছু'র রূপ হয়েছে এক-একরকম। আর প্রতিটি ইচ্ছাপূরণের ব্যর্থতায় সুনন্দাকে মনে হয়েছে কারণ। ইচ্ছে ছিল আর একটু বড়ো বাড়ি বানানোর, সাধ্যে কুলোয়নি। মনে হয়েছে, সুনন্দা সাশ্রয় করতে জানে না। দামি রেস্তোরাঁয় ঢোকার ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখে মনে হয়েছে, সুনন্দা বড্ড গাঁইয়া, বড্ড কৃপণ। ওর বাবার প্রতি সুনন্দার যেন ভীষণ গা-ছাড়া ভাব। সুনন্দার আদরেই দেবুটার কিছু হল না।

আরও পিছনে গেলে ওর এমনও মনে হয়েছে যে, সংসারের জোয়াল টানতে না হলে ও আরও অনেক বড়ো কিছু হতে পারত। তখন সুনন্দার থেকে অনেক ভালো কেউ আসতে পারত তার জীবনে।

ও জানে, যতই সুখী-জীবন নামের চকচকে রাংতা মেখে ঘুরুক না কেন, ভিতরে যে নরক গড়েছে,– গড়েছে নিজের হাতে। সুনন্দা আসলে ওর নন্দ ঘোষ, ও যার কিলমারার গোঁসাই। পলাশের পায়ের তলার জমি যেন সরে যাচ্ছিল, পৌরুষ ফুরালে বিস্কুটের কৌটার তলানির মতো পড়ে থাকে চারটে আধভাঙা শিভ্যালরি। এমন অচল পয়সা পারানি হলে কপালে কোনো সোনার তরী দূরে থাক, ডিঙিনৌকাও জোটে না। স্রোতে হাবুডুবু খাওয়াই তখন ভবিতব্য।

সব সময় আতঙ্ক— এই বুঝি সব ভেসে গেল! আতঙ্কিত মানুষ চিৎকার করে, বেপরোয়া হাত-পা ছুঁড়ে, আঁচড়ে-কামড়ে চারপাশের সবাইকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। পলাশও তা-ই করেছে। আজ ক্ষতবিক্ষত একজন হাসপাতালের বিছানায়, একজন বিদেশে পালিয়ে বেঁচেছে, অন্যজন উপায় নেই দেখে পড়ে আছে। ও ভেবে পায় না, উত্তরাধিকারে কী দিয়ে যাবে ওর সন্তানদের,– আতঙ্ক?

সুনন্দা অপারেশনের পর বাহাত্তর ঘণ্টা অবজার্ভেশনে। অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। উন্নতি কিছু না হলে হয়তো আরও একটি অপারেশন। শুভটা কি ওর মায়ের দেখা পাবে? পলাশ আর ভাবতে পারছিল না। সত্যিই ও আতঙ্কিত, হতভম্ব। সেদিন রাতে, সম্ভবত জীবনের দীর্ঘতম রাতে, সমস্ত বাস্তব ক্রমশ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছিল। সারাজীবন ছুটে চলার পর উপলব্ধি হচ্ছিল,– গন্তব্য দূরে থাক, এক-পা পথচলাও হয়নি। নতুন করে চেষ্টা করা কি সম্ভব, অন্তত আর যে ক-টা দিন বাকি আছে?

কিছুতেই সন্দেহ কাটছিল না। শিশুর বোধ আর বৃদ্ধের শরীর নিয়ে ক-পা-ই বা হাঁটা সম্ভব? শুধু সুনন্দার জন্য উৎকণ্ঠাতেই নয়, নিজের অক্ষমতাতেও কান্না আসছে। সবকিছুর জন্য দায়ী সে নিজে। পৃথিবী এক আজব গ্যাঁড়াকল— যা দেবে, ফেরত তা-ই আসে।

সকাল হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে দেবু টেবিলে চায়ের কাপ রেখে গিয়েছে। সারারাত ঘুমোয়নি বুঝে পলাশকে একটু বকাবকি করেছিল। ওর অবাক লাগছিল। যে ছেলে অফিস থাকলেও সকাল আটটার আগে কোনোদিন ঘুম থেকে ওঠে না, সে সাতসকালে বাবার জন্য চা করে আনছে!

এর মধ্যে দেবুর সঙ্গে শুভর কথা হয়েছে। সে-ও চেষ্টা করছে দেশে

ফেরার। ধীর চুমুকে চা শেষ করে কাপটি টেবিলে রাখার সময় পিছন থেকে দেবু ডাকল। স্নান-টান করে সে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সঙ্গে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। বান্ধবী বোধ হয়। দেবু বলল, 'ও অপর্ণা। ... হাসপাতালে যাচ্ছি। ও তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। হাতটা দেখিয়ে নিও, ভালো করে ড্রেসিং করানো দরকার।'

– খামোকা মেয়েটাকে কষ্ট দিবি কেন? আমি নিজেই চলে যেতাম।

– তোমাকে আমি চিনি বাবা। নিজের থেকে যাবে তো না-ই, বসে-বসে সাত-পাঁচ ভাববে। আর একটা কথা, ডাক্তার দেখিয়ে এসে প্রথমে কিছু খাবে, তারপর হাসপাতালে যেও। তোমার আলসারের ধাত, খালি পেটে অতক্ষণ থাকা ঠিক নয়। অপর্ণা কিছু একটা করে দেবে।

পলাশ আবার বাধা দিতে যায়, 'শুধু শুধু মেয়েটাকে ঝামেলায় ফেলছিস। তোর মায়ের এতবড়ো অসুখ, আমি কি বাড়িতে বসে থাকতে পারি?'

এবার অপর্ণা ওকে থামায়, 'আমার কোনো কষ্ট হবে না মেসোমশায়, একদম এসব ভাববেন না।'

অচেনা পরিণত ভাব দেবুর গলায়, 'জানি তোমার চিন্তা হচ্ছে। আর এ-ও জানি, চিন্তায় নিজের কথা ভুলে যাবে। হাসপাতালে আসতে নিষেধ তো করছি না, শুধু ইনজুরিটা একবার ডাক্তারকে দেখিয়ে নিতে বলছি। এখন তোমার সুস্থ থাকা খুব দরকার, ওখানে আমি তো রয়েছিই।'

অপর্ণা ভিতরের ঘরে কিছু একটা করছে। ঠিক যেন আগাম ভবিষ্যতের ছবি! এতক্ষণে দেবু হাসপাতালে পৌছে গিয়েছে বোধ হয়। পলাশ নিজের ছেলেকে ঠিক যেন চিনতে পারছে না। বড়ো হওয়ার সময় থেকে ওরা দুই ভাই ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছিল। দেবুটা একবাড়িতে থাকলেও কথাবার্তা বিশেষ কিছু হত না। পিতা-পুত্র একে-অপরের কাছে যেন ভিনগ্রহের বাসিন্দা। ছেলেদের প্রতি খুব একটা আশা-ভরসা ছিল না ওর। অথচ, গত ক-দিন ধরে অদ্ভুত একটা নির্ভরতা খুঁজে পাচ্ছে দেবুর মধ্যে। ভাবতে ভালো লাগছে, সে ওরই সন্তান।

কলিংবেলের শব্দ হয়। অপর্ণা ভিতর থেকে ছুটে আসে,– 'মেসোমশায়, শুভদা এসেছে! আপনার ফোনটা বোধ হয় বন্ধ, ও ফোন করেছিল।'

শুভ! কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা খুলতে যায় পলাশ। অনুভব করে, ছেলের প্রতি ওর আর কোনো অভিযোগ নেই।

বেশ কয়েক বছর পর তখন পিতা-পুত্র মুখোমুখি।

– কিছুদিন থাকছিস তো?

– আপাতত দু-মাস। একবার যেতে হবে। তারপর পার্মানেন্টলি ফিরব।

– তোর কাজ?

– এখানেই জুটিয়ে নেব কিছু একটা। দেবু বলছিল, তোমাদের বয়স বাড়ার পর থেকে ওকে সবসময় রেফারির কাজ করতে হয়। একজন লাইন্সম্যানেরও তো দরকার আছে।

পলাশ হাসার চেষ্টা করে, কিন্তু গলা ধরে আসছিল, 'তোদের মা-!'

– চিন্তা কোরো না বাবা, আমরা আছি। তেমন হলে মাকে বম্বে নিয়ে যাব। দরকারে বিদেশেও।

ধীরেধীরে যেন পিতা-পুত্র সম্পর্কের ভূমিকা অদল-বদল হচ্ছিল চোখের সামনে। সুনন্দা শেষ পর্যন্ত সুস্থ হবে কিনা জানা নেই। সেই নিয়ে উৎকণ্ঠা তখনও থাকলেও বড়ো একটা অসুস্থতা যেন কেটে যাচ্ছিল। সারা ঘরে যেন জ্বর-শেষের রোদ-ঝলমলে আলো!

দিন সাতেক পরের কথা। শেষ পর্যন্ত সুনন্দার বম্বে বা বিদেশ— কোথাও যাওয়া হয়নি। তার নিষ্প্রাণ শরীর বৈদ্যুতিক চুল্লির গর্ভে ঢোকামাত্র গায়ের কাপড়টা দপ করে জ্বলে ওঠে। তার থেকে একটু দূরে পলাশের দৃষ্টি রাতের আকাশে স্থির। একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। কোটি-কোটি তারা জ্বলজ্বল করছে। চুল্লির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা কানে আসতেই বুকে সজোর ঝাঁকুনি লাগল। এ এক অদ্ভুত শূন্যতা!— মনে ভাবনা নেই, মুখে কথা নেই, চারপাশের এত জীবিত আর মৃত মানুষ, চিৎকার, ফুল, ধূপের গন্ধ, কান্না, মন্ত্রোচ্চারণ।— কোনো কিছুই ওকে স্পর্শ করছিল না। রওনা দেওয়ার সময় শুভ ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিল। দেবু ছিল অস্বাভাবিক গম্ভীর। এখন দু-ভাই আর অপর্ণা একটু দূরে গাছতলায় কিছু একটা আলোচনা করছে। পলাশ কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই। দেবুর ডাকে সম্বিত ফেরে, 'বাবা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ। সব কিছু শেষ হতে সময় লাগবে। তুমি ফিরে যাও। অপর্ণা তোমার সঙ্গে যাবে।'

দুই ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে বড়োরাস্তায় ট্যাক্সিতে ওঠার সময় কথাগুলো কানে বাজছিল,- 'ফিরে যাও। ... সবকিছু শেষ হতে সময় লাগবে।' রাস্তার একপাশে ওরা দু-ভাই। পলাশের চোখ ঝাপসা। ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে ও শ্মশানের দিকে চেয়ে অস্ফুটে বলে ওঠে— 'ক্ষমা করো।'

তখন শহরের বুকে রাত নেমেছে। পলাশের চোখের জল কিছুতেই বাঁধ মানছে না। ওর একটা হাত অপর্ণার মুঠোয়। সে বলল, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

অবাধ্য ক্ষতস্থানে হাজার ওষুধ পড়লেও কিছুতেই যেন রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে চায় না। জামার আস্তিনে চোখ মোছে পলাশ। ও নিরুত্তর। অপর্ণা কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে আরও একবার বলে, 'বাবা, আপনার কি-?'

পলাশ ওর মাথায় হাত রাখে।– 'না মা, আমি ঠিক আছি।'

দু-পাশে তখন ব্যস্ত শহর প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে।

*****

'শিলাদিত্য', উৎসব সংখ্যা ২০১৪

পাঁঠা ও ময়ূরপঙ্খি

নদী তো নয়, নদ। বর্ষা এলেই ঘুম-ভাঙা কুম্ভকর্ণ! ত্রিভুবনে কার সাধ্যি তাকে সামাল দেয়? এখন অবশ্য বাঁধ হয়েছে। ফি-বছরের বন্যার হাত থেকে মুক্তি মিললেও এলাকার মানুষ এ জলধারাকে সমীহ করে চলে। প্রবীণদের স্মৃতিতে আজও বন্যার সেই উথালপাথাল ঢেউ আর জংলি হাতির মতো বেপরোয়া ধ্বংসলীলা।

নদী-লাগোয়া একটুকরো মাঠ। একটি ছোটো টিলা, শিবমন্দির। তবে জনসমাগম মন্দিরে নয়, মাঠে। আজ সেখানে ময়ূরপঙ্খির লড়াই। আশেপাশের চার-পাঁচটা গাঁয়ের লোক এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। বছরে মাত্র দুটি দিনই হয় কিনা,– আষাঢ় আর পৌষ সংক্রান্তি।

আগে সব গাঁয়ের দু-তিনটি করে দল ছিল। গরুর গাড়ির ওপর নৌকার আকারে বাঁশের খাঁচা। রঙিন কাগজ, ফুলে সাজানো ময়ূরপঙ্খিতে মূল গায়েন আর দোহারের দল, সঙ্গে ঢোল কাঁসর। সে এক শোভাযাত্রা বটে! এদের মধ্যে কোনোটি কৃষ্ণের নৌকা, কোনোটি রাধার। কোনোটি দূতি বা গোপীদের। গানের বোলেই একে-অপরকে আক্রমণ,– তবে আঘাতের উদ্দেশ্যে নয়।

রূপকথার ময়ূরপঙ্খি চোখে না দেখলেও, শুধু কল্পনা আর শিকড়ে বোনা এই গান শ্রোতাবন্ধুদের কাছে যেন রেশমি চাদরের আরাম। তবে গৌরবের দিনে সন্ধে নেমেছে। প্রগতির চাকার আঘাতে ছিটকে যাওয়া ঢিলার মতো বেশিরভাগ দলই আজ বিস্মৃতির আঁধারে। শুধু মোহনপুর আর রাধিকাপুর— এই দুই গাঁয়ের দুটি দল শিবরাত্রির সলতে। মূল গায়েন দুজনই বৃদ্ধ। 'বাবা-বাছা' না করলে দোহারের লোক জোটে না। গাড়ি-বলদও দুর্লভ। তবু এই ভাঙা চালেই নৈবেদ্য রচনা, রাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রেম-বিরহ-বিবাদ-কামনার রসাস্বাদন।

এবার লড়াই তেমন জমল না। মোহনপুরের দলের ঢুলি ফটিক রুইদাস আজ দলের সঙ্গে আসেনি। শেষ মুহূর্তে আর একজন জোগাড় হয়েছে বটে, তবে সে ছোঁড়া বড্ড বেতালা। খেই হারিয়ে যাচ্ছিল বারবার।

গায়েন হরি সাঁতরার মেজাজ খারাপ। দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। ফটিকের হল কী? গত তিরিশ বছর ধরে দলের সঙ্গে বাজায়। সংক্রান্তির মেলায় কখনও গরহাজির হয় না। এই তো সেবার, হাড়কাঁপানো শীতে ধুমজ্বর গায়েও বাজিয়ে গেল। কিন্তু, আজ-?

ফটিক শখের ঢুলি। ঢোল বাজিয়ে পুজো-পার্বণে যা জোটে, তাতে উনুনের

আগুন জ্বললেও পেটের আগুন নেভে না। জাতে চামার। সেখানেও বা ক-পয়সা? অগত্যা সহদেবকে নিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে হেঁকে বেড়ানো,– 'ছাগলকে পাল খাওয়াবে গো? খাস বিলাতি পাঁঠা। এক ডাকেই বীজ ধরবে গো। কলসি ভরে দুধ দিবে গো তোমার ছাগল।'

বলা বাহুল্য, সহদেবের চৌদ্দোপুরুষ কখনও বিলেতমুখো হয়নি। সে ফটিকের মতোই নিখাদ দিশি। গায়ের রং সাদা, তাই 'বিলাতি' তকমা।

ও মেঠোরাস্তার পথে। হতভম্ব চেহারা। সেই সহদেব হারিয়ে গেছে। দুপুর ধরার আগে বেরিয়েছিল। ফটিক তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, কোথাও নেই! তাকে বেঁধে-টেঁধে রাখার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবলীলায় যার-তার বাগানে গাছের পর গাছ সাবড়ে দেয়। মারের ঘায়ে একখানা শিং ভেঙেছে। ডান পাছায় পোড়া দাগ।– কোনো হোলদোল নেই। ও পাড়ার ছেলেরা শাসিয়ে গেল সেদিন,– আর যদি সে ওমুখো হয়, তার মাংস দিয়ে ফিস্টি করা হবে।

ফতুয়ার পকেটের চিঠির কথা মনে পড়ে। দুপুরবেলা পিওনবাবু দিয়ে গেল। আদালতের চিঠি। নকুল ধরা পড়েছে। আসছে মাসে জজকোর্টে বিচার। ওকেও হাজিরা দিতে হবে। বুকের ভিতরটা খালি-খালি লাগে। দিনটাই শালা অপয়া। গান গেল, সহদেব গেল। ছ-বছর নিজের ছেলেটার খোঁজ নেই। খবর এল, তাও কিনা-! একটা নিশ্চিন্তি, বেঁচে আছে অন্তত।

গাঁয়ের সীমানায় ঘর। জাত ব্যবসায় যতদিন কাটতি ছিল, গন্ধে ঘরের আশপাশ দিয়ে পথ চলা দায় হত। তার ওপরে গরু-মোষের চামড়া নিয়ে কারবার বলে কথা! ওর বাপকে 'ধম্মচ্যুত' বলেছিলেন গাঁয়ের বামুন। এতে অবশ্য পুকুরধারের ঝুপড়িটুকু ছাড়া একপ্রকার লাভই হয়েছিল বাপের। ঠাকুদ্দা মরার সময় চিতার কাঠ আর বামুনের ঘ্যাঁটন জোটাতে ওর মায়ের দুলজোড়া বেচতে হয়েছিল বাপকে। আর বাপ, বৌ মরার পর, তাদেরকে নদীর ধারে গোর দিয়েই ফটিকের ল্যাঠা চুকেছে।

এ প্রায় বছর দশেক আগের কথা। তারপর নকুলের বিয়ে, বছর ঘুরতেই নাতি, পেখম। বর্ধমান শহরে দলের গান শুনে বাবুরা ওদের সব্বাইকে মেডেল আর চাদর দিলেন। বাপের গলায় মেডেল দেখে নকুলের সে কী মাতামাতি!

সে তখন তাগড়া জোয়ান। আধ ঘণ্টায় আস্ত মোষের চামড়া ছাড়িয়ে দেয়। একদিন বাপ-ব্যাটা ভাগাড়ে গিয়ে দেখল একটি আধমরা গরু পড়ে আছে। ল্যাজেগোবরে দশা। চোখ ওলটানো, মুখে গ্যাঁজলা, যখন-তখন অবস্থা। শকুনের দল ইতিমধ্যেই শিরদাঁড়া ঠোকরাতে শুরু করেছে।

– পেটে বিষ আছে। চ', বাড়ি নে' যাই। হাতিশুঁড়ের শিকড়, হলুদ, তুলসীপাতা আর গোলমরিচ বেটে খাওয়ালে বিষ নামবে।

মাস দুয়েকেই গরু চাঙ্গা। যে লোকের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তার ঘরে আর্তনাদ মানায়, মড়াকান্না মানায়। উচ্চস্বরের খিস্তি-খেউড়ও কান সওয়া। কিন্তু গরুর হাম্বা! রাষ্ট্র হতে সময় লাগে না।

তপন ঘোষ গাঁয়ের মস্তবড়ো সদগোপ। বিঘের পর বিঘে তার দো-ফসলা জমি। পুকুর, খাটাল, পোলট্রির মালিক। গন্ধে গন্ধে হাজির হল। সে গরু নাকি তার! বাজনদার হিসেবে গাঁয়ের দু-চারজন ফটিককে কদর-টদর করে। তারা ওর পক্ষ নেয়, 'ভাগাড়ে দিলে গরু কি আর নিজের থাকে? তার ওপর অধিকার চামার আর শকুনের।'

রাত নামে। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস। ফটিক নিজেকে গালাগাল করছিল,– কত শখ যায় গো চিতে, বেগুনগাছে আকশি দিতে! শালা, চামারের ব্যাটা হয়ে গরু পুষবি? না সেদিন তপন ঘোষ ক্ষ্যাপে, না গরুটিকে মারার জন্য রাতে পাঠায় বাবর আলি-কে। নকুলের ঘুম চিরকালই পাতলা, টের পেয়ে গেল। সবাই জানত বাবর আলি কার লোক। সালিসি সভা, জরিমানা সব হয়। কিন্তু, জরিমানার টাকায় গরু হয় না, জোটে একখানা পাঁঠা। তা-ই সই। ফটিক তার নাম রাখে সহদেব।

কথায় বলে, ভিমরুলের চাকের নীচে বিড়ি ফুঁকলে হুলও খেতে হয়। কোথাকার কে এক চামার, তপন ঘোষ জরিমানা দেবে তাকে? দে ব্যাটাকে আড়ং ধোলাই। বাপকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ফিরতে দেখে নকুলের মাথায় রক্ত ওঠে। রাতারাতি আগুন লাগাতে যায় তপন ঘোষের আড়তে। আড়তের গায়ে আঁচ লাগে নি, ধস্তাধস্তিতে লাঠির ঘায়ে মারা পড়েছিল নুলো দারোয়ান তারাপদ।

আসামী নকুল রুইদাস ফেরার। পুলিশ ধরে তার বাপ আর বৌকে। রুলের গুঁতোর ভয়ে সত্য-অসত্য যা-ই হোক না কেন, ওরা সবেতেই 'হ্যাঁ' মেলায়। ভাগ্যিস সে ক-দিন সহদেব আর নাতিটাকে হরি সাঁতরা শরণ দিয়েছিল, নইলে তাদের কী হত ভগবানই জানে!

তবে যেহেতু তপন ঘোষের তেমন কোনো লোকসান হয়নি, যেহেতু তারাপদরা মরলে তেমন কোনো লোকসান হয় না,– মাসদুয়েক পরেই আইন ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু আইনের মার কি অতই সহজপাচ্য? নকুলের বৌ বমি করতে শুরু করে। শ্বশুরের পায়ে লুটোয়, 'আমার কুনও দুষ নাই। দারোগাবাবু জোর করে-।'

মেয়েটা বেঘোরে মরল। পাপ ধোয়াতে হাসপাতালে যাওয়ার সাহস হয়নি। এসব কথা পাঁচকান হতে সময় লাগে না। আর গাঁয়ের লোকের যা মন, কী থেকে কী রটায়, তার ঠিক আছে? হাজার হলেও খুনীর বাপ, তার ওপরে শ্বশুর আর বৌ ছাড়া ঘরে সেয়ানা লোক কেউ নেই। ছিঃ ছিঃ!

গাঁয়ের কবিরাজমশায়ের কাছে কিছু ওষুধপথ্যির কথা শুনেছিল ফটিক। সেই কোনকালে। কিছুটা স্মৃতি, কিছুটা আন্দাজের জোরে কয়েকটা শিকড়-বাকড় নকুলের বৌকে খাওয়ায়। মাঝরাতে বারতিনেক রক্তবমি করল বেচারি। ভোরের আগেই সব শেষ।

পুব-আকাশে সবে আঁচ ধরেছে তখন। নাতিটার কান্না যেন থামেই না। তার মন ভোলাতে ফটিক ঢোলে কাঠি দেয়। সে এক দৃশ্য!– আধা অন্ধকার, মাটিতে যৌবনের মৃতদেহ, শিয়রে হতভম্ব শৈশব। আর চারপাশে নেচেনেচে ঢোল

বাজিয়ে চলেছে বার্ধক্য! একরাতের রক্তবমিতে মৃত্যু এ গাঁয়ে তেমন বিরল ঘটনা নয়। মাটির উপর থেকে নীচের যাত্রায় নকুলের বৌকে খুব বেশি টানাপোড়েন সইতে হয় না।

...

সেদিন চোখ শুকনো ছিল। আজ গোঙাতে শুরু করে ফটিক। নাতির ঘুম-চোখে অবাক দৃষ্টি,– বাপের খবর এসছে বলে মিঠাই খাওয়াল, বুড়া মাঝরাতে কাঁদে কেন? ঠিক তখনই, দরমার ঝাঁপ ঠেলে সহদেব ঘরে ঢোকে। চরতে চরতে আজ ভিনগাঁয়ে পাড়ি দিয়েছিল। বুকে জড়িয়ে ধরে ফটিক, সহদেবের সারা গায়ে হাত বোলায়।– 'কোথায় গেছিলি বাপধন? আর কুনোদিন তোকে একা ছাড়ব না।'

আদালতে ঢুকেই ফটিক ভ্যাবাচ্যাকা। কতগুলো অচেনা অজানা শব্দ কানের পর্দায় যেন দুরমুশ করছে! বেদম ক্ষেপেছেন বাবুরা। 'কত বড়ো দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করেছেন জানেন? জানেন মহামান্য আদালতের কাজে বিঘ্ন ঘটানোর দায়ে, তার মহামূল্যবান সময় নষ্টের দায়ে আপনার কড়া শাস্তি হতে পারে?'

ও মানে বোঝে না। তবে এটুকু বোঝে, এঁটোমুখে ঠাকুর ধরার মতো ভয়ংকর কোনো পাপ করে ফেলেছে। এবার হয় ঠ্যাঙানি, নয় সারা গায়ে মা শীতলার দয়া। কিন্তু, ওর তো কোনো দোষ ছিল না। সময় থাকতেই এসেছে। সহদেবকে এরা ঢুকতে দিল না যে! যেদিকেই যায়— হয় পুলিশের তাড়া, নয় উকিলবাবুদের। এত্তবড়ো একখানা কোর্টবাড়ি বানিয়েছে, সহদেবকে বাঁধার জায়গাটুকু রাখেনি গো! এ কেমনধারা কাজ? শেষে সেই বাসস্ট্যান্ডের কাছে নাতিকে পাহারায় রেখে বেঁধে আসা। এদিকে যে তিনবার তলব হয়ে যাবে, ও টের পায়নি। আর একবার ধমক খেতেই লাফিয়ে ওঠে, 'মাফ করেন হুজুর, আর কুনোদিন করব না।'

– নাম?

– ফটিক রুইদাস।

– ঠিকানা?

ফটিক অবাক, নাম-ঠিকানা না জেনে এরা চিঠি দিয়েছিল কেমন করে!

উলটোদিকের কাঠগরা নকুলের বয়সি একটি ছেলে। কোমরে দড়ি, মুখে টুঁ শব্দটি নেই। এ হেহেহে, মারের চোটে বদন বিলা করে দিছে গো! কিন্তু, ছোঁড়া কথা বলে না কেন? হাবা নাকি? নাকি বোবা?

– একে চেনেন?

– আজ্ঞে না।

'মিথ্যে কথা!' উকিলবাবুর গলায় যেন বাজের তেজ, 'নিজের ছেলেকে চেনেন না! ঠিক করে বলুন।'

ফটিক ভালো করে দেখে। নকুলের চেয়ে ছেলেটা অন্তত এক বিঘত খাটো। পরমুহূর্তেই ওর স্মৃতিতে পুলিশের লাঠির গুঁতো মারে। পিঠ-পাছা টনটনিয়ে ওঠে।

আবার ধমক, 'এ নকুল রুইদাস কিনা বলুন।'

– হ্যাঁ হুজুর।

ফটিক ভেবে দেখেছে, লাঠির ভয়ে মিছে কথাটা বলে মন্দ হয়নি। ও ছোঁড়ার যদি সাজা হয়, নকুলটা বাঁচে। ওই তো ল্যাকপ্যাকে চেহারা, সে নাকি বিদেশের সঙ্গে ঘোঁট বেঁধিছে, মন্ত্রীর গাড়িতে বোমা মেরিছে! উকিলবাবু কী যেন বলেছিলেন কথাটা? হ্যাঁ, দেশমাতার সুযুগ্যি পুত্তুরের হত্যা।

দেশ নাকি মা! উকিলবাবুর মাথায় কি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু নাই? আরে যে মা বিয়ানোর পর বুকের দুধটুকুও না দিয়ে ছেলেকে জলে ফেলে দেয়,– তার নাম কুন্তীই হোক বা দেশ, ধম্মযুদ্ধে সে ছেলে কৌরবেই যায় আর সহোদরের বুকেই তির দাগে। এতে আর নতুন কথা কী!

...

'তোর দেশ কোথায় রে সহদেব? মোহনপুর, নাকি আরও দূর? মন মানে না রে, মন মানে না। অতগুলো লোকের সামনে নিজের ছেলে বলে মানলাম। সে কি আর মাঙনা? যদি ফাঁসির হুকুম হয়?'

শীতের শেষ, বাঁধাকপি আর মানুষে খায় না। হালদারদের বাড়িতে পাল খাইয়ে মিলল দশটা টাকা, মুড়ি-বাতাসা আর একখানা বাঁধাকপি। সহদেবের ভাঙা শিং-এ হাত বুলোয় ফটিক।

– খা ব্যাটা। পেট ভরে খা। কপি কি রোজ রোজ পাবি?

নাতিকে নিয়েও চিন্তার শেষ নেই। সে এখন আর পাল খাওয়ানোর কাজে আসতে চায় না। মুচির কাজেও তার মন নেই। চামারের নাতি, চামারের ব্যাটা, তার কিনা চামড়ায় অরুচি! সারাদিন বনে-জঙ্গলে কোথায় কোথায় যে ঘোরে, কাদের সঙ্গে যে মেশে, সে-ই জানে!

মোড়লমশায় বলেছিল, তারা নাকি সুবিধার লোক নয়। তারা নাকি গাঁয়ে গাঁয়ে লোক ক্ষ্যাপায়। পেখমকেও তেনারা জাদু-টোনা করেছেন নাকি? যে ছেলে ইস্কুলে যেতে চাইত না, হঠাৎ তার লেখাপড়ায় অ্যাত্ত ঝোঁক? হরেক রকম কাগজ, লাল মলাটের চটি-চটি বই! ভাবগতিক মাথায় ঢোকে না। তেরো পার করেছে। বিড়ি ধরার বয়স। একটা কাজে কম্মে না লাগালেই নয়। কিন্তু, কেউ রাখলে তো!

বাপের যা নামডাক, ছেলেকে কেউ ছুঁতে চায় না। জাত-ব্যবসায় মন তো নেই-ই। সেদিন ভাগাড়ে যাওয়ার নামে বলে কিনা, 'মরা গরুর চামড়া কেটে কী করবা? কাটতি হলে চলো আসল জানুয়ার কাটি।'

ভয় হয়। অবিকল বাপের ধারা। কিন্তু এইটুকু বয়সে ভারী-ভারী কথা শিখল কোথায়? এই তো সেদিনও জিভেগজা-লজেঞ্চুসের বায়না ধরত। তাহলে কি সেই লোকটা-?

ফটিক প্রমাদ গোনে। আদালত যাওয়ার দিন বাসস্ট্যান্ডে পেখমের সঙ্গে লোকটা গুজগুজ ফুসফুস করছিল। ওকে দেখেই চম্পট। সে-ও কি পুলিশ-মারা লোক? পেখমের সঙ্গে তার কী দরকার?

মোহনপুরের ময়ূরপঙ্খি পথে নেমেছে। আজ আষাঢ়সংক্রান্তি। রাধিকাপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়েছে গতবার, এবার ছাড়াছাড়ি নেই। নতুন পদ লিখেছে হরি সাঁতরা। গানের 'চাপান-উতোর' শুরু হোক, দেখা যাবে কোন মুখে জবাব দেয় রাধিকাপুর! দলের সবার অঙ্গে নতুন ফতুয়া-ধুতি। রোদের তেজে সাদা রং ঝকঝক করছে। মোড়লমশায় কিনে দিয়েছেন। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-বৌ-মুরুব্বিদের সঙ্গে তিনিও চলেছেন দলের সঙ্গে। যাত্রাপথেই খৈ ফুটছে ঢোলে।

আজ হয়তো ফটিকের শেষ ময়ূরপঙ্খি লড়াই। না, মোড়লমশায়ের ওপর কোনো রাগ নেই। তিনি তো তবু মাসখানেক সময় দিয়েছেন। বাজনদারের মূল্য তিনি বোঝেন। কিন্তু, কিছু করার ছিল না। ফটিককে মোহনপুর ছাড়তেই হত।

আইনের খাতায় নকুল দেশের শত্রু। পেখম আজকাল যাদের সঙ্গে ঘুরঘুর করে,– তাদের ওপরও নাকি পুলিশের খাস নজর। এই অবস্থায় দাদা-নাতির মোহনপুরে থাকা মানে গাঁ-সুদ্ধ লোকের জান-প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পলাশপুর গাঁয়ে ঠিক যেমনটা হয়েছিল,– আজ পুলিশ তো কাল মিলিটারি, আজ একে ঠ্যাঙানি তো কাল ওর বাড়ি তছনছ! অমন পরিপুষ্ট গাঁ, আজ সেখানে কিনা মাত্র দশ-বারো ঘর লোক।

কিন্তু, গ্রাম ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? হোক সীমানার বাইরে, তবুও তো ফটিকের চারপুরুষের বসত। এই মাটিতেই ওর মায়ের চিতা, বাপের কবর। ফটিক জানে, ও নিজে গাঁ ছাড়লেও পুলিশ তাকে ছাড়বে না। আর কোনোদিন নকুল যদি ফিরে আসে? কোথায় খুঁজবে তার বাপ-ছেলেকে?

কবিরাজমশায় একদিন বলেছিলেন, 'বুঝলি ফটিক, বুকের মধ্যে এই যে ধুকপুকানি, সেইটাই আসল। যদ্দিন ইনি আছেন, তদ্দিন যত নাচনকোঁদন। ইনি নাই তো সব খতম!'

'ছোটো গাঁয়ের ছোটো কবিরাজ,' ও আপনমনে মাথা নাড়ে, 'নিশ্চয় ভুল বলেছেন। না হলে কি আর দুনিয়ার বিচারে সেই ধুকপুকানি এত ফেলনা হয়?'

নতুন লাল গামছাখানা কোমরে কষে বাঁধা। পেখমের হাতে সহদেবের দড়ি। দোহার বিশু কর্মকারের দাদার মেলায় হাতা-খুন্তির দোকান। কাছাকাছি কোথাও খুঁট বাঁধতে হবে। সহদেবকে একা ছাড়া মুশকিল, কখন যে কী করে বসে!

গান শুরুর মুখে ফটিকের হাতে টান দেয় পেখম, 'চললাম।'

– কুথায় বাপধন?

– উরা বাপকে খুঁজে দিবে বলেছে।

এমনটাই মনে হচ্ছিল ক-দিন ধরে। ফটিক বাধা দেয় না।

এদিকে একদল কুকুর ঘিরে ধরেছে সহদেবকে। যাওয়ার পথে পেখমের চোখে পড়ে। 'হারামি!'

সজোরে ছোঁড়া ঢিলটা কুকুরের গায়ে লাগে না, সহদেবের খুঁট উপড়ে

যায়। সে ছুটছে, পিছনে কুকুরের দল।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পেখম জঙ্গলের পথ ধরে। সাত মাইল হাঁটাপথ, তারপর ট্রেকার। সেখান থেকে আবার হাঁটা। চিরকুট আর খুচরো টাকাগুলো একবার দেখে নেয়। গাড়ি ভাড়া থাকলেই হবে, খিদে আজকাল পায়-টায় না। মাস্টারবাবু বলেছেন, অনেক কিছু শিখতে হবে। দলের নিয়মকানুন জানতে হবে। লোক দেখেই বুঝতে হবে, সে কোন দলের। নিশানাতেও শান দেওয়া দরকার, ঘোড়া দাগার সময় হাতটা ঝাঁকুনি খায়।

বুড়াদাদাটা আসলে দুই-ঠ্যাঙের সহদেব, সারা জীবন শুধু কেঁদেই গেল। মাস্টারবাবু পেখমকে সব বুঝিয়েছেন। শালা, ছোটোবেলাটা যেন কাটতেই চায় না! ওই তপন ঘোষ আর দারোগার মতো লোকে গাঁ-গঞ্জ ভরে গিয়েছে। সবকটাকে ধরে গুনে-গুনে তিনপুরুষের বদলা নিতে হবে। তবেই না সে নকুল রুইদাসের ব্যাটা!

জমে উঠেছে ময়ূরপঙ্খির চাপান-উতোর।

'...(আরে ঐ) নৃসিংহ রূপেতে বন্দি অর্জনার কৃতি।

(আবার) যে রূপেতে প্রহ্লাদের করিল নিষ্কৃতি॥'

আজ জানের বাজিতে ঢোল বাজাচ্ছে ফটিক। দু-দলের ছেলে, বুড়ো, মোড়ল, মুরুব্বি— সবার চোখ কপালে। বাপের জম্মে এমন বাদ্যি শোনে নি কেউ! 'ফইট্কার হল কী আজ!'

তারিফে মন নেই ফটিকের। পদের প্রতিটি চরণ যেন হাতের শিরা বেয়ে টগবগিয়ে উঠছে ঢোলের চামড়ায়।– 'যুগে যুগে আসবা বুলেছ ভগবান, এখুনও কি সময় হয়নি?

টিলার মাথায় সহদেব আর কুকুরের দল। আঁচড়ে-কামড়ে রক্তারক্তি। তবুও সেই এক শিং-এর পাঁঠা কিছুতেই হাল ছাড়ে না। লাথিয়ে, গুঁতিয়ে সমানে লড়তে থাকে চারপাশের দাঁত-নখের বিরুদ্ধে।

'লড়ে যা ব্যাটা, লড়ে যা। একটাকেও ছাড়বি না।'

*****

'সাপ্তাহিক বর্তমান', ২০১৬

ভবিষ্যৎ

গৃহিণীর নাম লতিকা। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি পুরুষদের ভক্তিরস এমনিই উথলে ওঠে, শুরুতে আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলুম না। শৈশবে মায়ের আঁচল ধরে কেটেছে, যৌবনে স্ত্রীর চারপাশে উপগ্রহের মতো ঘুরছি। বিলেতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পেটিকোট্-ডাইনাস্টি নামক একটি বিষয় আছে;– এ খানিকটা সে'রকম ব্যাপার। (শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে অবশ্য বাঙালি পুরুষের আত্মশ্লাঘায় ঘা লাগতে পারে।)

এক-এক সময় মনে হত, দাগী মধ্যবিত্ত না হয়ে যদি অন্যকিছু হতুম, তাহলে এই নির্ঘাত এই স্ত্রী-রত্নটিকে মস্তকে মণির মতো ধারণ করতুম। তার পরের অধ্যায়টুকুতে প্রেম-ট্রেম সব ভয়-এর রূপ নিয়েছে। বাজেট ছিল না মশাই। দোষ আমাদের নয়। ভেবে দেখবেন, সরকারি অনুদান না পেলে তাজমহলও হানাবাড়িতে পরিণত হত।

তাও বিস্তর আদিখ্যেতা ও অল্পবিস্তর টানাটানি নিয়ে আমাদের এই টোনাটুনির সংসার মন্দ চলছিল না। এরই মধ্যে একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, আমার চন্দ্রমার মুখের মেঘের ঘনঘটা। প্রাণ কেঁদে উঠল। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে?'

যথেষ্ট পরিমাণ সাধ্যসাধনার প্রত্যুত্তোরে বার-তিনেক ফোঁস করার পর তিনি জানালেন, বিকেলবেলা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নাকি পাড়ার কিছু ফচকে ছোঁড়া তাকে 'লবঙ্গ-লতিকা' বলে টিটকিরি করেছে। অযাচিত ঠাকুরপো-পনার চাইতে টিটকিরিতে বিপদের ভয় কম। তাই, পরিবেশ হালকা করতে দুঃসাহস দেখিয়ে একটু রসিকতা করে ফেললুম, 'তুমিই বা লেজঝোলা পাখির মতো ব্যালকনিতে ফুরুৎ-ফারুৎ করছিলে কেন, ছেলেপুলের দল ঢিল তো মারবেই।'

– আমার সঙ্গে অসভ্যতা করল, আর তুমি ওদের কিছু না বলে আমাকেই ট্যাঁরাবাঁকা কথা শোনাচ্ছ! তুমি কেমন পুরুষমানুষ?

মনে মনে ভাবি;– পুরুষ! কপালে ঠেকানো প্রসাদ যে মুখে খাই, সেই মুখেই প্রথম যেদিন হাভাতের মতো শরীর ভিক্ষে চেয়েছিলাম, পৌরুষ সেদিনই যমের দুয়ারে গ্যাছে। কিন্তু, মুখে বললুম, 'ভাড়া বাড়িতে বাস করে পাড়ার

লোকের সঙ্গে ঝামেলা করতে নেই।'

– সে তোমার মুরোদ জানা আছে। রাস্তায় কুকুর দেখলে যে লাফ দিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ওঠে, সে যে বউয়ের মানসম্মান বাঁচাতে লঙ্কায় যাবে না,– এতে আর অশ্চর্যের কী আছে!

– অবশ্যই নয়। আর সেই সঙ্গে, আমার ভীমরতিও ধরেনি যে লোকের বুক চিরে রক্ত নিয়ে তাতে কুসুম-কুসুম ল্যাভেন্ডারের তেল ঢেলে তোমার হেয়ার-স্পা করতে বসব। ভদ্রলোকেরা শান্তিপ্রিয়ই হয়।

– ভদ্র! তুমি? হাসালে। সত্যি কথাটা বলো, বুকের পাটা নেই।

– পাটা না থাকলেই বা কী, সুযোগ পেলেই তো শিল ঠুকতে ছাড়ো না। এদিকে তোমার বাবা কিনা পাত্র-চাই বিজ্ঞাপনে লিখেছিল, 'সুন্দরী, সুশীলা, লজ্জাশীলা-।' কে জানতো, 'শীলা' তো নয় সব আগ্নেয়শিলা।

বলেই মনে হল– এই রে, তার বাপ তুলে ফেলেছি, এখন আমার চৌদ্দগুষ্ঠীর উদ্ধার হওয়া কে ঠেকায়! এমনিই ভদ্রমহিলার সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। মানে যুক্তি-টুক্তির মতো তুচ্ছ, নগণ্য কারণে আজ অবধি তর্কে হারেননি। সংস্কৃত কলেজ এনার খোঁজ পেলে নিশ্চয় এতদিনে 'তর্করত্ন' উপাধি গছিয়ে দিত। তা, এখানে আবার আমিই অফেন্ডার। ফলে যা হওয়ার তাই হল। বাক্যবাণে শরশয্যা নিয়ে 'আমার মতো নরাধমের বিয়ে করা মহাপাপ', 'আমার তিনপুরুষের এই পাড়ায় কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না', 'তিন মাসের মধ্যেই নিজস্ব একটি বাসস্থান জোটাতে হবে', ইত্যাদি শর্তে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে সই করলাম। বিশ্বাস করুন, দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি অচিরেই তা স্বত্ববিলোপ নীতিতে পরিণত হবে!

এসব প্রায় বছরখানেক আগের কথা। ছ'মাস হল, একটা ফ্ল্যাট বুক করেছি। বলা ভালো, নিজের পাঁজরের ওপর কয়েক কুইন্টাল ইঁটের পাঁজা চাপিয়েছি।

তিনছটাক জমির ওপর পাঁচতলা বারোয়ারি খাঁচা, যার গালভরা নাম 'ড্রিমস্ অ্যাপার্টমেন্ট'। যার কুঠুরিতে থাকতে হবে গাদাগাদি করে, তা কিনা 'অ্যাপার্ট-মেন্ট'! আর ড্রিম না নাইটমেয়ার– তা ওপরওয়ালাই জানেন।

এই পাঁচতলা কুতুবমিনারের একতলাটির পদবী বেশ গালভরা,– কমার্শিয়াল। ভবিষ্যতে সেখানে সবজিবাজার বা গরুর হাট– কিছু একটা বসবার কথা। বাকি চারটি তলা ভাগ হবে আমার মতো ষোলজনের মালিকানায়।

ফ্ল্যাটবাড়ির নামে অনেকেই নাক কোঁচকান। ভাবেন এ যেন অনেকটা স্বাধীন(!) ভারতবর্ষের মতো ব্যাপার। নিজের, তবু সবটা নিজের নয়! তাদের উদ্দেশ্যে স্বয়ং ব্যাসদেব বলেছেন– বহুপতিত্ব সনাতন ধর্ম। আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র বলেছে– কন্যাকে এক ভ্রাতা নয়, ভ্রাতৃবর্গের হাতে সমর্পণ করা হয়। ড্রিমস্ অ্যাপার্টমেন্টের আমরা ষোলজন স্বপ্নভূক প্রত্যেকেই ভারতীয়। এদিকে স্বামীজী বলেছেন– সকল ভারতবাসী আমার ভাই। সুতরাং এই ষোলজনের বহুপতিত্ব ষোলআনা শাস্ত্রসম্মত। শুধু বাদবাকি ব্যাটাছেলে-সতীনদের মালিকানায় নাক-কান

বা অন্য কোনো অঙ্গ না গলালেই হল।

আপাতত অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় করছি কবে এই পাষাণী স্বপ্নসুন্দরী বরমাল্য পরাবে। প্রোমোটার তাকে একটু একটু করে সালংকারা করে তুলছে,– আমরা ষোলজন কামুক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি। অবশ্য মাঝেমাঝে বিষয়ী চোখে দানসামগ্রী, বরপণ, এসব মেপে নিচ্ছি।– ও কী, রান্নাঘরে গ্রানাইট দেবেন বলেছিলেন, শেষে কিনা ব্ল্যাকস্টোন গছালেন?... তিনটে বেসিন পাওয়ার কথা ছিল মশায়, এ তো দেখি মাত্র দেড়খানা! হাবেভাবে ঠিক যেন সেকেলে বড়োকর্তা,– দেখি তো মা, বালাজোড়া গিল্টি করা নাকি!

একটা কথা ঠিক, ফ্ল্যাটের হদিশ পেতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। পেটপুরে শ্রীমতির ধ্যাতানি আর ঘ্যাতানি খাওয়ার পর দেখি– কিছু একটা না করলে ভার্য্যা-ঘাতে মৃত্যু অনিবার্য। প্রাণপাখিকে বোঝাই, আর কতকাল উড়বে ভায়া, চলো, এবার খাঁচা খুঁজি। পায়ে হোম-লোনের শিকল পড়ে পড়ুক। মন-প্রাণ খুলে ছদ্ম-প্রাইভেসিতে চলবে কপোত-কপোতীর বকমবকম।

কিন্তু, সাধ আর সাধ্যের সম্পর্ক অনেকটা লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো, দু'জনে একগৃহে সচরাচর থাকেন না। ফ্ল্যাটের যা দাম, আরও খানদশেক ইনক্রিমেন্ট্ ছাড়া দেশলাই বাক্সের চেয়ে বড়ো কিছু জোটানো মুশকিল। তাই বলে খিদে পেয়েছে মাঘে আর জৈষ্ঠের গাছপাকার আশায় পেটে গামছা বাঁধব?

অতএব সেই সাধ আর সাধ্যের সমীকরণের খোঁজে 'কলিকাতা এক' থেকে 'কলিকাতা চারশো বিশ' চষে মরা। অটোরিক্সার ছ'নম্বর সওয়ারির মতো পোয়াটাক নিতম্ব মহাশূন্যে দুলছে। বেওয়ারিস হাঁটুর তিন মাইক্রোমিটার দূর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাঞ্জাব-লরী। সারা গায়ে রোদ-বৃষ্টি-কাদাজলের আশীর্বাদ। মাঝেমাঝেই পেটে ড্রাইভারের কনুইয়ের রামগুঁতো। এককথায়, শুধু মাথাটুকু গুঁজে রাখা ছাউনির নীচে, বাকি সবকিছুর ভয়ও নেই ভরসাও নেই।

একদিন এই ফ্ল্যাট-সন্ধানের ব্যর্থতার মুকুট মাথায় বাড়ি ফিরে দেখি শ্রীমতি তখন এক নম্বর সিরিয়ালের দু'নম্বর নায়িকার তিন নম্বর স্বামীর সঙ্গে চার নম্বর বিয়ের তত্ত্ব সাজাতে মানসিক ভাবে ব্যস্ত। ঘরে যে একটা লোক ঢুকেছে,- কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। কতবার সেধেছি, রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে। ভবি ভোলবার নয়। টিভি চালু হোলে আমার অস্তিত্ব ব্যাকটেরিয়া-স্বরূপ, আণুবীক্ষণিক। তবে বৃহত্তর শক্তি সামনে আমরা জাতিগত ভাবেই শান্তিপ্রিয় তো, তাই সব ভুলে একা-একাই চেয়ারে বসে দীর্ঘশ্বাস চিবোতে শুরু করলুম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি এলেন।– 'কিছু পেলে?'

– কুলোচ্ছে না।

– কত চাইছে?

– আমাদের বাজেটে ঝুপড়িও নেই। তুমি তো আবার তেরোশো স্কোয়ার ফিটের কমে দমবে না।

– আমি কি আমার জন্য বলি, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে না? বাজেটে

কম পড়লে প্রভিডেন্ট্ ফান্ড থেকে নাও।

কী আমার ভবিষ্যৎ-দরদী রে! বললুম, 'সেখানেও হাত বসালে রিটেয়ারমেন্টের পর খাব কী?'

– এখন যা খাও, আমার মাথা।

অন্য সময় হলে শুধরে দিতুম,– মাথা নহে প্রিয়ে, এককালে লেহ্য হিসেবে প্রিয় ছিল ঠোঁটকাঠির প্রলেপ। এখন শুধু সেঁকো বিষ চাখতে মন চায়। কিন্তু, সারাদিনের ধকলে তখন নেতিয়ে পড়েছি পাড়ার ক্লাবের ষোলই-অগাস্টিয় জাতীয় পতাকার মতো। তাই চুপ রইলুম।

তিনি তখনও বলে চলেছেন, 'টিভিতে এত এত কমপ্লেক্সের অ্যাড্ দেখায়। হাতের নাগালে স্কুল-হাসপাতাল-শপিংমল। কম্পাউন্ডের মধ্যেই জিম-পার্ক-সুইমিংপুল। তোমার কি কিছুই চোখে পড়ে না?

বোঝো! রাস্তার জল দেখলে জলাতঙ্কে ভোগে, শ্রীরাধার সুইমিংপুলে জলকেলির শখ! বললুম, 'টিভির অ্যাডে তো আজকাল ফ্যামিলি-প্ল্যানিংয়েও চকলেট-স্ট্রবেরি ফ্লেভারের কথাও বলে। এখন থেকে কি তাও মানতে হবে?– যত্তসব!'

– শোনো, ফ্ল্যাট মানুষ একবারই কেনে। সব সুযোগ-সুবিধে দেখে নিতে হয়। তোমার মাথায় তো ওসব ঢুকবে না, তাই যা বলছি শোনো। প্রভিডেন্ট্ ফান্ড থেকে লাখপাঁচেক তুললে হাতে কত থাকবে?

মনে মনে ভাবি– হ্যারিকেন। বলি, 'তুমি মেরেই ফেলো আর কেটেই ফেলো, পি.এফ.-এ হাত দেব না। দরকারে রাস্তায় ত্রিপল খাটিয়ে থাকব, সে-ও আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা পাকা খেলোয়াড়। ভবিষ্যনিধি বাঁচাতে আমি মরিয়া বুঝে মুহূর্তের মধ্যে স্বর বদলালেন, 'মাথাটা ঠাণ্ডা করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না।

বলে কী! চিন্তা করব না? চিন্তা না করে টিকে থাকে জড়বস্তু। ভাড়াবাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাট কিনব, সে ঠিক আছে। কিন্তু, তেরোশো স্কোয়ারফিট, জিম-পার্ক-সুইমিংপুল,– অযথা এইসম হুল নেওয়ার কী প্রয়োজন? আকরিক থেকে নিষ্কাশনের সময় ধাতুর সঙ্গে ওঠে ধাতুমল বা স্ল্যাগ্। এই স্ল্যাগ্-বস্তুটি বড়োজোর 'উপজাত' হতে পারে, 'উৎপাদিত' কখনই নয়।– এই সাধারণ সত্যটি শ্রীমতির মাথায় ঢুকছে না?

আমার মুখচোখ দেখে তিনি বললেন, 'আচ্ছা পি.এফ. বাদ দাও। তোমার কিছু ফিক্সড় ডিপোজিট আছে না?

– কেন?

– ভেঙে দাও।

– মানে! ভবিষ্যতে কিছু লাগবে না?

– আরে, ভবিষ্যতের জন্যই তো ভাঙতে বলছি।

আহা যেন গান্ধীজী আর নেতাজী একসঙ্গে দেশের কথা ভাবছেন।–

উদ্দেশ্য একই, শুধু পথ আলাদা, এই যা! ... বললুম, 'ম্যাচিউরিটির আগে ভাঙলে কিছু পাওয়া যাবে? কার্বাইডের আমে না থাকে স্বাদ, না থাকে গন্ধ। আঁটি পুঁতলে গাছ অবধি হয় না ঠিকমতো।

– বলছি ফ্ল্যাটের কথা। তা ছেড়ে আম, আঁটি, কার্বাইড, গুষ্টির পিণ্ডি বকতে শুরু করলে! আমার কথা যদি শুনবেই না, তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন?

লাখটাকার প্রশ্ন। আমিও মাঝেমধ্যে ভাবি। নিতান্ত ফ্রয়েডিয় কারণেই কী? কী জানি বাবা, এসব বললে আবার নারীবাদীরা মুণ্ডু নেবেন। তার চেয়ে আত্মসমর্পণই ভালো।– 'বলো, কী করতে হবে?'

এর পরের অধ্যায়ের পুরোটাই– তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। নিজেই তার এক দূরসম্পর্কের মামা ধরে আনলেন,– অনাদি মুখুজ্জে। ভদ্রলোকের পেশা দালালি। কথাবার্তা শুনে মনে হয়– উপাচার থেকে উপগ্রহ, মায় উপপত্নী অবধি সবকিছুই তার নখদর্পনে। তবে সেইসবের ফাঁকে পুজোআচ্চাও চালিয়ে যাচ্ছেন। উপযুক্ত 'মূল্য ধরে দিলে'ই যজমানদের ভুল-ত্রুটি ইহলোকের ছাঁকনিতে আটকে রেখে অমৃতলোকে বিশুদ্ধ ভক্তিভাব সম্প্রচার করে দিতে পারেন। ভাবগতিক মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছিল না। তবে একটা বাঁচোয়া, দালালির টাকা অর্ধেক লাগবে। আদরের ভাগ্নীর জন্য বিশেষ ছাড়!

পরপর বেশ কয়েকটা শনি-রবিবার তিনজন মিলে গরুখোঁজা, থুড়ি খুঁজে মরলুম। শ্রীমতির কিছুই পছন্দ হয় না।– এটার একরত্তি ব্যালকনি, ওটার ঘুলঘুলি সেকেলে ধাঁচের, সেটার দক্ষিণে বাতাস খেলবে না,– নানান বায়াক্কা। একসময় অধৈর্য হয়ে বললুম, 'কী এমন জাহাজের পাল তুলবে যে দখিনাবাতাসের জন্য হেঁদিয়ে মরছ? সঙ্গে মামা রয়েছে বলে মামারবাড়ি পেলে নাকি!'

প্রতিক্রিয়ায় তার সংক্ষিপ্ত উত্তর,– 'চুপ করো।'

লেখক অলিভার হারফোর্ড বলেছেন– একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তার নীরবতা দেখে। বার্নাড শ্য-এর মতে, সমস্ত গুণের মধ্যে নীরবতাকেই বেছে নেওয়া উচিৎ, কারণ একমাত্র এর দ্বারাই নিজের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা যায় আর অন্যদেরগুলো জানা যায়। সুতরাং, চুপ করা-টা মোটেই অসম্মানীয় নয়। বরং এই পথে অনায়াসেই বস্তুজগৎ ছেড়ে ভাবজগতে লীন হওয়া যায়।

এক-এক সময় ভাবি, কেন যে এভাবে পদে পদে হুড়কো খেতে পড়ে আছি, কে জানে! শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়,– 'মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। ... যদি সাপে কামড়ায়,– 'বিষ নাই', 'বিষ নাই'; জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনিই 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি মুক্ত' এই কথাটি জোর করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়।'

কিন্তু ঠাকুর, আমার কলজের যা জোর,– আধবাটি মালাইকারি অবধি ঠিকমতো হজম হয় না। এমন জ্বলুনি ওঠে, যে মাঝরাতে বোতল বোতল গরম জল গিলতে হয়। সেই দেড়-ব্যাটারির কলিজার জোরে 'আমি মুক্ত'– এ'কথা বলি

কী করে? ল্যাজা-মুড়ো নেই, কী এক ভবিষ্যতের খ্যাঁচাকলে পড়েছি, ব্রাউনিয় গতিতে কেবল এদিন-ওদিক ছুটে মরাই সার!

ছেলেবেলায় শুনতুম, ভবিষ্যতের জন্য পড়তে হবে। যৌবনে শুনলুম, ভবিষ্যতের জন্য চাকরি জোটাতে হবে। এরপর একে-একে বিয়ে, সংসার, সঞ্চয়, বাসস্থান,– সবই নাকি ওই হতচ্ছাড়া 'ভবিষ্যতের জন্য'ই! এদিকে প্রায় দু'কুড়ি বয়স হতে চলল, আজও সেই ভবিষ্যতের টিকির দেখাও মিলল না। এ যেন হ্যালির ধূমকেতু,– ছিয়াত্তর বছরের আগে দর্শন দেয় না!

যুক্তিবাদীরা বলবেন,– আজ যা আছি, তা গতকালের ভবিষ্যৎ। আগামীকাল কেমন থাকব, তা আজকের ভবিষ্যৎ। কিন্তু, দশবছর আগেও স্রেফ কোনোমতে টিকেছিলেম, আজও তাই আছি, দশ বছর পরেও অবস্থার বিশেষ বদল হবে বলে মনে হয় না। আলুভাতে শুধু নুন দিয়ে মাখছি, হয়তো জুটবে কিছু মোঁচানো ধনেপাতা, একটু আচারের তেল।– তার জন্য এত হুলস্থুল? হেডোনিজমের প্যারাডক্স বলে,– জবরদস্তি সুখ খুঁজতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। তবু কী সুখের আশায় এই ফ্ল্যাট-ফ্ল্যাট করে হেঁদিয়ে মরছি,– ভেবে পাই না। দুই লাইন গুনগুনিয়ে উঠেছিলাম, 'সুখ দুখ দুটি ভাই/ সুখের লাগি যে করে পিরিতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই'...।

কিন্তু, নির্মীয়মান অ্যাপার্টমেন্টগুলি একটু চলনসই হলেই দেখতুম মর্ত্যে আর স্থান নেই, পুরোটাই বুকড্। শুধু চিলেকোঠা আর বেসমেন্ট বাকি। দেশে হাঘরে জনসংখ্যা এত বেড়েছে– তা কে জানত!

অনাদিমামা বললেন, ভিতে মশলা পড়লেই পাঁচতলা অবধি বুকিং হয়ে যায়। আমাদের সেরকম কোনো প্রোজেক্ট খোঁজা উচিৎ যেখানে সবে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে। মামার বিষয়বুদ্ধিতে শ্রীমতি ডগমগ,– 'দ্যাখো দ্যাখো, কিছু শিখতেও তো পারো।'

কোন সম্বন্ধি বলে– নরাণাং মাতুলক্রমঃ? অনাদিমন্ত্রের গুঁতোয় আমি তখন নরাণাং মামাশ্বশুরক্রমঃ। কোথাও গর্ত খুঁড়তে দেখলেই মেঠো ইঁদুরের মতো সে'দিকে ছুটে যাই। একদিন তেমনই এক গর্তের সামনে চকচকে রোদচশমা আর দশ আঙুলে এগারোটা আংটি পরিহিত এক হোমরা-চোমরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম,– 'আচ্ছা, আপনিই কি প্রোমোটার?'

– কেন বলুন তো?

– মানে, ভাবছিলাম এখানে একটা ফ্ল্যাট বুক করব।

– ধুর মশায়, চোখে কি ন্যাবা হয়েছে নাকি? দেখতে পাচ্ছেন না, কর্পোরেশানের ড্রেন খুঁড়ছি।

এ-হেন বেকুব হওয়ার পর ঠিক করলাম, আর নয়। নিজে আর ফ্ল্যাট অন্বেষণে যাব না। মামা-ভাগ্নীর স্বৈরতন্ত্রে এমনিই মাইনোরিটি ছিলুম, তার ওপর রোজ-রোজ দিনের শেষে ভগ্নদূত হয়ে বাড়ি ফিরতে মোটেই ভালো লাগত না। দোকানে দাঁড়িয়ে একঘণ্টা ধরে পঁচিশ রকম জিনিসের দরদাম করার পর যে

বলে, 'দু'টাকার তেজপাতা দিন'।– দোকানির গালি খাওয়া তার উচিৎ পরিণাম হতে পারে, বিষয়টা মোটেই সুখকর নয়।

যাই হোক, কয়েকদিন বাদে শ্রীমতি নিজেই একখানা পছন্দ করে এলেন। এতেই গর্বের চোটে মামার বুক ফুলে উঠেছে। 'মায়ের আমার চয়েজ আছে বলতে হবে।'

কথাটায় তীব্র আপত্তি জানাতে গিয়ে ড্রেসিং-আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বে চোখ পড়ল। আপত্তির ছ্যাঁকা নিজের গায়েও লাগবে বুঝে চেপে গেলুম।

– তাহলে বাবা, আর দেরি না করে টোকেন-মানি দিয়ে বুকিং সেরে ফেল।

– কত লাগবে?

– লাখছয়েক।

– ছঅয় লাআআখ! টোকেন এত বড়ো বাঁশ হলে দিস্তার মাপ কত?

– সবসময় এত কিপটেমি করো কেন বলো তো?

– কিপটেমি? ওই ফ্ল্যাটে ঢোকার পর তো জল-বাতাসাও জুটবে না!

– চুপ করো।

– সে আমার ভবিতব্য।

মামা বললেন, 'তবে বাবা, আগেই বলে দিই, প্রোমোটারেরা কিন্তু মহা ধাড়িবাজ হয়। দেখে নিও– মেঝেয় ডুংরি-মার্বেলই দেয় যেন।'

বোঝো ঠ্যালা, যে কোনোদিন ঠুংরী জানল না, সে চিনবে ডুংরি!– 'ওসব আমার দ্বারা হবে না। আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন।'

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অক্কা পাওয়ার আগে কর্ণ নিজের হাতে নিজের কবচ-কুণ্ডল দান করেছিল। সেদিন রাগে আর বিরক্তিতে ঠিক সেই ভুলটাই করে বসলুম। একে-একে প্রভিডেন্ট্-ফান্ড, ফিক্সড্-ডিপোজিট, সবই আস্মিন্ হব্যা জুহতন স্বাহা। ইনসুরেন্স্ পলিসিটা অবধি আস্ত থাকল না। কলিযুগের দধীচি হয়ে বলতে লাগলুম,– 'নাও নাও। যেটুকু আছে, সব নিয়ে নাও।'...

একদিন অফিস থেকে ফিরতেই তিনি গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'ফোনে টাওয়ার থাকে না কেন তোমার?'

মশকরা করতে ইচ্ছে হল, 'যে বস্তুর মালিকের বাংলা ইংরেজি দুই মতেই 'পাওয়ার' কিছু থাকে না, তার টাওয়ারহানী এমন কিছু ফানি নয় হানি।'

তেনার চোখ-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি।– 'মাঝেমাঝে কী ভাষায় যে কথা বল, সেটাই বুঝতে পারি না!... মামা ফোন করেছিল। তোমার নাকি সিভিল খারাপ?'

সেরেছে! ঘরে পাঁচ ডেসিবেলের ওপর গলা তোলার মুরোদ নেই, বাইরে পরনারী সংক্রান্ত করোনারি সমস্যা নেই, তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা বাঁধানোর মতো পারিবারিক বাঁশঝাড় অবধি নেই। আর সেই আমার সিভিল খারাপ! ঘর জোটাতে সংসার যায়-যায় দেখে তড়িঘরি মামাকে ফোন লাগালাম।– বুঝলাম 'সিভিল' নয়, সমস্যা আমার 'সিবিলে'।

– ওতে কী হয় মামা?

– রেটিং কম থাকলে লোন পেতে অসুবিধা হয়।

– রেটিং কমে কেন?

– ব্যাংকের লোন, ক্রেডিট কার্ডের বিল ঠিকমতো না শুধলে।

– কিন্তু, এর আগে তো কোনোদিন লোন-টোন নিইনি! ক্রেডিট কার্ডও নেই।

– নাওনি বলেই তো শুধতে হয়নি। আর শোধোনি বলেই তো রেটিং খারাপ।

এ তো আজব গ্যাঁড়াকল মাইরি,– খাওনি বলেই তো খাওয়ার স্বাদ বোঝো না। আর স্বাদই যদি না বোঝো তাহলে খাবে কেন! বিয়ে-শাদিতেও এই নিয়ম চালু হলে কী মর্মান্তিক পরিণতি হতে পারে– সেই চিন্তায় ডোবার ঠিক আগেই অনাদিমামার আশ্বাসবাণী, 'চিন্তা কোরো না, ম্যানেজ করে দেব। শুধু এই ব্রাহ্মণকে মূল্য ধরে দিও।'

– বেশ।

প্রতিদিন নতুন নতুন ফিরিস্তি! কোনোদিন শ্রীমতি বলেন, 'বাথরুমে প্যারিওয়ার বসাব। হাজার-চল্লিশ দাও।' তো পরদিন মামা বলেন, 'উকিলের খরচ। হাজার-পঞ্চাশেক।'

আমার উত্তর মোটামুটি একই,– 'বেশ।'

– ফলস্ শিলিংয়ের জন্য ষাট-।

– আসল দেবে না?

গিন্নি গলা চড়িয়ে বললেন, 'ষাট হাজার!'

– বেশ।

– ব্যালকনির এক্সট্রা টাইলস। তিরিশ।

– বেশ।

– মডিউলার কিচেন। এক তিরিশ।

– বেশ।

– কিচেন চিমনি। পঁচিশ।

– চিমনি! ওতে মানুষ পোড়ে?

– মানে?

– ভাবছি গলায় দড়ি দেব।

– বাজে কথা রাখো। বললাম তো পঁচিশ।

– বেশ বেশ বেশ। শুধু আমার কাছাটুকু বাকি রেখে সবকিছু ঢেলে দাও। কপালে 'অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ' নেই, তাই 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'-ই শ্রেয়।

অবশেষে নতুন সাম্রাজ্যে মহারাণীর অভিষেকের দিনটি এল। যাকে বলে 'গৃহপ্রবেশ'। কাছা সামলাতে সামলাতে আমিও ছুটলুম। ওয়াইফ'স্ হাজব্যান্ড্ বলে কথা, বেন্ড্ না হলে চলবে কেন? এই ছুটোছুটির মধ্যেও শ্রীমতি এমন মাঞ্জা দিয়েছেন,– ঠিক যেন পরস্ত্রী, দেখলেই কেলেঙ্কারির সাধ জাগে! কিন্তু, সেভিংস্ অ্যাকাউন্টের অশৌচকালে এমন চিন্তা মহাপাপ।

দরজার সামনে টাইটানিক থেকে শুরু করে ময়ুরপঙ্খি, পানসি, কোষা, পাতাম, বাচারি, রপ্তানি, ঘাসি, সাম্পান, ডিঙ্গি– নানান মাপের অন্তত চল্লিশ জোড়া জুতোর বাহার। ভেতরে তদের মালিক-মালকিনেরা সুগভীর আলোচনায় মত্ত। মূল বক্তব্য মোটামুটি একই। জানেন, গতমাসে আমার খুড়তুতো শ্যালিকার পিসতুতো নন্দাই এর অর্দ্ধেক দামে দ্বিগুণ মাপের ফ্ল্যাট কিনেছে। আমিও কিনতুম। কিন্তু আজকাল কাজের লোকের যা খাই! বাবা, অতগুলো ঘর কে মুছবে?

এদিকে এক প্রমাণমাপের মহিলা একটি চারআনার পুঁচকেকে তেড়ে ধমক লাগাচ্ছিলেন,– দিলি তো আলপনা-টা মাড়িয়ে! তোকে আমি বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দেব।... বলাই বাহুল্য, অপদার্থ আমি কোনোকিছুরই অনুষঙ্গ বুঝতে পারছিলাম না।

বসার ঘরের ভেলভেট-টাচ্ দেওয়ালে সিঁদুরে আঁকা একখানি হাত-পা ছড়ানো ভূতের চিত্র, যার নীচে এক-থাবড়া গোবর। এই বোঁটকা গন্ধময় বস্তুটি নাকি আদতে পরম মঙ্গলময়! মেঝের মার্বেলে মিষ্টির রসে ধুলোর ককটেল। বিছানায় চলকে ওঠা কফির কষ, বালিশে ছিটকে যাওয়া চিলি সস্। দরজার পালিশে টমেটোর চাটনি। বাথরুমের মহার্ঘ্য কল বেয়ে জল পড়ছে ছড়ছড় করে। ব্যালকনিতে একদল কলেজগামির খ্যাখ্যাখিখি জমেছে পুরোদমে। রান্নাঘরে উলুধ্বনির সঙ্গে চলছে দুধ ওৎলানো। বসার ঘরে শালগ্রামশিলার সামনে পার্টটাইম পুরোহিতের বিকৃত মন্ত্রোচ্চারণ।

এদিকে, ব্যাংকের পাশবই হাতে আমি ভাবছি, ব্রাহ্মণ যখন আছেই, একফাঁকে নিজের শ্রাদ্ধটিও সেরে রাখলে হয়,– কিছুটা খরচ বাঁচে। মনে শক্তি জোগাতে পাশবই রেখে ওই নরককুণ্ডের মধ্যেই রবীন্দ্ররচনাবলী হাতড়াতে শুরু করি।– 'মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখসঞ্চয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল জিনিসপত্র আসবাব আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।'– আহাহাহা, যেন পাকা ফোঁড়ায় সেঁকের আরাম পড়ল গো! ইশ্, ক'টাদিন আগে যদি জন্মাতুম, কথা বলার একটা লোক পাওয়া যেত।

এরই মধ্যে কখন যে অনাদিমামা তাগাদা ও খেজুরের যৌথ উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছেন, টের পাইনি। দালালির শেষ কিস্তি পকেটে গুঁজে বললেন, 'এমন সুন্দর ফ্ল্যাট কিনলে বাবা, গ্যারেজে একটা চারচাকা না থাকলে কি মানায়?'

তবে রে শ্লা-! এক ফ্ল্যাট কিনতেই চিত্তির হয়েছি, তার ওপরে গাড়ি? হঠাৎ টের পেলাম বুকে চিনচিনে একটা ব্যথা।– ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং...!

*****

'সংবর্তক', ২০১২

রোগ

নাম, ঠিকানা, বংশপরিচয় মনে রাখতে গিয়ে স্মৃতিশক্তি খামোখা বিপর্যস্ত করে লাভ নেই। বেশিরভাগ খবরের যেমন একটি লাইন পড়ার সময় আগের লাইনের সারমর্ম মনে না রাখলেও চলে, সেভাবেই শুনুন।

সত্যি বলতে কী, জীবন কাটিয়েছি এই ধাঁচেই, পিছন পথের সমস্ত সেতু একের পর এক পুড়িয়ে। যাতে এগিয়ে চলা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা আর না থাকে। কিন্তু, সত্যি এগিয়েছি কি? ভাবতে ভালো লাগে না। একটা কথা আছে, যখন শুঁয়োপোকা বলে তার দিন শেষ, ঈশ্বর বলেন প্রজাপতি। মৈনাক বলে, কিছু কিছু মানুষের জীবনে এই মেটামরফোসিস অধ্যায়টা নাকি তার জীবনকালের চেয়েও বড়ো হয়!

আমরা তিন ভাই। বড়দার সুবিধা এই,– সে খুব অল্পে সন্তুষ্ট। লোকে বলে, যারা কম বোঝে, তারা খুব সহজে সুখী হয়। ও সেই দলের মানুষ। ফিল্মি কায়দায় বেশ নেচে, গেয়ে, বখাটে ইভটিজার ঠেঙিয়ে, ডাকবিভাগ, গ্রিটিংসকার্ড আর টেলিফোন কোম্পানিকে বড়োলোক করে, ওর বেশ কিছুদিনের প্রেমিকা, মানে বৌদির বাড়ির অমতে বিয়ে করে বসে। তারপর টিভির রিমোটের মালিকানা বিষয়ক খণ্ডযুদ্ধে স্বামী-স্ত্রীর দিব্যি কয়েক বছর কেটেও যায়।

এখন সপ্তাহে একদিন ছেলেকে আদর করতে চকোলেট পকেটে শ্বশুরবাড়ি যায়। আর প্রতিদিন ঠিক সকাল ন'টায় পাতলা হয়ে আসা চুলে বারকয়েক চিরুনি চালিয়ে অফিসে ছোটে। পায়ে দু'শ পনেরো টাকায় কেনা চামড়ার চটি।

মেজদা অফিস যেত চকচকে পালিশ করা জুতো পায়ে। তখন স্কুলে পড়ি, প্রথম প্রথম খুব একটা টের না পেলেও চটি-পরা আর জুতো-পরা চাকরির তফাৎ চোখের সামনে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। অন্যদের কথা থাক, আমাদের মা-ও যে তার অসম-রোজগেরে ছেলেদের মধ্যে সেদিন কোনো তফাৎ দেখেনি, সেকথাও ঠিক জোর দিয়ে বলতে পারি না। বিষয়টা ঘিরে বড়দার ছিল একটা চাপা অভিমান, মেজদার ছিল প্রচ্ছন্ন গর্ব। আর আমার ছিল বেড়ে ওঠা। ততদিনে ঠিক করে ফেলেছি,– বড়দার মতো হব না কোনোদিন।

যখন ক্লাস নাইনে, মেজদা প্রথমবারের জন্য বিদেশে যায়। সিদ্ধান্ত নিই,- যেভাবেই হোক, আমাকেও যেতে হবে। 'কেন?' সে'কথা ভাবিনি। হয়তো ভাবার মতো বোধবুদ্ধিও ছিল না। মায়ের উইডো পেনসান, বড়দার শতচ্ছিন্ন জীবনের পাশে মেজদার সেই বিদেশ যাওয়া যেন একটা জেহাদ!– এক ছাদের নীচে বাস

করা একই পদবির একদল ছাপোষা মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে পরিস্থিতির মুখে একটি সপাট চড়। সেদিনই ভাগ্যে শিলমোহর পড়ে যায়, চাকা একবার যখন ঘুরেছে, সে গতি বজায় রাখতেই হবে।

বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, চৌম্বকক্ষেত্রে পরিবাহী তার ডানদিকের বদলে বাঁদিকে ছুটলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হত, তা নিয়ে বিজ্ঞানী ফ্লেমিংসাহেবের বিস্তর মাথাব্যথা থাকতে পারে, আমার কোনোকালেই ছিল না। উদ্দেশ্য অনেক গোদা। জানতাম, এ লাইনে পড়লে চাকরি-বাকরি জোটে ভালো, বিদেশযাত্রারও সুযোগ বিস্তর।

বলতে ভুলে গেছি, শৈশব কেটেছে গোবরডাঙায়। ফলে ছাত্রজীবন সেখানেই শুরু। গ্রাম্য মফস্বলের এক অনামী প্রাইমারি স্কুল।– ছোট্ট অফিস বাদে একটিমাত্র ক্লাসঘর। আর বছর দশেক ধরে অসমাপ্ত দ্বিতীয় ঘরটি গর্ভে বিছুটি আর চিতিগাছের জঙ্গল নিয়ে অন্যদিকে দাঁড়িয়ে। নিচুক্লাসের লেখাপড়া চলত ওই ঘরেরই পাশে একটি বটগাছের ছায়ায়। একা কুম্ভের মতো বৃদ্ধ মাস্টারমশায় আমাদের অঙ্ক কষতে দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন সেই অসমাপ্ত ঘরটির দিকে।

মৈনাক বলত, মাস্টারমশায়ের নাকি বড়ো সাধ ছিল অবসরের আগে একদিন অন্তত ওই দ্বিতীয় ঘর থেকে উঠে আসা নামতার শব্দ, ব্ল্যাকবোর্ডে চক ঘষার শব্দ নিজের কানে শুনবেন।

জীবনে যেদিন সেই চরম কাঙ্ক্ষিত বিদেশযাত্রার সুযোগ পাই, কেনেডি এয়ারপোর্টের বাইরে পা রাখতেই মৈনাক হঠাৎ বলে ওঠে, 'গোবরডাঙার সেই বটগাছের গন্ধটা পাচ্ছিস?'

এক ঝলকে চোখের সামনে ভেসে এলেন বৃদ্ধ মাস্টারমশায়। মনে হল, নিউইয়র্কের মাটিতে পা রেখে সেই শূন্য দৃষ্টি, সেই অসমাপ্ত ঘর,– সবার হয়ে বদলা নিলাম।

সেদিন মনে হয়েছিল। এখন ভাবলে হাসি পায়।

কলেজে 'একমাত্র বন্ধু' বলতেও সেই মৈনাক। একসঙ্গে আড্ডা, হৈহুল্লোড়, আবার কাউকে কিছু না জানিয়ে এখানে-ওখানে পালিয়েও যাওয়া। সবচেয়ে বেশি বোলপুরে। জ্যারিকেন ভর্তি মহুয়া নিয়ে কত রাত যে কাটিয়েছি কোপাই নদীর পাড়ে।

মৈনাকের যে বান্ধবী ছিল, তারই সঙ্গে প্রথম শরীরঘটিত পৌরুষের আত্মপ্রকাশ। সেদিন আমার ঘামে ভেজা বুকে আঙুল রেখে মেয়েটি বলল, 'তুমি খুব অদ্ভুত।'

– কেন?

– এত নিবিড় ভাবে ঠোঁট ছোঁয়ালে, কিন্তু সেই স্পর্শে কী অসাধারণ ঘৃণা! এই বর্মটা কেন পরে থাকো?

– নিজেই বললে বর্ম, আবার জিজ্ঞেসও করছ, কেন পরেছি!

– ভয় হয়, তোমার এই বর্ম ডিঙিয়ে কোনোদিন ছুঁতে পারব কি?

ও পারেনি। পারতে দিইনি। এরপর, একাধিক নারীর বিশ্বাস ভাঙার সময় প্রতিবার নিজেকে বলেছি,– এরা এমনই হয়, এদের বেশি পাত্তা-টাত্তা দিয়ে লাভ নেই।

আচ্ছা, একজন মানুষ সারা জীবন ধরে কী অর্জন করে বলুন তো? আগে ভাবতাম– তার পরিচয় বা তথাকথিত 'ইমেজ', যা ইহকালের সোনার মেডেল আর পরকালের রজনীগন্ধার হার।

এদিকে প্রথমে মৈনাকের বিশ্বাস ভাঙলাম, পরে ওই মেয়েদের। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও অন্য ইমেজ বানিয়ে গেলাম। বছরের পর বছর নিজেকে বোঝালাম,– কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। এই একই কথা ক্রমাগত বলতে বলতে আর শুনতে শুনতে একদিন রক্তে মিশে গেল। অথচ, আজও একমাত্র বন্ধু সেই মৈনাক। যখন ওর কথা ভাবি, উপলব্ধি হয়,– একজন মানুষের সারাজীবনের একমাত্র অর্জন নিরাসক্তি।

এখন রাত প্রায় একটা। পাড়ার গলির মুখে পোস্টঅফিসের খোলা বারান্দা, চৌকিদারের খাটিয়া। পাশে ঢিমেতালে রেডিও বাজছে। মালিক ঘুমোলেও তার রেডিও জাগে সারারাত। জানান দেয়, 'আমি আছি-। আছি-।'

বসে আছি। অনেকক্ষণ ধরে। কেউ ডাকছে না। ক্লিনিকটি বেশ সাজানো-গোছানো। চারটি বড়ো বড়ো বাহারি সোফা। কাঁচের সেন্টার-টেবিলের ওপর বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে গোটাচারেক খবরের কাগজ, পত্রিকা। উলটোদিকের দেওয়ালে সমুদ্র ও সূর্যাস্তের অয়েল পেন্টিং। রিসেপশনের ফুলদানিতে একগুচ্ছ অর্কিড। এয়ারকন্ডিশনার চলছে, আর মৃদুস্বরে সেতারের সুর।

খুব অধৈর্য লাগছে। কেন যে মৈনাকের পাল্লায় পড়ে এখানে আসতে গেলাম? আগেরদিন ওই ডক্টর গুহ লোকটি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কুষ্ঠি ঠিকুজি সবকিছু খুঁচিয়ে ঘষঘষ করে কয়েক লাইন লিখে দিলেন। তা উপশম নাকি আরওগ্য– কীসের যে দাওয়াই, তিনিই জানেন। বললেন আবার আসতে। ভদ্রলোককে মোটেই খুব একটা ভরসাযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু, মৈনাক সেই ঠেলতে ঠেলতে হাজির করালো। এদিকে নিজেই বেপাত্তা! পৌঁছেই বলে কিনা তক্ষুনি একটা সিগারেট না খেলে নাকি চলবেই না! কিন্তু, এতক্ষণ ধরে গোটা প্যাকেটই শেষ করছে নাকি?

ডাক এল আরও মিনিটদশেক বাদে। হুকুমমতো দু-নম্বর কাউন্সিলিং রুমে ঢুকলাম। এ কী! ডক্টর গুহ কই? তার বদলে এক কমবয়সি মহিলাডাক্তার। মুখটি খুব চেনা-চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিকঠাক মনেও পড়ছে না। আমাকে দেখে উনি হাসলেন, 'বসুন। আমি ডক্টর অনুভা রায়।'

– ডক্টর গুহ?

– উনিই আমাকে আপনার বিষয়টা রেফার করেছেন।

– সে ঠিক আছে, তবে-! আচ্ছা, আমার ঠিক কী হয়েছে বলুন তো?

ডক্টর রায় আবার হাসলেন, 'সেটিই বুঝতে চাইছি। ফাইল দেখেছি, তবে আপনার নিজের মুখে শুনতে চাই।'

– কী শুনবেন বলুন।

– এই, আপনার শৈশব, স্কুল, কলেজ, চাকরির কথা, আপনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব।

বিরক্তি লাগল।– 'সবই তো আগের দিন বলেছি। আপনার হাতের ওই ফাইলটাতেই ডক্টর গুহ নোট নিচ্ছিলেন।'

– আমাকে না হয় আরও একবার বললেন। আপত্তি আছে?

– তা নেই। তবে সত্যি বলতে কী, আদৌ কিছু হয়েছে কিনা আমার সেখানেই সন্দেহ। নেহাত মৈনাক বারবার জোর করছিল, তাই। আমি কোনোদিনই কোনো প্রবলেম ফিল করিনি।

– মৈনাক কে?

– আমার বন্ধু। আই মিন ক্লাসফ্রেন্ড।

– তিনিই আপনাকে এখানে আসার কথা বললেন?

– হ্যাঁ। ইনফ্যাক্ট আজও ও-ই ধরে বেঁধে আনলো। আর বলবেন না, আমাকে রিসেপশানে বসিয়ে সেই যে গ্যাছে, আর পাত্তাই নেই!

– মোবাইলে ধরার চেষ্টা করেছেন?

– ও একটু উদ্ভট প্রকৃতির। হাজারবার বলেছি, তবু কিছুতেই মোবাইল নেবে না। এক-একবার এক-একটি অজুহাত দেয়। বলে, কোনো ফোন-টোন লাগবে না। ওর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হলে, ও নাকি এমনিই জানতে পারবে। আচ্ছা, আমার ট্রিটমেন্টের সঙ্গে মৈনাকের কী সম্পর্ক? আর ট্রিটমেন্টটিই বা কীসের?

– না এমনিই। যাক গে, অন্য কথা বলুন।

– কী বলব?

– আপনার পরিবার?

– মা আর আমরা তিন ভাই। প্রায় তেইশ বছর হল বাবা নেই। বড়োবৌদিও মারা গ্যাছে বছর চারেক। একটি ভাইপো আছে, তার মামাবাড়িতে থাকে। মেজদা বিদেশে সেটেলড্। বিয়ে-টিয়ে করেছে কিনা জানি না।

– আপনার মা?

– মা শুধুই মা। বলার মতো কিছু নেই।

– আচ্ছা। এবার আপনার কাজের কথা কিছু বলুন।

– কাজ, মানে চাকরি? দেখুন, চাকরি করতে তিনটি অস্ত্র লাগে। তেল, কাঠি আর বাঁশ। ঊর্ধ্বতনকে তেল, সহকর্মীকে কাঠি আর অধস্তনকে বাঁশ,– অস্ত্রগুলি জায়গা বুঝে ঠিকমতো ব্যবহার করে গেলে ভাত-কাপড়ের সমস্যায়

পড়তে হয় না। তবে ব্যাপারটি একটু জটিল, হিসেবের সামান্য গোলমালে এর অস্ত্র ওকে দাগলে,– মানে, ধরুন অধস্তনকে তেল, সহকর্মীকে বাঁশ বা ঊর্ধ্বতনকে কাঠি দিয়ে ফেললে মহাবিপদ।

বেশ জোরে হেসে ওঠে ডাক্তার।– 'ফর্মুলায় সাফল্য পেলেন?'

– একদম পাইনি বললে মিথ্যে বলা হয়।

– সেই সাফল্যে আপনি কি সন্তুষ্ট?

আমি চুপ। ডাক্তার আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি স্যাটিসফায়েড?'

– বাইশ বছর বয়েসে মুখে সিগারেটের গন্ধ নিয়ে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে চড় খেয়েছিলাম। আর বয়স যখন ছাব্বিশ, তখন রাত পৌনে একটায় প্রোমোশন পার্টি ফেরত তার মদ্যপ ছেলেকে দরজা খুলে দেওয়ার সময় মায়ের মুখে কোনো রাগ বা দুঃখ দেখিনি। এটাই সাকসেস। বাড়িতে বাড়তি খাতির, কলিগদের ঈর্ষা, লেট-নাইট পার্টি, একটা জমকালো ধাঁ-চকচকে জীবন,– এটাই সাকসেস। মাই হার্ড-আর্নড্ সাকসেস। বিশ্বাস করুন, 'এই জেনারেশানটাই ফালতু', 'এদের দ্বারা কিস্যু হবে না'-এসব শুনতে শুনতে কান পচে গেছিল। শুধু যেন এক গ্লাডিয়েটরের মতো যুদ্ধ করে চলেছি। নিপুণ অস্ত্রচালনা দেখে বাকিরা আনন্দ পেয়েছে। পড়ে পড়ে মার খেয়েছি যখন, জুটছে বড়োজোর দু-একটা উহু-আহা। এই প্রতিটা জয়-পরাজয়ে যে কত রক্ত ঝরে, তার হিসেব কে রাখে?

– হুম্। সেখানে আপনার সেই বন্ধু, মৈনাক ছিল না?

– ছিল। ইনফ্যাক্ট, ওর টার্মিনেশন লেটারে তো আমিই সই করেছি। জানেন, ও হাসতে হাসতে চলে গেল!– এই অহংকারটা আমার কিছুতেই সহ্য হয় না।

– আপনি কি নিশ্চিত, সেটা অহংকারই ছিল?...

কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতার পর ডক্টর রায় বললেন, 'আসলে, মৈনাকেরা বোধহয় এমনই হয়।'

– আশ্চর্য! মৈনাক কেমন সে'কথা আপনি জানবেন কী ভাবে?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর রায়।– 'এতক্ষণেও চিনতে পারলে না? তোমার সেই বর্ম আজ শরীর ছাড়িয়ে চোখদুটোও ঢেকে ফেলেছে হয়তো।'

– ওহ্, তুমি! মুখটা তাই খুব চেনা-চেনা লাগছিল।

– তবু চিনতে পারোনি। তোমার চোখ দুটো খুব নিস্তেজ লাগছে আজ। কিছুদিন বিশ্রাম নাও। আর মৈনাকের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস কোরো, সে কেমন আছে।

অনেকক্ষণ প্রশ্নটা ঘুরপাক খায় মাথার ভেতরে। মৈনাক কেমন আছে? ... 'কেন' আছে মৈনাক?!

এরমধ্যে মৈনাকের সঙ্গে দেখা বা কথা– কোনোটিই হয়নি। ডাক্তার, মানে অনুভার পরামর্শে দিনদশেকের জন্য ছুটি কাটাতে এসেছি, বোলপুরে। আজ সন্ধে

নাগাদ হোটেল থেকে একটা গাড়ি জুটিয়েছিলাম। সারারাত ঘুরতে ঘুরতে এখন সেই কোপাই নদীর পাড়ে। জল প্রায় নেই বললেই চলে। একটি উলঙ্গ শিকড়ের গায়ে হেলান দিয়ে আমি আধশোয়া। খোলা আকাশ। চারিদিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। তিরতিরে ধারায় পায়ের পাতা ডোবানো। একটু দূরে এক বাউল গান ধরেছে। বাতাসের ঝাপটায় আসা-যাওয়া করছে কথাগুলো;-

'এসো এসো রে প্রাণের বন্ধু গো-
আমি দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই...'

– কী ভাবছিস?

– আয়, বোস। কখন এলি?

– সে'সব ছাড়, ওই বুড়ো ব্যাটা কেমন গান ধরেছে দেখেছিস? এর সঙ্গে মহুয়া ছাড়া জমে?

– গাড়িতে স্কচ্ আছে। নিয়ে আয়।

দ্রুত কয়েকটা চুমুক দিয়েই মৈনাক সেই বাউলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করে;-

'পানি-কাউর দয়াল পাখি
রাতদিন তারে জলে দেখি
হাবুডুবু করে মলো, তবু কাদা গায়ে মাখল না।
উপায় বলো না, আমার চিন্তা জ্বর তো গেল না...'

গান শেষ হয়। মৈনাক ফিরে আসে।– 'তারপর, ছুটি কেমন কাটছে?'

– ভালোই। তুই হঠাৎ বোলপুরে?

– সে এক দারুণ ব্যাপার। আমাদের সেই নুমিসম্যাটিকস্ চর্চার কথা মনে আছে?

– থাকবে না কেন!

– খেয়াল আছে, সে'সময় তিনটে দুষ্প্রাপ্য কয়েন আমরা কত খুঁজেছি?

– হ্যাঁ। ওই তো, ১৮০৭-এর হাফ-প্যাগোডা, ১৮৬২-এর ভিক্টোরিয়া, আর-

– আর ১৯১০-এর কিং জর্জ।

– হ্যাঁ।

– এত বছর খোঁজার পর হঠাৎ এখানকার এক কাছারিবাড়িতে সেই 'হাফ-প্যাগোডা' পেলাম। অবশেষে।

আমি উত্তেজিত, 'তাই নাকি? কই দেখি!'

টর্চের আলোয় যখন সেই ঐতিহাসিক মুদ্রা উলটে পালটে দেখছি, মৈনাক হঠাৎ বলল, 'একটা মজার ব্যাপার খেয়াল কর,– এখন এই কয়েনটি আমার আছে, তোর নেই। তবে, আমাদের মিল হল, দুজনেই এটা চেয়েছি। কিন্তু, এই বুড়ো বাউলটাকে দেখ, কেমন মনের আনন্দে গান ধরেছে! ওর কাছে এই মুদ্রার দাম কতটুকু? আজ রাতের জ্যোৎস্না তাহলে কার? আমার? তোর? নাকি ওই বাউলের?'

মৈনাক চলে গেল। 'আজ রাতের জ্যোৎস্না তাহলে কার?'- অনেকক্ষণ ভাবলাম। ওদিকে সেই বুড়ো বাউল গান ধরেছে;-

'ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়?
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়...'

এ কী গাইছে লোকটি? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না! 'আপনঘর'-কতদিন আগে, কত দূরে ফেলে এসেছি সেই ঘর! পথ জানা নেই। এক রাতের জ্যোৎস্নায় এত অন্ধকার তাড়াই কী করে? ওরে মৈনাক, এ তুই কোথায় ছেড়ে দিলি?

চৌকিদারের রেডিও এখনও সজাগ। তারসঙ্গে এলোমেলো একটা চিৎকার!-দিবাকর। এককালে কবিতা লিখত। এখন বদ্ধ পাগল। রাত বিরেতে রাস্তায় রাস্তায় এমন চিৎকার করে কবিতা বলতে থাকে। কিন্তু, ওর গলা আজ অবিকল বোলপুরের সেই বাউলের মতো শোনাচ্ছে। চিৎকারটি কিছুটা এগিয়ে এলে কথাগুলি স্পষ্ট হয়;-

'বর্শার ফলার মতো জ্যোৎস্না। ক্ষতচিহ্ন সারা শরীরময়।
মুঠোয় কিছু ঘাস দিল ধরা।
আর সমস্ত সংশয়।
যত মিথ্যে বলেছি, 'ভালোবাসি' মিথ্যেটা সব চেয়ে প্রিয়।
শুধরে নেওয়া হয়নি যদিও।
এবার তবে কি শেষ?
উড়ে মর ঝরে যাওয়া ফুল,
কুলুঙ্গির বাতিল চশমায় জমা ঝুল। দোলনার দেশ।
সে পথে হয়নি যাতায়াত।
গলানো মোমের বুকে খোলামকুচি মূর্তি গড়ে রাত। পোড়ায় ঘর।
ইচ্ছেরা ঠায় বসে। নিথর...'

হঠাৎ মায়ের কথা মনে আসে। তার যেদিন ঘুম আসে, সেদিন শিশুর মতো ঘুমোয়। আসে না যেদিন, সারারাত জানালার দিকে চেয়ে বসে থাকে। অসম্ভবকে সম্ভব করে মাঝরাতে যদি তার মেজোছেলে হাজির হয়, দরজা খুলতে হবে তো!

দীর্ঘ সাত বছর এই খেলা খেলতে খেলতে কখনও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। আমি পাশের ঘরে শুই। মাঝের তিন ইঞ্চির দেওয়াল মায়ের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ঢাকতে পারেনা।

এক-এক রাতে মা চুপিচুপি এ'ঘরে আসে। শিয়রে বসে মাথায় হাত বোলায়। সব টের পাই। চোখ খুলে ঘুমের আড়ালটুকু ভাঙতে দিই না।

আজ আমি মায়ের ঘরে ঢুকলাম। ঘুমোচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পর, গায়ে হাত রাখতে মা ঘুমের ঘোরেই আমার হাতের ওপর হাত বুলোতে লাগল। ছোটোবেলায় মনে আছে এই তালু ছিল খুব নরম, চড়থাপ্পড়েও খুব একটা আঘাত লাগত না। এরপর, তিন দশক ধরে এ'বাড়ির দেওয়াল, মেঝে, আসবাব, বাসনপত্র আর

জামাকাপড়দের ঘষে-মেজে পরিষ্কার রাখতে রাখতে সে' হাত এখন খসখসে। এই ক্ষয়ধরা হাত এখন কিছু বলতে চাইছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। জানি, আর যে' ক-দিন মা থাকবে, হাতদুটো একই ভাবে বিলিয়ে দেবে এ'বাড়ির কোণায় কোণায়। যদিও আজও মা বলে, 'এটা তোদের বাড়ি'।– তারপর?

ওফ্, বড্ড মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়ছি! উঠে দাঁড়াই। ওঘর থেকে ফেরার পথে হঠাৎ মায়ের প্রতি ঈর্ষা জাগে,– বড়োছেলের চাকরিতে উন্নতি, মেজছেলের ফিরে আসা, ছোটোছেলের একটি সংসার,– মায়ের জীবনে তিন-তিনটে স্বপ্ন এখনও জীবিত!

আমার ঘরের রাস্তার দিকের জানালাটায় কে যেন বাইরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। সন্দিগ্ধ মনে পাল্লা খুলি।– এ তো মৈনাক!

– কী রে, তুই? এত রাতে! কী ব্যাপার?

– মনে আছে, তুই ছবি আঁকতিস?

– হ্যাঁ। কিন্তু কেন?

– আজ একটা আঁকবি। কাল সকালে দেখব।

– ধুস্, রঙ-তুলি সব কোথায় হারিয়েছে তারই নেই ঠিক। কী যে বলিস!

– তুলির বাক্সটা পুঁতে রেখেছি উঠোনের হাসনুহানা গাছের নীচে।

– আর রং?

রহস্যজনক ভাবে হেসে ওঠে মৈনাক, 'রং আছে, মন দিয়ে খুঁজলেই রং আছে।... চলি। ছবিটা আঁকিস কিন্তু।'

ধীরে ধীরে মৈনাক বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ও আঁকতে বলে গেল। কিন্তু কেন?

একসময় মেজদার ঘর ছিল যেটা, আজ তা এ'বাড়ির স্টোররুম। বেশ কিছু সাদা ক্যানভাস পড়ে থাকার কথা, আর ইজেল প্যালেটও। কিন্তু তুলি?

এদিক-ওদিক খুঁজে ঘরের এক কোণে পড়ে থাকা একটি লোহার শিক তুলে নিই। আবছা অন্ধকারে বারকতক হোঁচট খেয়ে পৌঁছই সেই হাসনুহানা গাছটির কাছে। পায়ের সামনে কী যেন একটা নড়েচড়ে ওঠে। শুনেছি, হাসনুহানার গন্ধে সাপ মাতাল হয়। তাই হবে হয়তো। প্রথমবার আঘাত করতেই কিছুটা মাটি গায়ে ছিটকে আসে। পরপর আরও কয়েকবার ঘা মারার পর একটি পুরনো, মরচে-ধরা বাক্স বেরিয়ে এল।

বাঁহাতের মুঠোয় কয়েকটি তুলি, ডানহাতে চাবি ঘোরাই মেজদার ঘরের অবাধ্য তালায়। টের পাচ্ছি, পা অল্প অল্প টলছে। বহু চেষ্টায় ঘরটি খুলতেই একঝলক ভ্যাপসা গন্ধ হামলে পড়ল। রেশ কাটতেই অনেকগুলো চেনা গন্ধ তাদের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করে।– গোবরডাঙার বটগাছ, বোলপুরের মহুয়া, মায়ের বিছানা, অফিসের রুমফ্রেশনার থেকে অনুভার শরীর অবধি।

টেবিলের ওপরে রাখা একটি ক্যানভাসের মোড়ক খুললাম। এ কী! এটা তো সাদা হওয়ারই কথা ছিল, তার বদলে কিনা দুর্বোদ্ধ একটি ছবি!– কে আঁকল?

আর একটি ক্যানভাসের মোড়ক খুলি, তারপর আরও একটি...। সবাই ছবি, কোথাও আর সাদা নেই! আমি জানি, এরা এমন ছিল না। বহুবছর এই ঘরে ঢোকেইনি কেউ।

তাহলে কি আজ আঁকা হবে না? কিন্তু, সকালে মৈনাক আসবে, কী দেখাব ওকে? মাথাটা প্রচণ্ড জোরে চেপে মেঝেতেই বসে পড়ি।

এক মিনিট... দু-মিনিট... কিছু সময় গেল। এ'ঘরের দেয়ালেই আজ আঁকব। তিন-চারটে দেরাজ ঘেঁটে রঙের বাক্স খুঁজে আনি। আহ্, সব জমে পাথর হয়ে রয়েছে।

মৈনাক বলেছিল রং আছে। হ্যাঁ, রং তো আছেই। এদিক-ওদিক হাতড়ে একটি পুরনো পেনসিল কাটার ছুরি খুঁজে পেলাম। সেটি দিয়ে হাতে দাগ টানলে নুনছাল উঠল, রং উঠল না। এবার আরও জোরে দাগ দিই।– এই তো, এই তো ফোঁটাফোঁটা গাঢ় তাজা রং! প্যালেট ভর্তি করে জুটিয়ে তুলি ডোবাই।

– ও কী করছিস রে পাগল?

চমকে উঠি, 'তুই! এখনও যাসনি?'

শয়তানটা শব্দ করে হেসে ওঠে, 'কোথায় যাব? তোর রংগুলো সব জমাট বেঁধে আছে যে। এই নে।'-

বলেই হঠাৎ একমুঠো রং ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে দিল মৈনাক!

বেশ কয়েক ঘণ্টা টানা এঁকে চলেছি। এখন ভোররাত। আলো ফুটেছে কিনা বোঝা দায়। চৌকিদারের রাতজাগা রেডিওয় কবীর সুমন গাইছে;-

'কে বেশি পাগল? কবি না কবিতা
দরকার নেই সেই হিসেব দেবার
ঘুমোও বাউন্ডুলে, ঘুমোও এবার...'

হাতের তুলিটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি। ভোরের আলো ফুটলে মৈনাক আসবে। ছবি অনেকটাই বাকি।

*****

'সংবর্তক', ২০১৩

আকাশ অংশত মেঘলা

সেদিন সকাল থেকেই অঝোরে বৃষ্টি। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের চারতলা ফ্ল্যাটের জানালার পাশে বসেছিলেন সুদীপ বসু। গোটাচারেক অটোরিকশার মাঝে দলছুট হয়ে ভিজছে ডক্টর শর্মার কালো শেভ্রোলে গাড়িখানা। ভিজছে ভুল বানানে লেখা 'অন্নপূর্ণা বাঙালি হোটেলে'র সাইন বোর্ড। 'অন্নপূর্ণা' তার মায়ের নাম। চোখে পড়তেই দূর-শৈশবের ঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল যেন।...

শৈশব— সে প্রায় পাঁচটি দশক আর কয়েক হাজার মাইল দূরের কথা। ছোট্টবেলার গ্রামের বাড়ি। সকাল তখন সাড়ে পাঁচটা। ঘুম ভেঙেছে, তবু ভোরবেলার আরামের বিছানা ছাড়ার কোনো ইচ্ছে নেই। কলপাড়ে বাসনপত্র নামানোর শব্দ। একটু বাদেই মায়ের গলা, 'দীপু ওঠ। ছ'টা বাজতে যায়, পড়তে বসবি না?'

আকাশে এমন সুন্দর মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি। পাশবালিশের অসাধারণ ওম। তার মধ্যে কিনা– ধুত্তোরি পড়া, ভাল্লাগে না ছাই!

কিছুক্ষণ পরেই একটা ঠাণ্ডা ভেজা হাত মশারির মধ্যে ঢুকে কানটা মুচড়ে ধরে। রাগী রাগী মুখে মা দাঁড়িয়ে, 'বাঁদর ছেলে, পড়াশোনা নেই?'

আর যায় কোথায়! এক লাফে বিছানা ছেড়ে, কলঘরে হাতমুখ ধুয়ে, উচ্ছে চেবানোর মুখে পড়তে বসা। দুধ জিনিসটা মানুষে খায়? ওয়াক্ থুঃ!

অঙ্কখাতার শেষপৃষ্ঠায় বেশ কিছু ঢাল-তরোয়াল আঁকা হল। এবার বই-এর পাতার দুমড়ানো কোনাগুলি কিছুক্ষণ নখ দিয়ে খুঁটে সোজা করা। ইতিহাসের বইটা খোলা আছে মাত্র। চোখ ট্যারা করে লেখাগুলো ঝাপসা দেখতে বেশ মজা। এও এক লুকোচুরি খেলা। মুখের সামনে বই ধরে শুধু মুখে অস্পষ্ট গুনগুন। কাছাকাছি কোনো পায়ের শব্দ পেলে হঠাৎ চিৎকার, 'পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন–।'

আটাশ ইঞ্চির অ্যাভন্ সাইকেলখানা পরিষ্কার না থাকলে বাবার কাজে যাওয়ার মেজাজ মাটি হয়। স্নানের আগে রোজ সেটিকে তেল-সাবান দিয়ে মুছতে বসে। সেদিনও তাই করছিলেন। সাইকেলখানা স্ট্যান্ডের উপর দাঁড় করানো, এক হাতে প্যাডেল ঘুরিয়ে অন্য হাতে একটুকরো কাপড় চেপে ধরেছে চাকার রিংয়ে। ঝকঝকে ইস্পাতে মিঠে রোদ্দুর ঠিকরোয়। একজোড়া দোয়েল পাখি কলপাড়ের পাশে খাবার খুঁটতে ব্যস্ত।

— মা, টুলি-বুলিদের খেতে দিয়েছ?

'তুমি পড়াশোনা করো।' মা গজগজ করতে থাকে, 'ছেলে-মেয়েতে মিলে বাড়িটাকে চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছে!'

টুলি-বুলি ওর পোষা খরগোশ। উল্টোরথের মেলায় কেনা হয়েছিল। এছাড়াও দিদির বিড়াল, ছাদের ঘরে বাক্স-ভর্তি পায়রা, খাবারের ব্যাপারে তারা স্বাবলম্বী। সাদার ওপর কালো ছোপ দেশি কুকুরও আছে। চাচা চৌধুরী পড়ে দীপু নাম রেখেছে রকেট।

ঘড়িতে তখন আটটা পঁচিশ-তিরিশ, হঠাৎ টুপ-টাপ বৃষ্টি নামল। পাশের ঘর থেকে ঠাকুমার চিৎকার, 'ও বৌমা, বড়িগুলো তুলে আনো শিগগির।'

দীপু প্রার্থনা করতে থাকে, হে ভগবান, বৃষ্টিটা যেন আজ অনেকক্ষণ ধরে হয়, তাহলেই স্কুলে রেনি ডে! ক্ষণে-ক্ষণে শুধু ঘড়ির দিকে তাকানো, দুচ্ছাই, কখন যে ন'টা বাজবে?

ন'টা বাজতে না বাজতেই এক খাবলা তেল কোনোমতে মাথায় ঘষে সোজা কলপাড়। রইল পড়ে তোর পানিপথ! হতচ্ছাড়া বাবর আর ইব্রাহিম লোদি, তোরা যুদ্ধ করে মর। অস্ত্রে কম পড়লে বলিস, জ্যামিতি বক্সে দু-দু'টো কাঁটা কম্পাস আছে।

চোখের নিমেষে স্নান সারা। খাওয়ার গতিকে 'গোগ্রাস' বললে গোরু লজ্জা পায়। তিন দিন আগেই ছাতা হারিয়েছে। অগত্যা, মানকচুর পাতা মাথায় স্কুলের পথে দৌড়। এমন দিনেই তো স্কুলে যাওয়ার আসল মজা।

রাজা, বিশু, তোতনরা হাজির। কিন্তু দলে দলে আরও অনেকেই তো আসছে। সেরেছে, সবাই চলে এলে তো রেনি-ডে হবে না। দলের পাণ্ডা তোতন। ও-ই একমাত্র সিগারেট খেয়েছে কিনা, আলাদা খাতির। সে বলে, 'এক-একজন এক-একটা রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে বাকিদের আটকাই চল। প্রেয়ার-টা কেটে গেলেই তো কেল্লা ফতেহ্।'

- হেডস্যার জানতে পারলে?

- আরে, দাদার কলেজে হামেশাই ক্লাস বয়কট হয়। কায়দাটা জানা আছে। টেনশান নিস্ না।

হেডস্যারের ঘোষণায় যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে ছুট। বিশুদের বাড়ি স্কুলের কাছেই। ব্যাগগুলো রেখেই এক-দৌড়ে ডাকাতে-কালীর জঙ্গল। জঙ্গলের গভীরে পুরানো জমিদার বাড়ির নাটমন্দির। অন্যসময় আসা বারণ, সাপ-খোপের খুব উৎপাত।

পকেট থেকে লাট্টু বেরোয়, লেত্তি বেরোয়। ঘণ্টা-কতক ওতেই কাটে, নজর যায় ছাদের ঝাড়বাতিতে। জৌলুস নেই, তবে ইংরেজ আমলের তো, লাল-নীল-সবুজ-সাদা কাঁচের টুকরোগুলি তখনও যেন হীরে, চুনি, পান্নার মতো চোখ টানে। এ তো গুপ্তধন! ঢিলের ঘায়ে কতক পড়ে, কতক ভাঙে, মজাটুকু থাকে

ষোলোআনাই।

হঠাৎ বিশুর চিৎকার, 'আরিব্বাস, কত্তবড়ো সোনাব্যাঙ!'

পুরো দল সে'দিকে ছোটে।

তোতোন বলে, 'চল, ধরি।'

ব্যাস্, মহোল্লাসে মেতে ওঠা সেই মহান কাজে। ব্যাঙ ধরতে জলে-কাদায় লুটোপুটি, জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাই। কুছ পরোয়া নেই!

সকাল গড়িয়ে দুপুর ছুঁই-ছুঁই, ব্যাঙ ছেড়ে ওরা তখন মল্লিকদের বাগানে জামরুল গাছে উঠেছে। দীপু দেখে, একটা বিরাট কালো ছাতা গাছটার নীচে এসে থামে। হঠাৎ ছোটোকাকা ওর তলা থেকে বলে উঠল, 'এই দীপু, বৃষ্টির মধ্যে গাছে উঠেছিস? হাত-পা ভাঙবি তো! নাম শিগ্‌গির।'

দুরুদুরু বুকে বাড়ি ফেরা, আর ঢুকেই হ্যাঁচ্চো। আর যায় কোথায়, হাঁচির শব্দ পেতেই মা, ঠাকুরমা দুদিক থেকে ছুটে এসে কেউ জামা খুলে দেয়, কেউ মাথা মোছায়।

এখনও মনে পড়ে বাবার সেই বজ্রনাদ, 'এবার জ্বরটাও বাধাও, ঠেঙিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেব হতভাগা।'

সন্ধে নাগাদ বেশ জ্বর জ্বর লাগছিল। দীপু চাদর মুড়ি দিয়ে এসে বসে মায়ের কাছে, রান্নাঘরে।

— মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে? দাও না মা।

মা কপালে হাত ছোঁয়ায়, 'তোকে নিয়ে যে কীভাবে চলি? এত জ্বালাতন করিস। আর কবে বড়ো হবি?'

...

ও বড়ো হল। কী আশ্চর্য, সেদিনও বৃষ্টি! কলেজ স্ট্রিট। 'চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জি' বইয়ের দোকান। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সুদীপ ট্রামলাইনের দিকে তাকিয়ে। হাতে জয় গোস্বামীর একটি বই। কী আশ্চর্য, তার নামও 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'!

ভেতরে তখন উথালপাতাল, যা নরকযন্ত্রণা চলছে। তিন দিন ধরে ফোন তুলছিল না মৌমিতা। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ও কলকাতায় আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন চাকরির মেয়াদ তখন সবে মাস-তিনেক। ছুটি পাওয়া যায়নি। ছাড়তে হয়েছে।

টানা ছত্রিশ ঘণ্টা বম্বে মেলের টয়লেটের সামনে কাগজ বিছিয়ে বসে থাকা। বুকভরা উৎকণ্ঠা, হাওড়ায় নেমেই বুথ থেকে ফোন করে মৌমিতাকে। কলকাতার নম্বর দেখেই বোধহয়, সে তুলেছিল। সাড়া পেয়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে সুদীপের।

ট্রেনে ওঠার ঘণ্টা-কতক পর থেকেই, মগজ যখন একটু শান্ত, পুরানো

সেই দ্বিধা ফিরে আসছিল বারবার। ভাবনায় উঁকি দিচ্ছিল কুশলের মুখখানা।

স্টেশন থেকে মৌমিতাকে ফোন করা, দেখা করতে চাওয়া, এমনকী কফি হাউসে কাটানো সময়গুলো জুড়ে সেই দোটানার হাত থেকে নিস্তার পায়নি মোটেই। এক-এক মুহূর্তে মনেও হয়েছিল, না এলেই হয়তো ভালো হত। বেশ তো থিতিয়ে এসেছিল জীবন। কেন যে—?

একে-অপরের জন্মদিন, নববর্ষ বা বিজয়ার শুভেচ্ছা বাদ দিলে যোগযোগই ছিল না তেমন। দিন-পনেরো আগে থেকে হঠাৎ ঘনঘন ফোন করতে শুরু করে মৌমিতা। সুদীপ একটু অবাক হয়েছিল বটে, কিন্তু তেমন কিছু পায়নি প্রথমে। তবে শেষদিনের ফোনটা ছিল অন্যরকম।

— কী ব্যাপার বল তো, আজকাল প্রায় রোজ ফোন করছিস!

— অসুবিধা হচ্ছে?

— না না, আসলে কলেজের পর এত ফ্রিকোয়েন্ট কোনোদিন কথা হয়নি, তাই ভাবলাম। কোনো সমস্যায় পড়িসনি তো?

— একটা কথা বলার ছিল। সামনের সপ্তাহে আমার এনগেজমেন্ট।

— বাহ্, দারুণ খবর। এতদিন চেপে গে'ছিলিস! পাত্র কে?

হঠাৎ মৌমিতার গলায় রাগ, 'এটা তোর দারুণ খবর মনে হল!'

ও অবাক, 'রেগে যাচ্ছিস কেন?'

'তোর দ্বারা কিস্যু হবে না।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠে আচমকা ফোনটা কেটে দেয় মৌমিতা!

হঠাৎ সুদীপের শরীর জুড়ে হিমঝড় বয়ে যায় যেন।– ও ধরা পড়ে গেল!

দিন-কতক আগের কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই মোবাইল বাজে। ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, 'হ্যালো!'

'কোথায় তুই?'— গলার ভাবখানা এমন, যেন কিছুই হয়নি।

– কফি হাউস। দোতলায়।

– দোতলার নামে তো আগে নাক সিটকোতিস। সেখানে নাকি ন্যাকা-নেকিরা প্রেম করে!

সুদীপ চটে যায়, 'এত বাজে বকিস কেন?'

সেই দোতলাতেই বসেছিল ওরা সেদিন।

– হাঁ করে কী দেখছিস?

– এই চোখ, তার এমন উদাসী ভাষা, একগাছি চুল মুখের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া–।

– প্লিজ থাম। প্রথমত, ফ্লার্ট-টা করিস না। আর দুই, এত বোকা-বোকা কাব্যিক কথা তোকে একদম মানাচ্ছে না।

– না রে সিরিয়াসলি, তোকে দেখে রক্তকরবীর নন্দিনীর কথা মনে হচ্ছে।

– নাটকটা ভীষণ ভালো লাগে। বুড়িয়ে যাবার আগে একবার নন্দিনী

সাজার ইচ্ছে ছিল জানিস। বছর চারেক আগে ইউনিভার্সিটির ফেস্টে সেই শখ পূর্ণ হয়েছে।

– জানি। তবে দুর্ভাগ্য, নন্দিনীর সঙ্গে দারুণ ভাবে মানিয়ে যায় এমন একজনকে নন্দিনীরূপে দেখতে আসতে পারিনি সেদিন। ... কী হল, হাসছিস কেন?

– এভাবে এমব্যারাস্ করে দিলে হাসি ছাড়া আর কী দিয়ে ঢাকব!

– কে বলেছে ঢাকতে?

– খুব সাহস, তাই না!

একটু গুটিয়ে যায় সুদীপ। কয়েক দফায় অর্ডার করা দু'টো কোল্ডকফি আর দু'টো হাফপ্লেট পকোড়া নিয়ে মিনিট-চল্লিশের বেশি কাটানো গেল না। আকাশের যা অবস্থা, যে কোনো সময় মুষলধারায় নামবে, টানবেও অনেকক্ষণ। যাওয়া কোথায় যায়?

কলেজে পড়তে এই কফি হাউসের ব্ল্যাক কফিতে রাম মিশিয়ে খাওয়া, 'এখন' আর 'তখন'-এর কফির স্বাদে তফাৎ। থার্ড পেপারের সাজেশন চাইতে গিয়ে পি কে জি-র কাছে হেনস্তা, বম্বের পিজি, মৌমিতার স্কুল, আধবুড়ো ভূগোল মাস্টারের গায়ে পড়ে আলাপের চেষ্টা,– হাজারটা গল্প হয় ঘণ্টাখানেক ধরে। কিন্তু, প্রসঙ্গে আসতে ওরা দু'জনই আড়ষ্ট।

— বাড়ি কবে যাবি?

— পাগল! বাড়িতে জানেই না কলকাতায় এসেছি।

— কেন?

— বাবা-মা দু'জনেই দুশ্চিন্তা করতে খুব ভালোবাসে। গিয়ে কী বলব? কেন এলাম হঠাৎ!

— কেন এলি?

'তোর জন্য' বলতে গিয়েও থেমে যায় সুদীপ।

ওরা প্রেসিডেন্সিতে ঢোকে। কলেজ বিল্ডিং-এর মাঝখানে ফুটবল মাঠ। মাঠেই বসে পড়ে। ওরা নিশ্চুপ, বাদবাকি পৃথিবীর সঙ্গে যেন কোনো সম্পর্কই নেই।

আবার বৃষ্টি নামে। মাঠের ঘাসগুলো তখন যেন সন্ধের কাঁচাঘুম-ভাঙা! অবুঝ চোখে চেয়ে। বৃষ্টির জলে চোখ ঝাপসা। কিন্তু বহু মাঝরাতের বেয়ারা স্বপ্নটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল চোখের সামনে। সে স্বপ্ন তখন খুব কাছে, ঠিক যেন মন-ছোঁড়া-দূরত্বে। জলে ভেজা হাতের রেখাদের মুখে তখন একটাই প্রশ্ন, এত দেখাও কেন জীবন?

যেন বিশাল এক ঢেউ, যার স্রোত আছে, ঘূর্ণি আছে, এমনকী চোখের সামনে সৈকতও আছে। নেই শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ার অধিকার। কিন্তু, বুকের মাঝে অনুভূত সেই আমন্ত্রণ, তার কী হবে? দ্বিধা কাটতে চায় না। আসলে এই আছড়ে

পড়ার ইচ্ছে বা তার অনাধিকার—দু'টিই বহুদিনের অভ্যেস। কথা হয় না, সন্ধেটা জমতে জমতে রাত নেমে আসে। ...

এমজি রোডের ওপর 'হোটেল শান্তিনিকেতন'। ঘরভাড়া দেড়শো টাকা। ভাড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘরের দেওয়াল, বিছানা-বালিশ, বাথরুম। মৌমিতাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে হোটেলে ফিরতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। গত একঘণ্টায় প্রায় দশ-বারোটা সিগারেট পুড়েছে। কাঠের জানলার ফাঁকফোকড় দিয়ে জলের ছিঁটে আসছে চোখে-মুখে। তখনই মৌমিতার ফোন।—

'পৌঁছে খবর দিলি না?'— গলায় অদ্ভুতরকম প্রশান্তি।

সুদীপ কোনো উত্তর দেয় না।

— একটা কথা ছিল।

— বল।

'জানি না, পুরোটাই ভুল বুঝেছি কি না। তুই তো কিছু বললি না। প্রশ্নটা আমিই করছি।'— কয়েক মুহূর্ত থমকে যায় মৌমিতা, 'আমাকে বিয়ে করবি?'

হৃদ্‌ধ্বনি জোরালো হয়। সুদীপ কিছুটা সময় নেয় নিজেকে গুছিয়ে নিতে, 'হ্যালো।'

— শুনছি।

গলা ধরে আসছে। ও ধীর লয়ে বলতে থাকে, 'কীসের টানে এতদূর ছুটে এলাম, তা আমিই জানি। তুইও বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়। আমার হাবভাবই সব বলে দিচ্ছে। কিন্তু, যে কারণে কলকাতায় এসেও মনে মনে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, সেটা তোর জানা উচিত। কুশলের খবরটা পেয়েছিলিস?'

— কাগজে পড়েছিলাম।

— আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল। বি এসসি-র পর আমি বম্বে গেলাম, ও সায়েন্স কলেজে ঢুকল, তখনও যোগাযোগ ছিল। চাকরির মাস ছয়েক বাদে বলেছিল, ওদের প্ল্যান্টে বড়োসড় একটা গোলমাল ধরে ফেলেছে। সেটাই কাল হল ওর। কাগজে লিখেছিল, অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু, একজন ইঞ্জিনিয়ার এতটা কেয়ারলেস হতে পারে না, যে রানিং ব্লাস্ট-ফার্নেসে পড়ে যাবে। আসলে ওকে খুন করা হয়েছিল। ভাবতে পারিস, কী বীভৎস, কী যন্ত্রণাদায়ক—!'

'চুপ কর।'— মৌমিতা থামিয়ে দেয় ওকে।

'সরি। হয়তো ভাবছিস, তোর-আমার গল্পে কুশল কেন?— তুই হয়তো জানিস না, গল্পটা হওয়ার কথা ছিল তোর আর কুশলের। কলেজে জানতাম না। পরে হঠাৎই একদিন আমাকে বলেছিল। জেনে কষ্ট হয়েছিল খুব। মিথ্যে বলব না, ঈর্ষাও হয়েছিল। কারণ, আমিও তো—। আজ দুপুর থেকে যতবার ভেবেছি এগিয়ে যাই, বারবার কুশলের মুখটা ফিরে আসছিল। জানি, জীবন থেমে থাকে না। তবু—।'

ফোনের দু'প্রান্তে তখন শুধু বৃষ্টির শব্দ।

...

ঘাটকোপর থেকে কুরলায় ট্রেন বদল, সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে হারবার লাইন ধরে পানভেল, প্রায় দু'ঘণ্টার পথ। কিন্তু, সদ্য সংসার পেতে খরচের দিকটাও দেখতে হয়। অফিস থেকে অনেকটাই দূর, তবে নতুন 'কোঠি'তে এসে সুদীপরা যেন শ্বাস নেওয়ার জায়গা পেয়েছে।

সে বছরের প্রথম বৃষ্টির দিন। গলির মুখে মৌমিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সারাদিনের ক্লান্তি এক নিমেষে উধাও! বেশ লম্বা গলি। সম্বল বলতে এক বেঁটে লেডিস ছাতা। দু'জনই ভিজছিল, তবে শুধু বৃষ্টিতে না, তার সঙ্গে অন্যকিছুতেও!

— একটা ছাতা নিয়ে তো বেরতে হয়।

— আমার ওসব পোষায় না।

'তোমার তো কিছুই পোষায় না!' একটু রাগ দেখায় মৌমিতা।

আবার কিছুক্ষণ সেই নীরব পথচলা, মৌমিতা ওর হাত ধরে। বেশ মজা পায় সুদীপ, 'মাঝরাস্তায় মেঘমল্লার ধরবি নাকি?'

দুম করে হাত ছেড়ে দেয় মৌমিতা, 'যত্তসব বাজে কথা!' জামা-কাপড় না বদলেই সুদীপ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল। দু'কাপ কফি নিয়ে মৌমিতা আসে, 'এতক্ষণে মাথাটাও মুছতে পারনি। সত্যি, তোমাকে নিয়ে যে কীভাবে চলব!'

— ব্যাপার কী, হঠাৎ 'তুমি'র বাতিক চাপল কেন?

— কালকে ফোনে মা খুব ঝেড়েছে। বলেছে, 'ছোটোলোকের মতো তুই-তোকারি করবি না।'

— বললি না কেন আমরা ঘোর কমিউনিস্ট, ছোটোলোক-ভদ্রলোক শ্রেণীবিভেদ মানি না।

— মাথাতেও আসে!...

কফি শেষ। মৌমিতা খুব চেনা, খুব প্রিয় একটা সুর গুনগুন করছিল।

– গলাটা বেশ ভালো।

– তাই নাকি!

– ওই আর কী, পেঁচা কয় পেঁচানি, খাসা তোর চেঁচানি।

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চাটি।— 'তুই কি সারা জীবন এ'ভাবেই জ্বালাবি?'

'যাক, এই তুমি-তুমিটা জাস্ট নিতে পারছিলাম না।' প্রায় হুকুম লাগায়, 'অনেক হল, এবার মাথাটা মাসাজ কর দেখি।'

কোণের মড্যুলার চেয়ারটায় বসে পড়ে সুদীপ।

...

সেদিনও বসেছিলেন, আজও বসে আছেন। প্রায়বৃদ্ধ সুদীপ বসু। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। পাশের টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ল্যাপটপ, গাড়ির চাবি, ওষুধের বাক্স, স্মার্টফোন, চশমা, আধুনিক বিষয়ী পুরুষের নানাবিধ উপচার।

সুদীপ চাইলেও এখন আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারেন না। জানলা খুলতেও

ভয় হয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাঁপানির টান বাড়ে। বৃষ্টি নামলে ঘরের ভিতরে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, এ কেমন বৃষ্টি?

'মা, মিতা,— কেন তোমরা চলে গেলে? দেখো, আজ এমন কেউ নেই যাকে জ্বালাতন করতে পারি। পরশু রিটায়ারমেন্ট। তারপর আরও একা!'...

— আবার সিগারেট ধরিয়েছ! তোমার না হাঁপানির ধাত, এক্ষুনি ফ্যালো।

সিগারেট ফেলতে ফেলতেই আর এক প্রস্থ শুরু, 'বয়সটা বাড়ছে, না কমছে? এই বৃষ্টির মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া বুকে লাগাচ্ছ। চাদর কোথায় তোমার? এবার জ্বর-টর বাঁধলে আমি কিন্তু কিছু জানি না। ... এ কী, এখনও ওষুধ খাওনি? সত্যি বাবা, তোমায় নিয়ে যে কীভাবে চলব!'

হঠাৎ চমক লাগে। মহাকালের একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হয় চোখের সামনে।

— খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে গেলি মা।...

বাইরে তখনও মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে।

*****

'বর্তমান', ২০১৮

মাতৃসদন

আজ ওর জয়েনিং। মেট্রন সবিতা দেববর্মার কাছে রিপোর্টিং টাইম দশটা। তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিল সুতনুকা। দশটা কুড়ি বাজে। বাসটা এমন ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে এল!

বাতাসে গানের কলি। বাসস্ট্যান্ডের মন্দিরে আজ রক্ষাকালী পুজো।

'রূপ যদি তোর এতই ভালো মুণ্ডমালা কেন গলে।

দয়াময়ী নাম যদি মা, শিব কেন তোর চরণতলে॥'

...

এদিকে অফিসঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ধমক, 'প্রথমদিনই লেট? খুব ভালো লোক পাঠিয়েছে! তা, এর আগে কোথাও কাজ-টাজ করেছ?'

– না।

'এটা হাসপাতাল নাকি ইস্কুল?'– প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে সবিতা। 'কাজের বেলায় সব লবডঙ্কা, সার্টিফিকেটও সার। বেছে বেছে পাঠায়ও বটে! ডাক্তার থেকেও নেই। এক বুড়ি মেট্রন, সুইপার আর রাঁধুনি।— আড়াইজনে হাসপাতাল চলছে! হঠাৎ হঠাৎ এক-একজনের উদয় হয়। ঠিক করে ফার্স্ট-এইড় শিখতেই ছ-মাস, আর তারপরেই বাবুবিবিরা সব শহরে পোস্টিংয়ের জন্য হামলে পড়বেন। তা তো হবেই, পাড়াগাঁয়ে তো আর সিনেমা-সুপারমার্কেট নাই, নার্সিংহোমের খেপ-উপরিও নাই। যত্তসব!'

ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আবার ধমক, 'একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো, গাঁয়ের লোকের না হয় কইমাছের জান। সহজে যায় না। হাড়মাস জ্বালিয়ে খায়। অন্য রুগি নিয়ে যা খুশি শেখাশেখি করো ক্ষতি নাই, কিন্তু ম্যাটার্নিটির পেশেন্ট নিয়ে কোনোরকম আনাড়িপনা সহ্য করব না।'

বাপ রে বাপ! বেশ ঘাবড়ে যায় সুতনুকা। বাঘা শাশুড়িরা নতুন বউদের হেঁশেল-ঘরে এমন অভ্যর্থনা জানায়, তা বলে হাসপাতালের মেট্রন?

– ড্রেস এনেছ?

– হ্যাঁ।

– তাহলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওই ডানদিকের ঘরে চেঞ্জ করে নাও।

...

টেবিলে দুটো ইঞ্জেকশনের শিশি আর সিরিঞ্জ। 'যাও, তিন নম্বর বেডে দিয়ে এসো। পারবে তো? নাকি সূঁচ ফোটাতে মাথা ঘোরে? আজকালকার মেয়েদের তো ঢঙের শেষ নাই।'

অকারণ এতগুলো কথা শুনে রাগ হচ্ছিল। শিশিদুটো হাতে নিয়ে ও অবাক, 'এই ডোজের মরফিন! এ তো ক্যান্সারের-?'

'জানি।' নিজের মনে ফাইল গুছোচ্ছিল সবিতা।

– না, মানে ডাক্তারবাবু-?

– ডাক্তার! সপ্তাহে একদিন আসে শুধু খাতায় সই করতে। সদরে তার জমা প্র্যাকটিস। এক্স-রে, ই.সি.জি.-র বাঁধা কমিশন। এখানে আছেটা কী? মাইনে তো এমনিও পাবে ওমনিও পাবে।

– তাহলে রুগি?

– দেখে ভগবান, আর রাখে ভাগ্য। কথা বাড়িও না। শুনছ না, কাটা পাঁঠার মতো কাতরাচ্ছে-?

ওয়ার্ডে ঢুকে ও হতবাক! মাত্র একটাই ওয়ার্ড, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। পাঁচখানা মাত্র বেড, ছ-নম্বরটি ভাঙা। একনম্বরে দুজন রুগি গাদাগাদি করে শুয়ে, দু-নম্বরের ডেলিভারি হয়েছে আজ ভোরে। তিন নম্বরের ক্যান্সার। চারে মশারির মধ্যে ছটফট করছে যে মেয়েটি,– দু'দিন আগে স্টোভ ফেটে তার হাত-মুখ ঝলসে গিয়েছে। পাঁচনম্বর বিছানা বমি-বিষ্ঠায় মাখামাখি।– সুইপারের আগে হাজির হয়েছে কুকুর! ঘরের মেঝেয় জনা তিরিশেক,– সবাই নির্বিকার! অসুখ তাদের বহুকাঙ্ক্ষিত সুখ। বিনাপয়সার ডাল-ভাতের অবসর।

'আপনেরে মেট্রনদিদি ডাকতিছে।'– বালতি, ঝাঁটা, ফিনাইল হাতে রাধেশ্যাম। জলে মগ চোবাতে চোবাতে সে হুকুম ছাড়ে, 'তোমরা বাইরে গিয়া বসো, সাফাই হব।'

পায়ে প্লাস্টার নিয়ে শুয়েছিল একজন। রাধেশ্যাম নিজের পা দিয়ে গুঁতো দেয় তার পেটে।– 'অই হারামজাদা, ওঠ। শুধু একখান ঠ্যাং ভাঙছে বলে জোয়ান বয়সে পইড়া পইড়া ঘুমাস, লজ্জা করে না?'

হাসপাতাল থেকে কিছুটা দূরে নাথপাড়া। দাওয়ায় আধশোয়া তৌফিক। ইদানীং একদিন কাজে গেলেই পরদিন বিছানা ছাড়া দুষ্কর হয়েছে তার। অসহ্য ব্যথায় তলপেট ঝনঝন করে। তার বিবি রহিমা বহুবার হাইড্রোসিলটা কাটিয়ে আসতে বলেছে, কিন্তু কে শোনে?

ওর এক উত্তর, 'হাসপাতালে গ্যালেই কইব,– কাজ বন্ধ, সাইকেল চড়া বন্ধ, একমাস শুইয়া থাকো। এই সময়ে চাষার ছেলের কি ঘরে বসে থাকা চলে? ধানকাটার আয়ামের পর না হয় যামু। আর হাসপাতাল মানে তো মেট্রনদিদি। এই রোগ লইয়া জেনানার লগে কথা কইতে শরম লাগে না?'

সন্ধের দিকে ব্যথা কমেছে কিছুটা। ওর জন্য একবাটি মুড়ি নিয়ে আসে

বড়োমেয়ে শাবানা, 'আব্বা-।'

– মনছুর আইছে?

– না।

-অহনও আই নাই! সাজান?

– দেখি নাই।

– কী দ্যাখছস্, হিন্দি বই? ভাইয়ের খোঁজ রাখবার পারো না, দুনিয়ার হিরো গো ছবি আইন্যা সাজাইয়া রাখো। বেহায়া মাইয়া, বয়সকালে বিয়া হইলে ছাওয়ালের মা হইতিস এই উমরে।

আম্মা বলত, পোয়াতিকালে আল্লাহপাকের নাম করতে হয়। রহিমার সাতটি ছেলেমেয়ে। দোয়াগুলো মুখস্থ। তসবিটা দুই চোখে ছুঁইয়ে বালিশের তলায় রাখে।– 'বিয়া দেওনের এতই যদি শখ, যাও না, দামাদ ধইরা আনো দেখি! ঘরে একখান প্যাটও তো কমে।'

'কই গো তোফেক মিঞা, শোনলাম তোমার নাকি শরীল খারাপ? ... এ কী, তুমার তো সুপারি ফুলে নারকোল হয়েছে গো!'

মনসুরের সঙ্গে বুলুরানি ঢুকেছে। রহিমার গা-পিত্তি জ্বলে ওঠে, মনেমনে গালি দেয়।– 'অই আইছে, ভাতারখাকি মাগি!'

কাঁচাবয়সের বিধবা এই বুলু অনেকের ঘর পুড়িয়েছে একসময়। এখন চুলে কলপের রং। ধরেছে অন্য কাজ। কোনো ধান্দাতেই এসেছে নিশ্চয়। অনেক লোকজন তার হাতে। প্রচুর ক্ষমতা। নইলে রহিমা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করত।

দরজা খুলে বাইরে আসে রহিমা। ঘোষবাড়ির শাঁখে ফুঁ পড়ছে, সাড়ে ছয়টা বাজতে যায়। হাঁসগুলান এখনও ফিরে নাই। সে আপনমনে গজগজ করতে থাকে, 'ঘরে এতজন লোক, কারও যদি হুঁশ থাকে!'

পুকুরের দিকে মুখ করে আওয়াজ তোলে, 'আ চৈ চৈ চৈ চৈ।'

...

'অতঃপর চিন্তি লক্ষ্মী নারায়ণে কয়।
কী রূপে হরিব দুঃখ কহ দয়াময়॥'

হাসপাতালের চৌহদ্দিতে গুটিকতক স্টাফ-কোয়ার্টার। দুলে দুলে পাঁচালি পড়ছিল সবিতা। সুতনুকার সেদিকে মন নেই। পাঁচালি শেষ করে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে সবিতা। দু-টুকরো নকুলদানা সুতনুকার হাতে দেয়।

– এদের কাজকম্মের কোনো ছিরি-ছাঁদ নাই। আজ দেখি জয়েনিং লেটারে তোমার নামে 'শ্রীমতি' লেখা। ভুলের একটা সীমা থাকে, একজন কুমারীর নামে-!

'ভুল করে নয়।' ও কোনোমতে জবাব দেয়।

– অ। তা ঘরসংসার ছেড়ে এ চুলায় কেন? শাঁখা-সিঁদুরেরও তো নামগন্ধ নাই।– ফ্যাশান?

সুতনুকা নিরুত্তর।

– বুঝেছি। ছেড়ে পালিয়েছে?

সম্বোধনের 'তুমি' এক মুহূর্তে 'তুই'। সবিতার গলায় সহমর্মিতা, 'মরতে বিয়ে করতে গেছিলিস কেন? ঘরে দড়ি-কলসি ছিল না?'

– আমি দেখতে খারাপ, কালো।

– সে বুঝি কাত্তিকঠাকুর ছিল?

ও জবাব দেয় না। সবিতা কিছুটা যেন সান্তনার ঢঙেই বলে, 'নিজের মাকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছিস, তুই দেখতে কেমন? জানিস, তোর চোখদুটো কী সুন্দর? পুরুষমানুষ তার মূল্য বোঝে?'

সোজা হয়ে বসলে আলমারির কাঁচে সুতনুকা নিজের মুখটি দেখতে পায়। যেন বহুদিন পর মনে পড়ে সত্যিই তার চোখদুটি ভারী মনোরম।

– আমার কপাল তোরই মতো। সে বলত, কারও রূপ হয় বুক পোড়ানো। আর আমার মুখ যেন আগুনে পোড়া। একদিন পালাল। শাঁখা-টাঁখা সব ছাড়লাম। শুধু এই লোহা-বাঁধানোটা হাতে আছে। মায়ের স্মৃতি।

পরদিন পঞ্চানন বাবাঠাকুরের পুজো। নাথপাড়ার অশ্বত্থতলায় থান। খুব জাগ্রত। ইনি কোলের বাচ্চাদের ধনুষ্টঙ্কার, পুঁয়ে ধরা রোগ থেকে বাঁচান। পুরোমন্দির চত্বরটা তাঁর দোরধরা কচিকাঁচা আর তাদের মা-ঠাকুমাদের ভিড়ে গিজগিজ করছে। তাদের মধ্যে বসেছিল সবিতা, কিছুটা চিন্তিত। কুসুম-মেয়েটা এখনও আসে না কেন? আজ ওর ছেলের বারো বছর পূর্ণ হল। জন্মের সময় যমে-মানুষে টানাটানি, রক্তবমি আর সেই সঙ্গে জ্বর। ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি বাবাঠাকুরের জলপড়াও দিয়েছিল সবিতা। পনেরো দিন পর জ্বর নেমেছিল। সে ছেলের আজ প্রথম ক্ষৌরি, বাবাঠাকুরের পায়ে দিতে হয়। 'কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই মেয়েটার! জন্মদিলেই কি মা হয় রে?'– ও গজগজ করে ওঠে।

'দিদি, আপনারে সুতোদিদি ডাকতিছে।'– সাইকেল ছুটিয়ে এসে হাঁফাচ্ছিল রাধেশ্যাম, 'একটা মোছলমান বৌ আইছে, পোয়াতি। আপনারে ছাড়া কাউকে দেখাব না কইতিছে।'

– চল যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়ায় সবিতা। পাশের এক মহিলাকে বলে, 'তাঁতিপাড়ার কুসুমকে খবর দিও। বলবে ছেলে নিয়ে মন্দিরে আসতে বলেছি।'

হাসপাতালে রহিমাকে দেখেই সবিতার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল, 'আবার? মরবি যে রে ছুঁড়ি! লজ্জা করেনা? বছর বছর-!'

একগাল হাসি রহিমার, 'কী করব বলেন?'

– কী করবি মানে? ব্যাটাছেলে হয়েছে সব! বঁটি দিয়ে কেটে দিতে পারিস না?

কান গরম হয়ে যাচ্ছিল সুতনুকার। সবিতা চেঁচাচ্ছে, 'শরীরে কিছু আছে? এই ধকল সামলাবি কী করে?'

– সব আল্লার ভরসা দিদি।

– আল্লার ভরসা তো তার কাছেই যা। এখানে জ্বালাতে এসেছিস কেন?

– কিছু না, ছয় মাস হইছে কিনা। গেলবার এই সময় টিটেলাস ইনজেশন দেছিলেন। তাই ভাবলাম।

– ডাক্তারিটাও শিখে গেছিস দেখি। এই দিদির কাছে নিস নি কেন? শুধু শুধু পুজো ছেড়ে ওঠালি।

– সুঁচ ফুটাতে ডর লাগে যে। আপনের ধমক খাইলে অবশ্যি চইলা যায়।

– থাক, আর দাঁত বার করতে হবে না। যাওয়ার আগে প্রসাদ নিয়ে যাবি। ভুলিস না যেন।

...

বেলা পড়ে এসেছে। সারাদিন বুভুক্ষুর মতো রোদ গিলে এখন মাটি যেন আগুন ওগরাচ্ছে। ওরা দুজন হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠানো ওষুধ লিস্ট মিলিয়ে গুছিয়ে রাখছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সবিতা জানে,– বরাদ্দ যা হয়, আসে তার সিকি ভাগ।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই টানাটানির সংসার চালাতে প্রায় নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। মাঝেমাঝেই নিজের গ্যাঁটের পয়সা হাতে ধরিয়ে রাধেশ্যামকে ছোটাতে হয় বাসস্ট্যান্ডের ওষুধের দোকানে। গাঁয়ের লোকেও অবশ্য ভালোবেসে চারটে বেগুন কী একটা চালকুমড়ো বা একজোড়া ফুলকপি দিয়ে যায় কখনও কখনও। সেই দিনগুলোয় রুগিদের পাতের জেল্লা একটু বাড়ে।

'যা-ই বলুন, এখানকার লোকজন আপনাকে খুব ভালোবাসে।'– শেষ প্যাকেটটা তুলে রেখে সুতনুকা বলে।

– সে-ই তো বিপদ। ভালোবাসার এক জ্বালা আছে, সে কিছুতেই ভালো থাকতে দেয় না।

কথাটা হয়তো ঠিক। দুশ্চিন্তা তার যমজ বোন, উৎকণ্ঠা আর পাগলামির সঙ্গেও তার গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক।

জানালার ওপারের আলপথ। ছেঁড়া ফাটা সাইকেলের চাকা এক টুকরো লাঠি দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি চার-পাঁচবছরের ছেলে। গায়ে এককুচি কাপড় নেই। লিকলিকে হাত-পা, অস্বাভাবিক ফুলে ওঠা পেট। অনাহার আর অপুষ্টির চিহ্ন ভীষণ প্রকট।

'ওই যে, ছুটছে আমাদের ভবিষ্যৎ।'– সবিতা মনেমনে ভাবে।

হাসপাতালে মাঝেমাঝে এক-একটি মেয়ে আসে, সঙ্গে তাদের সাজানো স্বামীরা। বাচ্চার জন্ম দেয়। দু-দিন থাকে। আবার উধাও হয়ে যায়। এই সময়গুলোয় ডাক্তারবাবুর কর্মোদ্যম হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়।

ও জানে, এরা কেউ আসল স্বামী-স্ত্রী নয়। এরা বাচ্চার জন্ম দেয় তাদের বিক্রি করার জন্য। ইচ্ছে করে– মেয়েগুলোর গালে ঠাসঠাস চড় কষাতে, সঙ্গের লোকগুলোর গলা টিপে ধরতে। কিন্তু তাদেরই বা কী দোষ? পেটে ধরে বলেই

না মুখে দু-মুঠো জোটে!

না বেচে উপায়ই বা কী? নিজের ইচ্ছায় চারটে জন্মালে শেষ পর্যন্ত একটা কী দুটো বাঁচে, বিশবছর পর আরও গণ্ডাখানেক হাভাতের জন্ম দিতে। মেয়ে জন্মালে আর এক আপদ। যে ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরায়, সে ঘরের মেয়েকে পার করাতে কয়েক ভরি রুপো, বরপণের সাইকেল অথবা ক্যামেরাআলা ফোন— এসব জোটাতে কালঘাম ছুটে যায়।

কালার টিভি দিতে পারেনি বলে শামীম আলির মেয়েটা তালাক খেয়ে ঘরে বসে আছে। এখন রাত-বিরেতে জানলা-দরজায় ঢিল পড়ে, ঝোপের মধ্যে থেকে খ্যাখ্যা-খিখি করে একদল জানোয়ার।

হাসপাতালের গেটে শশা, পেয়ারা নিয়ে বসে নীচুপাড়ার সনৎ হালদার। কথা বলতে পারেনা। মেয়ের বিয়ের তিনমাসের মাথায় দেনার দায়ে ফলিডল গিলেছিল।

কিছু বলার মতো কেউ নেই। গা চিড়বিড় করে সবিতার,– 'বোবার দেশে কালার টিভি, যত্ত আদিখ্যেতা!'

মানুষগুলোর অসহায়তা দেখে ভিতরটা ছটফট করে। দাবানলের সামনে ওর সম্বল যে মাত্র এক ঘটি জল।

আজ আউটডোরে বসে আছে যে হিন্দুস্থানি বউটি, ক-দিন আগে জানতে এসেছিল,– তার পেটের বাচ্চাটি ছেলে না মেয়ে?

এতদিনের অভিজ্ঞতায় সবিতা জানে, বেঁচে থাকার জন্য শুধু মায়ের দুধই যথেষ্ট নয়।

– তুই ইউরিয়া ইঞ্জেকশন রেডি কর। ... রাধেশ্যাম, এই রাধেশ্যাম, বৌটাকে ডাক।

– ইউরিয়া ইঞ্জেকশন কী হবে সবিতাদি?

– ওদের বাড়ির লোক চায় না মেয়ে হোক। তাই-।

– মেয়েই যে হবে– বুঝলে কী করে? আইনে তো-!

– রাখ। সরকারি সাইনবোর্ডের কথা আর শোনাস না। ছেলে না মেয়ে চিহ্ন দেখেই বুঝতে পারি। যন্ত্র লাগে না, যে আইনে আটকাবে।

– চিহ্ন?

– দুদিনেই জেনে যাবি। সবুর কর।

ওরা অফিসঘরে কাগজপত্র ঠিক করছিল। মেয়েটির স্বামী জায়গামতো টিপসই দিয়েছে। সবিতা অস্বাভাবিক রকম নির্লিপ্ত। সুতনুকার মনে যেন একটা কাঁটা খচখচ করতে থাকে।

– কী ভাবছিস?

– মেলাতে পারছি না দিদি। এই ক-দিন তোমাকে যা দেখেছি, আজ সকালেও তোমাকে যা দেখেছি, সেই তুমি-টা আসল, না এই তুমি?

– দুটো একই পয়সার এপিঠ-ওপিঠ। তোর মনে হচ্ছে আমি বোধ হয়

ডাইনি, জল্লাদ। ভেবে বলতো, মেয়ে হয়ে জন্মে কী পেত? তুই-আমি কী পেয়েছি? গর্ভপাত আজকে হবে ঠিকই, বাচ্চাটা তো সেদিনই মরেছে, যেদিন ওর বাপ-মা ভেবেছিল তাদের মেয়ে চাই না।

– কিন্তু-?

'কীসের কিন্তু! যার আপনজন তাকে জন্ম দিতেই চায়না, সে বেঁচেই বা কী করবে? হয় সারাজীবন ঝাঁটা-লাথি খেয়ে মরবে, না হয় বিক্রি হবে দালালের হাতে। দালালের হাতে না পড়লে রাস্তাঘাটে কোনো একদিন কেউ না কেউ তাকে নষ্ট করবে। তখন আইন শাস্তি দেবে কি দেবে না, সে আইনআলারা জানে। তখন সরকার এসে ঘর দেখে দর ঠিক করবে।– বাগদিবাড়ির মেয়ে? পাঁচহাজার। মুখুজ্জে-চাটুজ্জেবাড়ি? পঞ্চাশ। খোদ এম.এল.এ.-র পাড়ার? তবে তো একলাখ।

গালভরা নাম দিয়েছে সব,– ক্ষতিপূরণ! ক্ষতি কার হল, কীসেই বা পূরণ হয়, কে-ই বা তা জানে? মানসম্মানের দাম হয়? মেয়ের চরিত্র যাই হোক, কপাল একই থাকে। শুধু খদ্দের হলে আগে পয়সা দেয়, সরকার দেয় পরে।'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে সবিতা হাঁফাচ্ছে। চুপচাপ শুনছিল সুতনুকা। ওর মনে হল, কখনও কখনও মানুষের ভিতরের মমতাই তার বাইরেটাকে এমন নির্মম করে তোলে।

কয়েক মাস কেটে গেল। এ ক-দিনে চাকরিতে বেশ ধাতস্থ হয়ে উঠেছে সুতনুকা। জয়েন করার পর এই প্রথম ক-দিন হাসপাতালে তেমন কোনো রুগি ছিল না। এই সুযোগে রাধেশ্যাম গিয়েছে তার এক জ্ঞাতির বাড়ি। সবিতাদি আসামে,– কামাক্ষ্যা মন্দিরে পুজো দিতে।

গতকাল দাদা ফোন করেছিল। আবার কোন এক পাত্রের খোঁজ পেয়েছে। বছর দশেকের বড়ো, তবে দেখে নাকি মনে হয় না। তার প্রথমপক্ষের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে একবছর হল। তবে কোনো ছেলেপুলে নেই। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে, তবে বিরাট ব্যবসা।

দাদার ব্যাকুলতা দেখে আগে রাগ হত, এখন আর হয় না। না, ও আর বিয়ে-টিয়ে করবে না। সংসার তো পেয়েছেই, এত বড়ো একটা সংসার! এখানেই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবনটা। হাজার সমস্যা থাকলেও মানুষগুলো খুব সহজ-সরল, খুব তাড়াতাড়ি ওকে আপন করে নিয়েছে। ও না থাকলে সবিতাদিও হয়রান হয়ে যায় আজকাল। ওষুধ দেওয়ার সময়, সেবা-শুশ্রূষা করার সময় নিজেকে কেমন যেন মা-মা মনে হয়। ওর নতুন নামটাও বেশ মজার,– সুতোদিদি!

আজ জন্মাষ্টমী। হাসপাতাল চত্বর ফাঁকা। শুধু ঘণ্টাদুয়েক আগে একটি মেয়ে ভর্তি হয়েছে, মঙ্গলা। পাশের গ্রামের মেয়ে, দিল্লি গিয়েছিল ঠিকে-ঝি-র কাজ নিয়ে। কিন্তু প্রায় বিশ-পঁচিশজনের হাতবদল হয়ে শেষে পালিয়ে এসেছে। তার শরীরে এখন হাজারটা রোগ আর পেটে বাচ্চা। বাড়ির লোক ঘরে নেয়নি। পরিবারে অনেকগুলো খুবড়ী মেয়ে। একবার বদনাম রটলে তাদের পার করানো

মুশকিল।

এই অঞ্চলে নাকি একটা চক্র আছে, যারা কাজের টোপ দেখিয়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে কমবয়সি মেয়েদের পাচার করে। ছেলেদের নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে তাদের চোখ, কিডনি। খিদের জ্বালায় দুধের শিশুর সওদা হয় মাত্র দু-তিনহাজার টাকায়! তারা জন্মদাত্রী মায়েদের কোলছাড়া হয়ে বড়োবড়ো শহরের রেলস্টেশন, সিনেমাহল, মন্দির-মসজিদ, অফিসবাড়ির ফুটপাথে আফিম খেয়ে ঘুমায়, ভিক্ষার ঝুলি ভরে তাদের সাজানো মায়েদের।

একদিন টুপ করে মরে যায়। মৃতদেহ সৎকারের নামে দ্বিগুণ ভিক্ষা ওঠে তিন-চারদিন ধরে। তারপর? নর্দমা বা ভ্যাট!

গা ঘিনঘিন করছিল সুতনুকার। মনে পড়ে, স্কুলে থাকতে ওর দাদা আবৃত্তি করত, 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি।'

দশমাস চলছে মঙ্গলার। শরীরের যা অবস্থা, বাঁচা কঠিন। কিন্তু বাচ্চাটা? সুতনুকা কি পারবে একা সামাল দিতে? ভরসা পাচ্ছিল না। সবিতাদির ফেরার কথা দুপুরে। 'ততক্ষণ ভালোয় ভালোয় কেটে যাক ঠাকুর!'

হাসপাতালে ফিরে কয়েক ঘণ্টা যেন ঝড় বয়ে গেল সবিতার ওপর। লেবাররুমে মঙ্গলার মৃতদেহ। বাচ্চাটাও বাঁচেনি। প্রায় তিনঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করে ওরা দুজন বিধ্বস্ত। এরপর আবার ডাক্তারবাবু, থানা-পুলিশে খবর দেওয়ার চক্কর আছে।

ওরা অফিসঘরে জিরিয়ে নিচ্ছিল। সুতনুকার চোখে জল। সবিতার গলায় অবাক কাঠিন্য, 'আরও দুটো বাঁচল।'

সন্ধে আটটা নাগাদ ঝোড়ো কাকের মতো হাজির হয় রহিমা।– 'বাচ্চাটারে বাঁচান দিদি।'

– তোর আবার কী হল?

– হারামজাদি বুলুটা কয়দিন ধরে ঘুরঘুর করতেছিল। খবর পাইছি এর আব্বার লগে সওদা করছে। জন্মাইলেই অগো লোকজন আইব। আমারেও শাসাইছে। কইছে, কিছুতেই য্যান হাসপাতালে ভর্তি না হই। যখন-তখন ব্যথা উঠব, কিছু একটা করেন। বাচ্চাটারে লইয়া যান কোথাও। জিন্দা তো থাকব।

– তা কি হয়?

– আপনে চাইলে সব হয় দিদি। আমার ঘরে সাতটা পোলা-মাইয়া, কারে থুইয়া কারে বাঁচাই? আপনের পায়ে পড়ি। কিছু একটা করেন, অহনই পয়দা করাইয়া রাত থাকতে থাকতেই কোথাও তারে লইয়া যান।

– তোর বাড়ির লোক জানে তুই এখানে এসেছিস?

– কলমির শাকে সিদ্দি দিয়া খাওয়াইয়া আইছি। আজ রাত্তিরে ঘুম ভাঙবে না।

'বাচ্চার খোঁজ পড়লে তখন কী বলবে?' সুতনুকা প্রশ্ন করে।

রহিমা হতাশমুখে সবিতার দিকে চায়। এই ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি। অবোধ শিশুর মতো ওদের হাত-পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করে, ‘দয়া করেন দিদিরা। কচি পরান, ওর কী দোষ?’

‘দাঁড়া।’

কিছু একটা ভাবছিল সবিতা, ‘সুতনুকা, অ্যাডমিশনের খাতাটা কোথায়?’

– ওই তো, ড্রয়ারে। কেন?

উত্তরটা সহজ। মঙ্গলার ভর্তি হওয়ার সময় বদলাতে হবে। ‘নাইন এ. এম.’-এর বদলে ‘নাইন পি.এম.’।

মৃত শিশু নিয়ে যাবে রহিমা। মঙ্গলার যদি পোস্টমর্টেম হয়, যদি জানা যায় মঙ্গলা মা হয়েছিল,– বলা হবে, হাসপাতাল সে কথা কিছু জানে না। যদি ঝামেলা না মেটে,– সে ডাক্তারবাবুর ব্যাপার, অ্যাডমিশনের খাতায় তার সই তো থাকবেই, দায়িত্বও তাঁর। পুলিশের সঙ্গে তার দহরম মহরম ভালোই, নইলে কি আর দিনের পর দিন কাজে না এসেও অন-ডিউটি থাকতে পারেন? নিজের পিঠ বাঁচাতেই ওদিকটা সামলে নেবেন। সুতনুকাকে শুধু বলতে হবে হঠাৎ এক আত্মীয়ের শরীর খারাপ হওয়ায় মেট্রন কলকাতায় গেছে।

...

লেবাররুম প্রস্তুত। রহিমাকে ইঞ্জেকশন দিতে যাচ্ছিল সুতনুকা।

সবিতা জানত,– ওই সময় বাচ্চার কান্নার শব্দ ঢাকা যাবে না। ‘এখন না, একঘণ্টা পরে দিস।’

রহিমার যখন ব্যথা উঠল, তখন গৃহস্থবাড়িতে ঘনঘন বেজে উঠছে জন্মাষ্টমী পুজোর শাঁখ, কাঁসর-ঘণ্টা। আর সেই সঙ্গে চলছে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ে কাছেপিঠে কোথাও। সুতনুকার সারা শরীর যেন ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। সবিতা একই রকম অবিচল।

একটানা বৃষ্টির শব্দ। লোডশেডিংয়ে জানালার বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাসপাতালের একদিকে ধানক্ষেত, ঠিক তার মাঝখানে এক বিরাট নিমগাছ। আর একবার বাজ পড়তেই সেটি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। সে কী দৃশ্য! যেন হাজারটা সাপের ফনা আগুনের শিখা হয়ে উন্মাদ নৃত্যে মেতেছে! লেবাররুমের ভিতরে হঠাৎ ঝলমলে আলো। মেঝের ওপর ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে জানালার গরাদের ছায়া। তীব্রতম চিৎকারটি করে রহিমা গা এলিয়ে দেয়।...

– এই দেখ।

– দেখতে চাই না দিদি। আপনি লইয়া যান ওরে।

নিজের ওপর ভরসা নেই রহিমার। মুখ দেখলে যদি প্রাণে চায় বুকে আগলে ধরতে? তাহলে আর প্রাণ বাঁচবে না। তার চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

বুকের দুধ নেওয়া হয়েছে বোতলে। তিনঘণ্টার মাথায় খাওয়াতে হয়। আসাম থেকে ফেরার পর ব্যাগটা আর খোলা হয়নি। সবিতা চটপট কয়েকটা

জিনিস ঢুকিয়ে নেয়। রাধেশ্যামের বর্ষাতি গায়ে চাপায়।

'চলি রে। হাসপাতালটা দেখিস। রোগেভোগে মানুষগুলো যেন সেবাটুকু পায়।'

খুব সঙ্গত প্রশ্নটি এতক্ষণে মাথায় আসে সুতনুকার, 'কোথায় যাবে দিদি?'

ও উত্তর দেয় না। একবার মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকায় শুধু।

ঝড়ে গাছ পড়ে পশ্চিমদিকের প্রাচীর ভেঙেছে। সেদিকেই চলার শুরু। নয়ানজুলি পেরিয়ে যমুনাপুর আমবাগান। তারপরেই বড়োরাস্তা— তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর এই একমাত্র পথ।

বুকের কাছে ঘুমিয়ে আছে শিশুটি। ও ছুটছে। অন্ধকার, বৃষ্টি, সাপখোপ, কোনো কিছুর পরোয়া না করে।

এবড়োখেবড়ো পথ। ইঁট-পাথর, জংলা ঝোপে পা দুটো ক্ষতবিক্ষত।

কিন্তু, প্রতিটা ব্যথা যেন 'মা' বলে ডেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বুকে।

*****

'শিলাদিত্য', বিশেষ গল্প সংখ্যা, ২০১৫

পাশের ঘরে এবং

আবাসনের সবকটি অ্যাপার্টমেন্টই আলোর মালায় সেজেছে। দুপুরের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় এখন বেশ নরম পরিবেশ। বৃষ্টি থামতেই সামনের রাস্তায় দ্বিগুণ উৎসাহী ভিড়।

কবিতা অ্যাপার্টমেন্টের চারতলায় ব্যালকনি। তার এককোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বৃদ্ধ অপরেশ। জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় কষ্টে কুঁচকে যাওয়া মুখ-শরীর তখনও কাঁপছে। ব্যালকনি বেয়ে নেমে যাওয়া বৈদ্যুতিক মালায় আলোছায়া খেলা। আবাসনের মণ্ডপ থেকে তখন অতুলপ্রসাদীগান আসা-যাওয়া করছে— 'বধূ, এমন বাদলে তুমি কোথা ... আজ পড়িছে মনে মোর কত কথা...'

অপরেশ বিড়বিড় করে ওঠেন— 'ফুরাও নবমীর নিশি, ফুরাও।'

ঘরের বিছানায় গত তিনবছরের স্থির চিত্র, নির্মলা মাঝেমাঝে নিজের খেয়ালে ডেকে উঠছেন— 'বাবু এলি?'

অপরেশ হেসে ফেলেন। আবাসনের পুজোমণ্ডপে সারাদিনে এত গান। আর বুড়ির ফাটা রেকর্ড ওই এক জায়গায় আটকে!

'বাবু এলি?'– আরও একবার কথাটা কানে আসতে তিনি আপন মনে বলে ওঠেন, 'আর কতদিনে বুঝবে নিলু? বাবু আর কোনোদিনই ফিরবে না। ওকে না ডেকে বরং প্রার্থনা করো, যত শিগগির হয় আমরা দুজন যেন ওর কাছে চলে যাই।'

বাতাস একটু এলোমেলো। ঘর থেকে দুর্গন্ধ আসছে। অপরেশ বুঝলেন, নির্মলা বিছানায় করে ফেলেছেন। আয়া-মেয়েটি পুজোর ক-দিন ছুটিতে। যা করার তাঁকেই করতে হবে।

হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই মাথাটা একবার টাল খায়। ইলেকট্রিক শক ভালোই ঝটকা দিয়েছে! বোঝা উচিৎ ছিল, ব্যালকনির গ্রিলে বৃষ্টিভেজা সার সার আলোর চেইন। রাস্তা আর মানুষ দেখার লোভে ছুঁয়ে ফেলা ঠিক হয়নি।

রাবার-শিট পরিষ্কারের সময় ছটফট করছিলেন নির্মলা, 'মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল!'

টানা তিন বছর শুধু শুয়ে থেকে থেকে সারা গায়ে বেডসোর। সামান্য এপাশ-ওপাশ হতেই অসহ্য যন্ত্রণা। অপারগ শরীরে অপরেশ ঠিকমতো ওষুধ লাগাতে পারেননি এই ক-দিনে। একজনের ব্যথায় অন্যজনের চোখে জল আসে, 'কেন অযথা এত কষ্ট পাচ্ছ নিলু?'

সারা শরীর নোংরা হয়ে গিয়েছিল। স্নান সেরে ফেরার পথে ঠাণ্ডার কাঁপুনি কাবু করে ফেলেছিল। গায়ে চাদর জড়িয়ে অপরেশ সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। পুজোমণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে— 'মম দুঃখ-বেদন মম সফল-স্বপন তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম...'

নির্মলা শিশুর মতো ঘুমোচ্ছেন। সারা মুখে এই নরকযন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই। অপরেশ আলমারি থেকে নীল ধনেখালিটা বের করলেন। শাড়িটা নির্মলার খুব প্রিয়, প্রায় বুকে আগলে রাখতেন। তারা যখন দুই বাড়ির অমতে বিয়ে করেন, অপরেশ তখনও বেকার। চাকরির প্রথমমাসের মাইনে থেকে এই শাড়িটা কেনা।– দাম যত সামান্যই হোক না কেন, মূল্য অনেক।

সে এক সময় ছিল বটে! আজ যেটুকু আছে, প্রায় শূন্য থেকে তা তিল-তিল করে গড়ে তুলেছেন দু'জনে মিলে। তবে সন্তান 'বিপথে' যাওয়ায় পিতা ঈশ্বর শ্রী হরিচরণ বসু খুব দুঃখ পেয়েছিলেন সেসময়। দীর্ঘদিন মুখদর্শন করেননি। হঠাৎ বুক কেঁপে ওঠে অপরেশের।— পুত্রশোকের ধারা যেন এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে বয়ে চলেছে!

শাড়িটা গায়ে চাদরের মতো বিছিয়ে দেওয়ার সময় নির্মলা ঘুমের মধ্যেই কথা বলছিলেন, 'ঠাকুর এনেছ? যাত্রা করবে না? বাবু এসেছে? কাঁচা হলুদ? ইঁদুরে-মাটি?'

অপরেশ অবাক হয়ে যান, অ্যাকিউট সিজোফ্রিনিয়ার রুগি এত কিছু মনে রাখে কী ভাবে? পারিবারিক প্রথায় লক্ষ্মীপুজোর দিন ওদের গণেশ-নবপত্রিকা পুজো হত। দশমীর সন্ধ্যায় কুলোর ওপর সেই মূর্তি সাজিয়ে সামনে রাখা হত কাঁচা হলুদ, সিঁদুরের কৌটায় টাকা। বাড়ির ছেলেরা একে-একে ওই হলুদ, টাকায় হাত ছুঁইয়ে রওনা দিত বিসর্জনের ঘাটের দিকে।— এই হল 'যাত্রা'। ঘাট থেকে ফেরার পর আশীর্বাদি ধানদুব্বোর থালা।

বাবুর সেবার বারো বছর বয়স। অপরেশের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরনোর মুখে ওর হঠাৎ মনে পড়ছিল, খেলনা পিস্তলটা সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছে। একছুটে ঘরে ঢুকতেই নির্মলার বকুনি, 'বাঁদর ছেলে, তোকে না বলেছি, যাত্রার সময় পিছনে ফিরতে নেই, অকল্যাণ হয়!'

সত্যিই সেদিন ঘাটের সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে ওর কপাল কেটে যায়। কিছুদিন আগে ব্যাঙ্কের পাশবই খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া ওর কলেজের আইডেন্টিটি কার্ড। তখন সদ্য দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে।– 'অরিন্দম বসু। বি.এস.সি. থার্ড-ইয়ার। আইডেন্টিফিকেশন-মার্ক: কাট মার্ক অ্যাট রাইট সাইড অফ ফোরহেড।'

কফিনে শোয়া শতচ্ছিন্ন শরীরেও সে চিহ্ন চেনা যাচ্ছিল।

'ওহে চঞ্চল হে, বেলা না যেতে খেলা কেন তবে যায় ঘুচে?'– ধীর লয়ে গানটা বাজছে। স্মৃতি বড়ো বিপর্যস্ত। খেয়াল ছিল না– আলমারির পাল্লাদুটো ঠিকমতো বন্ধ হয়নি। শাড়িটা নেওয়ার সময় বড্ড অগোছালো হয়ে গিয়েছে।

পরক্ষণে আবার মনে হয়, 'গোছানোর মতো কী-ই বা আছে আর?'

সবচেয়ে ওপরের তাকে গরদের পাঞ্জাবিটা প্যাকেট-বদ্ধ আজ বারো বছর হল। বারো বছর! তার আগের দু-বছর বাবু পুজোয় আসতে পারেনি। সেবার সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিই ওর ফেরার কথা। নিউ-ইয়র্ক থেকে দোহা হয়ে কলকাতা। নির্মলার কেনাকাটা যেন থামছিলই না। অষ্টমীর সকালে বাবুর এই পাঞ্জাবিটা পরার কথা ছিল। কিন্তু, ওর প্লেনে ওঠার মাত্র চারদিন আগে হঠাৎ ওদের দুজনের জীবন যেন থমকে গিয়েছিল এক ধাক্কায়।

দিনটা মঙ্গলবার, সবকটি নিউজ চ্যানেলের পর্দায় সেদিন দুটো আকাশ ছোঁয়া বাড়িতে বিমান আছড়ে পড়ার দৃশ্য। কালো ধোঁয়া, ধুলো, আর্তনাদ, চিৎকার। দেখতে-দেখতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল সব কিছু। অপরেশের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন ঠাণ্ডা স্রোত বইছিল। অফিসের সামনে তোলা বাবুর ছবিতে এই বাড়ি দুটোই ছিল না? মনটা প্রমাদ গনছিল। কিছুতেই ওকে ধরা যায়নি, ওদের কলকাতার অফিসে বারবার ফোন করেও কিছু জানা যাচ্ছিল না।

অবশেষে ওদের জীবনের চরমতম উৎকণ্ঠাময় তিনটে দিন পর, সমস্ত প্রার্থনা বিফল করে দুঃসংবাদটা যখন আসে, আবাসনের একচিলতে মাঠে সেদিনও বাচ্চারা খেলতে নেমেছিল। পল্লব-অ্যাপার্টমেন্টের দুই বাসিন্দা সেদিনও গাড়ি রাখা নিয়ে ঝগড়া করেছিল। সাফাইওয়ালা এসেছিল, উলটোদিকের ব্যালকনিতে ঝোলানো ছিল জামাকাপড়— সবকিছুই নিয়মমাফিক। থেমে গিয়েছিলেন ওঁরা দুজন।

সেদিন থেকে এই নিজেই নিজের শবদেহ বয়ে বেড়ানোর অভিশপ্ত সময়-যাপন। নির্মলার শেষের সেই শুরু। এক ধাক্কায় সর্বস্ব খোয়ানো মাতৃহৃদয় এখন ধীরগতিতে ধুকপুক করছে। ঠিক যেন তেল ফুরিয়ে আসা প্রদীপ। পুড়ছে, অথচ আলো নেই, যখন-তখন নিভে যাবে, চিরতরে।

মাইকে লাগাতার ঘোষণা,— 'বেলঘরিয়ার আশ্চর্য! এবারের থিম সবুজায়ন। যানবাহনের বাতিল যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরী অভিনব, অকল্পনীয় মণ্ডপ। টেরাকোটার প্রতিমা। আসুন, দেখুন। নিজে দেখুন ও অপরকে দেখার সুযোগ করে দিন। ... আগত দর্শকমণ্ডলীকে অনুরোধ করা হচ্ছে, দয়া করে মণ্ডপ-সংলগ্ন আলোকসজ্জায় হাত দেবেন না, দুর্ঘটনা হতে পারে।'

আর যে সহ্য হয় না! অপরেশ আপনমনে হেসে ওঠেন। পারেও বটে, সারা বছর চিৎকার চেঁচামেচি, ভিড়, ঠেলাঠেলি করেও ক্লান্তি নেই? আজ কয়েক টন জঞ্জালে রং লাগিয়ে তোমরা ফুর্তি করছো। একাদশীর সকালে তো ফের যে-জঞ্জাল সে-জঞ্জাল। সবুজায়ন?

সবুজ পৃথিবীর রং, গতির রং। সবুজ ঈর্ষারও রং। বছরের বাকি দিনগুলো কোনোমতে কাটলেও পুজোর দিনগুলো কাটতে চায় না। জানেন কেউ ফোন করবে না, তবু মাঝেমাঝে বোবা টেলিফোন দৃষ্টি ছুঁয়ে যায়। রিসিভার কানে দিয়ে দেখেন রিংটোন আছে কিনা।

পাড়ার ছেলেরা মণ্ডপে আড্ডা দিচ্ছে। কারো-কারো পাশে তাদের নববিবাহিতা বৌয়েরা। আহা, যেন লক্ষ্মী-জনার্দন! একজনের কোলে একরত্তি মেয়েটি। বোধ হয় এখনও দাঁত ওঠে নি, গানের তালে হাততালি দিচ্ছে। অপরেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন,– কতকাল হয়ে গেল, এ বাড়িতে শিশুর হাসি-।

একঘেঁয়ে।– হ্যাঁ, প্রচণ্ড একঘেঁয়ে তাদের জীবনের কথা। গল্প নেই কোনো। নেই রূপ-রস-ছন্দ। ঠিকে ঝি আর রাতবিরেতে ডাক্তার ছাড়া বহুদিন কেউ আসে নি এই ঘরে। বাবুর শ্রাদ্ধ-শান্তির শেষে আত্মীয়স্বজনেরা একে-একে সবাই বিদায় নিয়েছিল দু-তিনদিনের মধ্যেই। প্রথম কিছুদিন তাদের ফোন-টোন আসত। তারপর ধীরে ধীরে সহানুভূতির শরীর সময়ের পলি-তে ঢাকা পড়ে যায়। অপরেশ ভাবেন, ভালোই হয়েছে, 'কেমন আছ?'-র উত্তরে দুই সন্তানহারা কাঁহাতক আর 'ভালো' বলতে পারে?

বাবুর স্কুলের বন্ধু সুজয়। মাঝেমাঝে আসত ছেলেটি। কিন্তু তারও বদলির চাকরি। আরও একজন আসত।– শুভমিতা। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়েটির মুখটা ছেলেমানুষের মতো, মায়া-মাখানো। নির্মলার হাঁটাচলা তখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। বাবুর পর এ বাড়ির টেলিফোন মাসের মধ্যে আঠাশদিনই নীরব থাকে। একদিন দুপুরে প্রায় নিয়ম ভেঙেই ফোনটা বেজে ওঠে। কী এক স্বল্প-সঞ্চয় কোম্পানির হয়ে ফোন করেছিল মেয়েটি।

সবকিছু ফুরানোর পর নতুন কোনো সঞ্চয়ের প্রসঙ্গ ওদের কাছে হাস্যকর। মেয়েটির অত কিছু তো জানার কথা নয়। সে যখন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য বারবার অনুরোধ করছিল, অপরেশ 'না' বলতে পারেননি।

দীর্ঘ তিনবছর পর সেদিন ওদের ঘরে অতিথি আসবে। নির্মলা বললেন, 'শোনো না, মেয়েটার জন্য কিছু খাবারদাবার আনবে না? অত দূর থেকে-।'

– কেন মায়া বাড়াচ্ছ নিলু?

– সে জানি না। এই দুপুর-রোদে তেতে পুড়ে একটা মেয়ে আসবে, তাকে শুধু মুখে বিদেয় করতে পারব না।

– এ কি তোমার আপনজন?

'মায়ের মন, এ তুমি-!' নির্মলা থেমে গিয়েছিলেন মাঝপথে। অপরেশও আর কিছু বলেননি।

সেদিন লিফ্‌ট খারাপ। অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলা আর চারতলা চায় তাড়াতাড়ি মেরামত। আর দোতলা-একতলার বক্তব্য,– যে জিনিস তাদের ব্যবহারে লাগে না, তার মেরামতির ভার তারা কেন নেবে? নারদে-নারদে এই টানাপোড়েনে সিঁড়ি ভেঙে চারতলা উঠতে অপরেশের দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম।

নির্মলা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিলেন। অপরেশের হাত থেকে খাবারের প্যাকেটগুলো নিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। অপরেশ মুখোমুখি বসতেই মেয়েটি বলল, 'আসলে আমি বুঝতে পারিনি, নইলে-।'

– সে ঠিক আছে, তুমি কী করে জানবে মা।

– এভাবে ডিস্টার্ব করলাম আপনাদের, খুব লজ্জা লাগছে।

– তুমি আসায় আমাদেরও ভালো লাগছে। কে-ই বা আসে এখানে? সারাদিন দুই বুড়োবুড়ি।

অপরেশের সই করা চেকটি হাতে নেওয়ার সময় মেয়েটির মুখে অপরাধী-অপরাধী ভাব। কারণ বুঝে অপরেশব লেছিলেন, 'যদি সময় পাও, মাঝেমাঝে দেখা করে যেও। ভালো লাগবে।'

নির্মলা কিছুটা অবুঝের মতো শুভমিতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন। মেয়েটি মাঝেমাঝে আসত ওদের কাছে। কিছুক্ষণ বেঁচে উঠতেন দুজন। নির্মলা একবার বলেও ফেলেছিলেন, 'বাবু থাকলে, ওর সঙ্গে-।'

শুভমিতা যে কোম্পানিতে কাজ করত, হঠাৎ সেখানে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়। আর্থিক বেনিয়মের দায়ে তার মালিক গ্রেফতার হল। খবরটা নিয়ে সারা দেশ তোলপাড়,– সরকার পড়ে-পড়ে দশা! সে সময় মেয়েটি খুব আতঙ্কে থাকত। প্রায়ই বলত, 'খুব ভয় করছে জেঠু, এত মানুষের টাকা! ক্লায়েন্টরা ফোনে হুমকি দেয়। টাকা ফেরত চায়, কয়েকজন তো বাড়ি অবধি চলে এসেছিল। কী যে হবে? আপনার টাকাটাও-!'

পুজোর ওখান থেকে অষ্টমীর প্রসাদ দিয়ে গেছে। ডাইনিং টেবিলের একপাশে শালপাতা ঢাকা মাটির ভাঁড়। চারপাশে পিঁপড়ের সারি, এই রাত্রিবেলাও দুটো মাছি ভনভন করছে। একটা টক-টক দুর্গন্ধ। কে খাবে? নির্মলার মুখে দেওয়ার প্রশ্ন নেই। নিজের কথা ভাবলে ওর হাসি পায়। প্রতিদিন সকালে বাথরুমে দেখতে হয়, ক্যাপসুলের আবরণটুকুও হজম হয়নি,– পাচকশক্তির এমনই দুর্দশা!

'বাবু এলি?' চিন্তাসূত্র ভাঙে। ঘুমন্ত নির্মলার শিয়রে বসে ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। পুজোমণ্ডপে তখন 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর হাসি আর গানে ভরে তুলব-।' ... বন্ধ জানালাটাকে আর একবার সর্বশক্তিতে বন্ধ করে অপরেশ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রইলেন।

ইনভেস্টমেন্টের টাকা নিয়ে অপরেশের দুশ্চিন্তা ছিল না। সে তো মেয়েটিকে কিছুটা বেঁধে রাখার জন্য।– 'যা গেছে, যাক। সাগরে পেতেছি শয্যা শিশিরে কী ভয়?' কিন্তু, চাকরি-বাকরি করলেও শুভমিতা মেয়েটি খুব নরম ধাঁচের। এত মানসিক চাপ!– তিনি প্রমাদ গনেছিলেন।

খবরটা এসেছিল প্রথম পাতায়। 'আমানতকারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত মহিলা এজেন্টের আত্মহত্যা।'

মণ্ডপের চূড়াটা একদিকে হেলে পড়েছে। রাস্তায় ছত্রভঙ্গ ভিড়ের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি। আবার বৃষ্টি! অপরেশ অবুঝের মতো খেঁকিয়ে উঠলেন, 'বেশ হয়েছে! কর, আরও ফুর্তি কর। তাজা তাজা প্রাণগুলো একে-একে চলে যাবে, আর তোরা আনন্দ করবি? ধর্মে সইবে না।'

তলপেটের অসহ্য যন্ত্রণাটা চেগে উঠছে। ওফ্, শরীরের ভিতরে কে যেন

করাত টানে! নির্মলাকে বলা না-বলা সমার্থক। অন্য কেউ নেই শোনার মতো। মাঝেমধ্যে ভাবলে শান্তি পান– মুক্তির দিন এগিয়ে আসছে। তবে ব্যথা যত হয়, ভয় হয় আরও বেশি। তিনি আগে চলে গেলে নির্মলার কী হবে?

পাশের ঘরে মাসকাবারি হিসেবের খাতাটা হাতে নিলেন। না, মুদি, কাগজ, কাজের লোক, ইলেক্ট্রিক বিল, ওষুধের দোকান— কারো কিছু পাওনা নেই।

ইন্সপেক্টর সুজয় রায় এখানে বদলি হয়েছে মাত্র তিনদিন হল। চাকরিতে ঢোকার পর এই প্রথম নিজের পাড়ায় পোস্টিং। দশমীর বিকেল। আজ সারাদিন ডিউটিতে খুব চাপ গিয়েছে। সন্ধেবেলায় আবার ডিউটি, বিসর্জনের ঘাটে। ক্লান্তিতে একটু ঝিমুনি-মতো এসেছিল। সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠতেই তন্দ্রা কেটে যায়। অন্যপ্রান্তে একজন বয়স্ক মানুষ।– 'হ্যালো, এটা কি বেলঘরিয়া থানা?

– হ্যাঁ। কী ব্যাপার বলুন।

– আমার নাম অপরেশ রায়। আনন্দবিহার আবাসন থেকে বলছি।

সুজয় সোজা হয়ে বসে, 'কাকু চিনতে পারছেন? আমি সুজয়, অরিন্দমের বন্ধু।'

– ওহ্ সুজয়, কেমন আছ বাবা?

– চলছে। এই তিনদিন হল এখানে জয়েন করেছি। ভাবছিলাম আপনার ওখানে একবার যাব। সে থাক, কী হয়েছে বলুন। কোনো চুরি-টুরি?

– আমি সারেন্ডার করার জন্য ফোন করেছি। তোমরা একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারবে?

– সারেন্ডার! কেন?

অন্যপ্রান্তে দীর্ঘশ্বাস।

– কিছুক্ষণ আগে তোমার কাকিমাকে খুন করেছি। চিন্তা কোরো না, ওর শরীরে শক্তি কিছু ছিল না। বেশি কষ্ট পায়নি।

– কী বলছেন আপনি! ঠিক করে বলুন তো কী হয়েছে?

– ঠিক-ই বলছি। খুন আমিই করেছি। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায়। তোমরা যাকে বলো, কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডার।

সুজয় স্তম্ভিত! চাকরি জীবনে বহু খুন-জখম সে দেখেছে। কিন্তু, অপরেশকাকুর মতো মানুষ-?

কোনোমতে বলে, 'কেন?'

অপরেশ যেন বরফের মতো শান্ত। ধীর-স্থির গলা।– 'উপায় ছিল না। আমার প্রস্টেট-ক্যানসার, যখন-তখন চলে যাব। তারপর ওর কী হবে? কে দেখবে? হয় চিল-শকুনে ছিঁড়ে খাবে, না হয় বিছানায় পচবে। ... তাই। আজ ওকে মুক্তি দিলাম। এখন তোমরা আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো। তাড়াতাড়ি এসো বাবা, ও পাশের ঘরে একা।'

*****

'সাপ্তাহিক বর্তমান', ২০১৬

লক্ষ্মীপ্যাঁচার বিশ্বকাপ

একে চোত্‌মাস, তায় কলিকাল। সত্যযুগের শক্তিশেল হয়েছে চৈত্রসেল। রুমালকে বেডশীটের নামে বেচার জন্য রাস্তায়-রাস্তায় ফেস্টুন পড়েছে। পোস্টারে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েমানুষের চিত্র ছেপেছে। তাতে দশ বিশ ত্রিশ শতকরার জটিল জটিল আঁক কষে বলছে– অমুক দোকানে জলের দরে ফুটো পাতলুন আর ঠুঁটো সালোয়ার পাওয়া যাচ্ছে। তাই দেখে বাস, অটো, ট্যাক্সি, রিক্সা, ডুবোজাহাজ সবাই ছুটছে হাতিবাগান।

জিনস্-পরা আধুনিক কবি এসেছে– বগলে শাঁসালো পাঠিকা, কেতাব ট্যাঁকে তোতলা মাস্টার এসেছে– হাতে চার মাসের টিউশানির অগ্রিম। অফিসফেরৎ ঘুষখোর, মাঠফেরৎ লাথিখোর, আড্ডাফেরৎ গাঁজাখোর, জেলফেরৎ গুলিখোর, জিমফেরৎ ডায়েটখোর, পার্কফেরৎ বাতাসখোর, সবাই যেন হ্যামেলিনের বাঁশি শুনে টলতে-টলতে, ডলতে-ডলতে, লেংচে-লেংচে, হুড়মুড়িয়ে ছুটছে। ডাকসাইটে স্ত্রৈণ ট্যাক্সিওয়ালাকে হাঁকড়াচ্ছে। হিস্ হচ্চে না বলে মা বাচ্চাকে দাবড়াচ্ছে।– দেরি হলেই সব রসাতলে যাবে। স্টক সীমিত।

দিনটা একত্রিশে মার্চ, দুহাজার এগারো। আমি ও রসে বঞ্চিত। ফস্ করে কথাটা বললুম বটে, রস থাকলেও কষ থাকত কি না,– তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। ম্যাট্রিকে ফাস্-ক্লাস পেয়েছিলুম, কলেজে সেকেন্ড-ক্লাস। আর নাবলে মান যাবে দেখে লেখাপড়া শিকেয় তুলে বেচুরাম হয়েছি। লোকে যাকে বলে 'সেলস্ একজিকিউটিভ'। আট ঘাট ঘুরে দশ মাস আগে একখানা ইনসুরেন্স কোম্পানিতে ঢুকেছিলুম। চাকরির গোড়ায় ট্রেনিং হয়েছিল, সেথায় বাবুরা বোঝালেন, 'সেলস্ একজিকিউটিভ হইল লক্ষ্মীর বরপুত্তুর'। শুনে মনে হল বিশ্বজয় করেছি। এখন সেই চাকরি রক্ষের দুশ্চিন্তায় রাত-বিরেতেও জেগে থাকি। ঢুলুনি এলেই মনে হয়– ওরে বাপ্, ঘুমুলেই ফুরুৎ করে সকাল হবে, আর তার মানেই আবার সেই অফিস।– সে যে দুঃসপ্নের বাড়া! নিজের এই প্যাঁচা-চরিত্তিরের মাথায় লক্ষ্মীপুত্তুরের লক্ষ্মী জুড়েছি; নতুন নাম নিয়েছি– লক্ষ্মীপ্যাঁচা।

মাসকতক আগে অফিস একখানা মেডেল দিয়েছিল।– ঢিংকাচিকা! ক'দিন বুক ফুলিয়ে ঘুরেছি-ফিরেছি। ম্যানেজারের মুখের সামনে দিয়ে মোট তিনদিন ছুটির তিনমিনিট আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছি। কেদারায় রাজার মতো ঠ্যাং তুলে বসেছি অবধি!

কিন্তু, এখন সেই ম্যানেজার পারলে আমার ম্যারো চুষে খায়। আসলে, দুদিন যেতে না যেতেই সেই মেডেলের রং গ্যাছে চটে। হতচ্ছাড়া, অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে কাঁসা বুলিয়ে বানিয়েছিল মাইরি! গলার রিবনখানাও আসলে পাঁচটাকা গজের চুলের ফিতে।– সুতো খুলে আসে! তাই এখন প্রত্যেক দিন বোঁচকা কাঁধে গোটা কোলকাতা শহরের তিনচক্কর মেরে দিনের শেষে নেতিয়ে অফিসে ঢুকি। পিঠ বাঁকিয়ে মাথা লুকিয়ে কেদারায় বসি। যতক্ষণ থাকি, তটস্থ থাকি। ম্যানেজারব্যাটা বাগে পেলেই আগে কী-সব হাবিজাবি হিসেব কষে দেখায়– ওই পাঁচসিকে বেতন জোগাতে কোম্পানির নাকি গণেশ ওলটানোর জোগাড়! দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'হালায় আবাগীর পুত, টার্গেট কি তোমার বাপ-ঠাকুদ্দায় মিট করবো?'

কিন্তু কপালই এমন, সারা মাস যে ম্যানেজার কথায়-কথায় গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করে ছাড়ে, মাসের শেষে তার হুকুমেই ডিস্কো নাচতে ছুটি। সাত গেলাস মদ গিলে, দশবার ওয়াক্ তুলে, কোমরের খিল খুলে ধেঁই-ধপাধপ নাচতে থাকি। আমোদ করতে নয়, সার্কাসের ভল্লুক বা মাদারির উল্লুক কি আর নিজের মর্জিতে নাচে? সব ওই মনিবকে খুশি করতে। তবু যদি মনিবের স্বভাব-চরিত্র ঠিক থাকত!– 'এই মাসে কট্টুক ব্যবসা করছোস্? হালায়, মোট্টে এক লাখ! যা, তর পরের মাসের টার্গেট ত'ইলে দশ কোটি।'

জ্ঞানীগুণিরা বলেন, এই ঝকমারির নাম 'টিম-বিল্ডিং'। টার্গেট আর টার্গেট, বাকি হগলডাই ফরগেট!– অবস্থা দেখেছেন, চাকরির চক্করে মুখের ভাষা অবধি গুলিয়ে যায়! দুর্বিষহ জীবন,– কথায়-কথায় শুধু ওই পাঞ্চই তো জোটে, পাঞ্চলাইন ফোটে না।

অফিসের একচিলতে ডেস্কে লক্ষ্মী-গণেশের জোড়ামূর্তি তো ছিলই, ক'মাস আগে ফেংশুইয়ের তিনপেয়ে ব্যাং বসিয়েছি। বাস্তুদোষ কাটাতে পজিশনটা তেরচা করার অ্যাপ্লিকেশন জমা করেছিলুম হেড-অফিসে, উত্তর দেয়নি।– ভালো কথায় কান দেবে কেন, ব্যাটাদের আসলে লক্ষ্মীপুজোয় মন নেই। এদিকে প্যাঁচারাই যেন নন্দ ঘোষ!

গত দশদিনে লক্ষবার 'ত্রাহি মধুসূদন' ডেকেও একটাও খদ্দের পটেনি। চেনা-পরিচিতের সাহায্য আত্মীয়স্বজন আমায় দেখলেই কানে বিল্বপত্র গুঁজে গঙ্গাস্নানে দৌড়ায়। বন্ধুবান্ধবও তথৈবচ। যারা বাকি সময় চায়ের দোকানের ওমলেটে 'ঘ্রাণেনঃ অর্ধ ভোজনং' আর সুন্দরীমাত্রে 'দর্শণেনঃ অর্ধ রমণং'য়ে (ব্যাকরণ জানিনে) মত্ত থাকে, তারাও এমন দৃষ্টিতে চায় যেন ধুতির কোঁচায় কালীপটকা বাঁধব!

শান্তিতে একটু দুঃখ পাওয়ারও যো নেই। মাসতিনেক আগে সেদিন বাড়ি ঢুকতেই দেখি মায়ের মুখ গোমড়া। রান্নার মাসি ভেগেছে। শতকষ্টের মধ্যেও মনে হল, বাঁচা গ্যাছে, অমন সাম্যবাদী রাঁধুনি পোষায় না বাপু! আলুপোস্ত থেকে মালাইকারি, লিকার চা থেকে সর্ষে-ইলিশ, সবকিছুর একই স্বাদ, পানসে। রোজ মায়ের সঙ্গে খিটিরখিটির। মাংস সেদ্দ না কাঁচা বোঝা দায়? মুগডাল

লোহিতসাগরের চেয়েও নোনতা? লাউঘন্টে দেড়হাতি চুল? রুটিতে শ্যামাপোকার কাবাব?– ভুলেও কিছু বলতে যাও, হাবেভাবে বুঝিয়ে দেবে– উউউ, সোনার আংটি আবার বাঁকা!

মা বেতো রুগি, বাবা হেঁপো। দুজনেরই চলতে-ফিরতে বাবারে-মারে দশা। তাই যত ওঁচা-ই হোক না কেন, রান্নার লোক পালানো মানেই হাতে হ্যারিকেন।– আর চাকরির সুবাদে বাঁশটি আমার যথাস্থানে প্রথিত তো আছেই!

সন্ধে নেমেছে বেশ কিছুক্ষণ হল। ফলত, বাবার মুখে হাসপাতালি মুখোশ, সঙ্গতে নেবুলাইজার যন্ত্রের আশাবরী ঠাট। মা হাঁটুতে হটব্যাগ চাপিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে বলল, 'কুশলদের রান্নার মেয়েটার শুনেছি স্লট্ ফাঁকা আছে। তোর বাবা গেছিল একটু আগে। মেয়েটা তখনও আসেনি। এখন একবার যা তো।'

ধুত্তোর, সারাদিন পর একটু চুপ করে বসার যদি যো থাকে! সবে তখন জুতোটা খুলেছি। কিন্তু, না নড়লেই আবার দুধকলা, কালসাপ, দুষ্ট গরু, শূন্য গোয়াল, ইত্যাদি গীতিনাটকের বান ভাসবে। তাই মোজা-পরা পায়েই হাওয়াই চটি গলিয়ে রওনা দিলুম।

কুশলদা ছিল না। তনুবৌদি দরজা খুলল,– 'আরে এসো এসো।'

খেয়াল হল, গলার টাইটাও খোলা হয়নি।– আজই সেটা আবার ঘুঘনির ঝোল চেখেছে! এই রাজবেশ দেখে না জানি কী ভাবছে!

এদিকে, সোফায় বসতে না বসতেই– 'চা খাবে?'

ভদ্রতা রাখতে বলি, 'না বৌদি, এইমাত্র খেয়ে এসেছি।'

– তাহলে কফি করি-?

মুখটা 'না' বলার মতো করতেই অদ্ভুত সুরে ধমকে দিল বৌদি, 'এত কিন্তু-কিন্তু করো কেন! আমাদের আপন ভাবতে পারো না, তাই না?'

নারী বিষয়ে আমি চিরকালই একটু তুলতুলে। ওই সিনেমার নায়কদের মতো,– দশ-বিশটা ভিলেনকে পাইকারি ধোবি-পাছাড় দিলেও নায়িকার মুখঝামটায় বুক ফেটে চৌচির হয়। বৌদির বকুনিতে বুকের আগুনে হাঁপরের ফুঁ পড়ে। কার্তেশিয় দর্শন বলেছে, চিন্তাশক্তির দলভাগ হয়ে জন্ম নেয় সংশয়, দ্বিধা আর হতাশা। আর ততক্ষণে মাথার মধ্যে দুটো উটকো লোক যেন রামতর্ক জুড়েছে–

– বৌদি, তুমি কত্ত ভালো!

– হ্যাংলা শালা, এক কাপ কফি খাওয়াতেই-!

– আগেরদিন কাজু-কুকিজ দিয়েছিল। চকোলেট পেস্ট্রিও।

– ওরে ছোটোলোক, এ অন্যের বউ।

প্রথমজন সুফি কবিতার লাইন আওড়ায়, 'ঠিক-ভুলের জগতের বাইরে আর একটা জগৎ আছে।'

– শুয়োর কোথাকার! তুই মর।...

তখুনি তনুবৌদি কফি হাতে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে আর একজন মেয়ে,– হাতে তেলেভাজার থালা। এই কি সেই রান্নার লোক? কিন্তু ম্যানিকিয়োর্ড হাত,

ন্যাচারাল নেলপালিশ, প্লাকড্ ভুরু, মিক্কি গজদাঁত, সিক্কি ব্রুনেট থেকে শুরু করে জিওমেট্রিক দুল বা ডলফিন পেনডেন্ট্... রাঁধুনির এহেন বাঁধুনি! আরে, মুখের ধাঁচটাও অনেকটা যেন তনুবৌদির মতোই। তবে কি...

– আলাপ করিয়ে দিই। আমার বোন নয়না,– মানে সুনয়না। তোমরা কথা বলো। আমার আবার রান্নার দিদি এসেছে। না দেখলেই এমন রাঁধবে যে, খাবার মুখে দেওয়া যাবে না।

আহা, সুতনুকার বোন সুনয়না হতেই হবে! একবার মানসচক্ষু দিয়ে একটু আগের দুই ঝগরুটেকে দেখে নিই,– তখন তারা যে-যার মাথা চুলকোচ্ছে।

– আপনার বুকপকেটে ওটা কালকের ম্যাচের টিকিট, তাই না?

আরিব্বাস, নয়নার নজর আছে বলতে হবে!– 'হ্যাঁ।'

–তার মানে আপনি মোহনবাগান। কাল তো প্রয়াগ ইউনাইটেডের সঙ্গে। জিতিয়ে আসতে হবে কিন্তু।

জয় মা, মুখ তুলে চেয়েছ মা! একে সুনয়না, তার ওপরে ফুটবলও দ্যাখে মা! এখন আমায় কে দ্যাখে? আহা রে, অফিস থেকে ফিরে জামা-টামা বদলানো হয়নি। ইশ্, মোজার গোড়ালিটাও ফেঁসে গিয়েছে! ধুত্তোর, আগে জানলে চুলে একটু চিরুনি বুলিয়ে আসতুম।

ঠিক তক্ষুণি তার চোখ গেল কলারের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা আমার আইডেন্টিটি কার্ডের ফিতেটার দিকে। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ছবির মতো আঙুল তুলে ভ্রূভঙ্গী করলে– 'আপনি এখানে চাকরি করেন?'

– হ্যাঁ, কেন?

– পচা কোম্পানি। কয়েক বছর আগে আপনাদের একজন গুচ্ছের ঢপ দিয়ে কি একটা পেনশান পলিসি গছিয়েছিল। বাবা তো হামেশাই আফশোস করে। টাকা-পয়সা ডুবে যাচ্ছেতাই অবস্থা।

মাথার মধ্যের লোকদুটো খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসছে,– পলিসির লেঙ্গি খাওয়া বুড়ো আর যাই হোক, ইনসুরেন্সের ফিরিওয়ালাকে জামাই করে না!

নিজেরই ইতিহাস ভূগোল বায়োলজি অ্যাস্ট্রোলজির বিরুদ্ধে নিজেই তখন একা কুম্ভ। মরিয়া হয়ে অফিসে শেখানো বুলি উগড়ে দিলুম, 'মার্কেটের ওঠা-নামা তো লেগেই থাকে। ইনভেস্টমেন্ট বিষয়টা হল বিয়ের মতো– শুধু ভালো সময়ে নয়, খারাপ সময়েও পাশে থাকতে হয়। তাহলে রিটার্ন...।'

কী বুঝল কে জানে, ফিক করে হেসে দিল মাইরি! এদিকে তখন যেন জ্ঞানের শেষবিন্দু অবধি লড়াই করার পণ করেছি, 'পেনশান পলিসিতে চটজলদি লাভ খুঁজতে নেই। ওতে ভ্যানিলা স্ট্র্যাটেজি খাটাতে হয়।'

– ভ্যানিলা! মানে আইসক্রিমের ফ্লেভার?!

– না না, তা কেন হবে! মানে ফাটকা না খেলে যে সব কোম্পানি দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ডিভিডেন্ট দিচ্ছে-।

মুখের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই সুনয়না আর একবার হেসে দিল।–

এবার কিছুটা জোরেই। বোমকে গেছিলুম। কী-বলি, কী-না-বলি দিশা না পেয়ে মোচার চপে মন দিলুম,– ঠাণ্ডা। কফি,– সেখানেও হিমের পরশ। দুচ্ছাই!

দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এল তনু বৌদি। মুচকি হেসে থুতনিটা আলতো নেড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি একটা আতা।'

অপমানিত হওয়া উচিত? যদিও ভান করিনি, তবে গেলবছর ভাসানের পর সঞ্জয় যে বলেছিল– ভালো মেয়েরা নাকি একটু ক্যাবলা ছেলেদেরই পছন্দ করে? কে জানে!

বাড়ি ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, কথা হয়েছে?'

– হ্যাঁ।

– কী বলল? কবে থেকে আসবে?

– কে আসবে!

– কেন, রান্নার লোক!

– তা তো জানি না।

– তাহলে এতক্ষণ তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলিস?

যাচ্চলে, একদম ভুলে গেছিলুম! আমার চোখ-মুখ দেখে মা কী যেন একটা ভাবল।– 'কুশলের শালী এসেছে শুনলাম। করিৎকর্মা মেয়ে। কোন এক বখাটে ছোঁড়ার সঙ্গে নাকি দিল্লি পালানোর মতলব করেছিল। ছোঁড়াটার শেষ অবধি সাহস হয়নি, এদিকে তিনি নাকি ট্রেনে চড়ে বসেছিলেন। তাকে দেখতে-টেখতে পেলি নাকি? খুব সাবধান বাবু।'

বাপ্‌রে, হাঁটুর ব্যথায় সামন্য দোতলায় উঠতে পারে না, এত খবর পায় কোত্থেকে কে জানে! কিন্তু, কথাটা যদি সত্যি হয়?– জাজমেন্টাল হব কিনা ভাবতে-ভাবতেই কেমন যেন সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছিলুম। দুচ্ছাই, এরচে' একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ল্যাট্রিনে ধ্যানস্থ হওয়া ভালো।

দু'দিন পরের কথা। অটোয় চড়ে সেলস্-কলে বেরিয়েচি। কাঁধে সেই বোঁচকা। সেখানে কয়েক দিস্তে ইনসুরেন্স পলিসির ফর্ম, কেরানির কোটিপতি হওয়ার ফরমুলা নেকা চাট্টি ছোপানে কাগজ আর একখানা ইংরেজি পুঁথি– 'ইউ ক্যান উইন'। এদিকে আগের দিন মোহনবাগান হেরেছে বলে মেজাজটা পুরো ইসবগুল হয়ে আছে। মনের কষ্টে মনেমনে মনজিনিসের পেস্ট্রি মাখিয়ে নীল জামা গায়' দিয়েছি। নীল আমার পয়া রং। অন্য কোনো রঙে খদ্দের পটে না কিনা, তাই গাঢ় ফিকে ডোরাকাটা পেটকাটি চাঁদিয়াল– হরেক কিসিমের নীল জামা খরিদ করে রেখেছি। রোজ সকালে তাদেরই এক-একখানায় সেঁধিয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে ইষ্টনাম জপতে জপতে অফিস যাই। তাও রোজদিন খদ্দের জোটে না। ওই কাস্টমারগুলো আমাকে এত যে কষ্ট দেয়, ওদের শরীরে কি এট্টু মায়া-দয়া থাকতে নেই গা?

নিজেই নিজের খদ্দের হব, তারও উপায় নেই। টার্গেটের চাপে এরই

মধ্যে নিজের নামে পাঁচটি ও জন্মদাতার নামে তিনটি পলিসি করতে হয়েছে। আটআনা বেতন ওতেই যায়। এরপর আরও একখানার চাপালে পলিসি-ভাজার সঙ্গে পলিসি-সেদ্দ মেখে খেতে হবে। বেগতিকে সেদিন মায়ের বালাজোড়া নাচাতে নাচাতে বললুম, 'সোনাদানা রেখে কী হবে মা, আমাদের কোম্পানির পলিসি করাও, পাঁচ বছরেই টাকা ডাবল।'

শুনেই এমন ধমক কষালে, চাকরির চা অবধি চলকে গেল!– 'ওগুলো তোর বউয়ের জন্যে রেখেছি। ভুলেও ছুঁবি না।'

মনে মনে ভাবলুম,– ওই আনন্দেই থাকো। জীবনে কোনোদিন বউ ছুঁতে পারি কিনা তারই ঠিক নেই, তো বউয়ের বালা!'

যাই হোক, আজ যদি অন্তত একটা খদ্দেরও না পটে, বুঝতে পারছি, বিদেয়বাঁশি বাজবে। তখন আবার সেই 'হ্যান করেছি ত্যান করেছি বাঘ মেরেছি' লেখা ঠিকুজি-কুলুজি ছাপিয়ে দোরে দোরে অর্ধচন্দ্র গেলা। দু'চ্ছাই, এখন একটা আলাদিনের জিন বা ভূতের রাজার দেখা পেলে কী এমন ক্ষতি হত? শুনেছি, তারা তিনটে করে বর দেয়।– যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার মুখে লংকা ঘষে তিন-তিনখানা পলিসি তো বাগানো যেত! উঃ, বাঙাল ম্যানেজারটার নাকে ঝামা ঘষে দিতুম!

'ইউ ক্যান উইন' পুঁথিতে লেখা আছে– বিপদে ভাঙিয়া পাড়িলে চলিবে না, তাহার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে, তবেই জয় আসিবে।' এদিকে আমার ফুলোনো বুক ততদিনে ন্যাতানো বেলুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে এত দুব্বো গজিয়েছে যে তা তিনখানা জার্সি গরুর চার দিনের খোরাকি। কিন্তু, কোথায় জয়? হতচ্ছাড়া মোহনবাগানটাও একের পর এক হেরেই চলেছে। সেই গেল আশ্বিনে শেষ 'জয়' শুনেছি, তাও আবার দুগ্গামাতার।

যাই হোক, আমার হবু কাস্টোমার ডাব-নারকেলের ব্যাবসিক। বেগতিকে লোকে যাকে-তাকে বাপ ডাকে, আমরা ডাকি 'স্যার'। এই স্যার সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন সন্ধে ছ'টায়। আমি পৌঁছুব পৌনে পাঁচটায়। প্রথমেই পাড়ায় ক্ষণিক ঘুরঘুর করব, দূর থেকে স্যারের বসতবাটি জরিপ করব, রেস্ত বুঝে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করব। সাড়ে তিনখানা সিগ্রেট ফুঁকব। তার গন্ধ ঢাকতে নেবুনজেন চুষব। তারপর ঠিক ছ'টা বাজতে তিন মিনিটে দরজার কড়া নাড়ব। গুনে গুনে তিনবার, না এক কম, না এক বেশি।– এই আমাদের কোম্পানির শিক্ষে। একবার আবিশ্যি পাড়ার লোকে ছেলেধরা ভেবে ঠেঙিয়ে দিয়েছিল প্রায়, তবে সে সব যাকে বলে 'প্রফেশানাল হ্যাজার্ড'। সব পেশাতেই কিছু না কিছু থাকে। গা করতে নেই। হবু কাস্টমার হবু প্রেমিকার চেয়েও কমনীয়। কিন্তু, এত যে তোষামোদ করি, সে জগাই-মাধাই দেখলেই কলসির কানা ছোঁড়ে! পলিসি দূরে থাক, প্রেম অবধি দেয় না।

হাতের ঠোঙায় একগোছা আঙুর। জমিদারি মেজাজে একটা একটা করে চিবুতে চিবুতে নারকেলডাঙা যাচ্ছিলুম।– নাহ্, জুড়িগাড়িতে নয়, অটোয় চড়ে। একটু এগিয়ে ডানদিকে বাঁকতেই দেখি চন্দ্রা তার হাজব্যান্ডের হাত ধরে দুলে

দুলে রাস্তা পার হচ্ছে। টাটকা বিয়ে তো, দুটোরই চোখ-মুখ-কানকো এখনও বেশ লালচে। গা রি-রি করে উট্‌লো,– মেয়েরা বেছে বেছে কেন যে ভুল পুরুষকেই বিয়ে করে, কে জানে! পরক্ষণেই সুনয়নার মুখখানা ভেসে উঠল।– সত্যিই কি সবাই ভুল...?

বছর খানেক আগে চন্দ্রাকে গোটা কুড়ি এস.এম.এস. পাঠিয়েছিলুম। ওরে হতচ্ছাড়ি, সে'কথা কি বাপ-মাকে বলতে হয়! যেদিন বাগে পেল, আর যাই কোথায়, তিন দিক থেকে তার বাপ-মা-দাদা মিলে ঘিরে ধরলে। কোন সম্বন্ধী বলেছে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল আটলান্টিকে? সেদিন বাগবাজারেই বারমুডা দর্শন করেছিলুম। কী নাকানিচোবানিই না খাওয়ালে মাইরি!

তবুও প্রায় কাটিয়ে এনেছিলুম,– হাজার হলেও সেলসের লোক, বর্ণপরিচয় না থাকলেও বিদ্যে পেটে গিজগিজ কচ্চে। কিন্তু, সে মেয়ে বলে কিনা, সেলসম্যানের গলায় মালা দেবে না! চটে ভাবলুম– ফুঃ, যে 'ম্যান' আর 'একজিকিউটিভ'-এর তফাৎ বোঝে না, তার জন্যে নাকি হেঁদিয়ে মরছি! তা সেদিন যে অত কথা বল্লি, কী জোটালি শেষমেশ– মাস্টার। সে ব্যাটা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট জানে? ফিসকাল ডেপিজিট বোঝে? রিভার্স রেপো খায় না মাথায় দেয়– সে তত্ত্বের নাগাল আছে তার?

ঠোঙার আঙুরগুলো খুব টক লাগছিল। দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে বাকি রাস্তাটুকু 'ইউ ক্যান উইন'-এ মনোযোগ দিলুম।– 'সাফল্যের অর্থ ব্যর্থতার অনুপস্থিতি নয়; তার অর্থ চূড়ান্ত লক্ষ্যের সিদ্ধি। তার অর্থ যুদ্ধে জয়লাভ, প্রত্যেকটি লড়াইয়ে নয়।'– দূর মড়া, যেন বিরাট নতুন কথা বলেছে! সব লড়াইয়েই মাটি ধরলে যুদ্ধ কি প্রতিবেশী জিতবে?

যাই হোক, সময়মতো কাস্টোমারের বাড়ি পৌঁছুলুম। তিনি বারান্দার চেয়ারে বসলেন আর সঙ্গে রইল তার সাত বছরের সুপুত্তুর। সে নিজের নাকে তর্জনী ঢুকিয়ে খোঁচাতে শুরু করলে আমিও হামলে পড়ে পলিসি বোঝাতে শুরু করলুম। ভাবখানা এই– একবার কিনেই দেখুন স্যার, কোম্পানি আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে। আর আমি বাঁধা গোলাম তো রইলুমই। পারলে, পলিসিতে কিডনিদুটোও জমা করে দিন, ম্যাচুরিটিতে চারটে কিডনি ফেরত পাবেন।

কিন্তু, অত করেও কাস্টমার গলল না। ওদিকে তার সুপুত্তুরও তর্জনী ছেড়ে একে-একে মধ্যমা, অনামিকা, এমনকি কড়ে আঙুলও কাজে লাগিয়ে খনি থেকে সোনাদানা তেমন কিছু বার করতে পারল না। শেষ আশা যায় দেখে মরিয়া হয়ে বললুম, 'স্যার, ইনসুরেন্স না থাকলে আপনি যদি পুট করে মরে যান, তখন কী হবে?'

শুনেই তার মুখ গোমড়া,– 'বারো ভূতে লুটে খাবে। তোমার বাপের কী?'

তার সুপুত্তুর হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠলো,– 'কী মজা কী মজা, বাবা মরে যাবে, মরে যাবে, শ্রাদ্ধ হবে, লুচি খাব।'

ভেতরঘর থেকে কাস্টমার-গিন্নি হুঙ্কার ছাড়লেন,– 'কে রে মিনসে,

ভরসন্ধেয় কু-ডাক ডাকে! ঝাঁটা মার ওর মুখে।'

বেগতিক দেখে স্যারের পায়ে আছড়ে পড়লুম। তার সুপুত্তুর আমার জামায় হাত মুছল, দেখেও ইগনোর করলুম। বললুম, 'হুজুর মায়-বাপ, আপনি না দেখলে চাকরিটা খোয়াব। দয়া করুন।'

হঠাৎ-বড়োলোক প্রতিপত্তি দেখানোর সুযোগ পেলে ধন্য হয়, ইনি একটু ঠাণ্ডাও হলেন, 'বেতন কত পাওয়া হয়?'

দ্বিগুণ বাড়িয়ে বললুম।

– আরও দুশো টাকা বেশি দেব। অ্যাসিট্যান্ট ছোকরা ভেগেছে। পারবে?

বেম্মতালু জ্বলে গেল।– এতবড়ো আস্পদ্দা! অজগর কখনও আরশোলা খায়? তলোয়ার দিয়ে কেউ নখ কাটে? আমি কিনা... শেষে ডাব! তিন সেকেন্ডে বোঁচকা গুছিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে, টাই উঁচিয়ে গটগট করে বেরিয়ে এলুম।

দোসরা এপ্রিল, দু'হাজার এগারো। টাং-টাং করে রাত দুটো বাজল। তিন দিন আগে চাকরি খুইয়েছি, দেশ আজ বিশ্বকাপ জিতেছে। পাড়ায় বাজিপটকা ফাটছে। আমারও।– যথাক্রমে, সশব্দে ও নিঃশব্দে। চৌমাথার মোড়ের ট্রাফিক পুলিশের ছাওনিটি নিয়ে একদল ছোকরা টানাটানি শুরু করছে,– যেন ওটিই বিশ্বকাপ! কেউ হাসছে, কেউ আবার পাড়ার বুড়ো কুকুরটাকে জড়িয়ে 'ভুলু রে' বলে মড়াকান্না ধরেছে। কুকুর বেচারা পড়েছে মুশকিলে। ওদিকে আর একজন হাপুস নয়নে ডুকরে উঠল,– 'হুলোদা, কেন যে আমি খেলা দেকলুম নাআআআআ?'– মাতালের মনস্তাপ অতি ভয়ানক বস্তু।

সামনের রাস্তায় লোকে পতাকা নিয়ে এমন নেত্ত জুড়েছে, যেন এইমাত্র রেডিয়োয় লালকেল্লার ভাষণ হচ্ছিল,– 'অ্যাট দ্যা স্ট্রোক অফ দ্যা মিডনাইট আওয়ার, হোয়েন দ্যা ওয়ার্ল্ড স্লীপস্...'। এদিকে চাকর-সত্তা ঘুচলেও কিছুতেই 'অ্যাওয়েক টু লাইফ অ্যান্ড ফ্রিডম'– গোছের অনুভূতি জাগছিল না।

হঠাৎ মোবাইলটা বেজে ওঠে।– অচেনা নাম্বার। এত রাতে?

– হ্যালো?

– কেমন আছেন?

আরিব্বাস, এ যে নারীকণ্ঠ! গলা চার ধাপ কোমলে এনে প্রশ্ন করলুম– 'কে বলছেন?'

– সুনয়না। চিনতে পারছেন?

মনে মনে ভাবি, একেই বলে মরুদ্যান। পরক্ষণেই সাবধান হই, না শুরুর কয়েকটা বল দেখে খেলতে হয়। বেমক্কা ব্যাটের কানা লাগিয়ে রামকানাই হয়ে লাভ নেই।

– চিনতে পারব না কেন? কী যে ভাবেন! কিন্তু, বৌদির কাছে আমার নম্বর তো ছিল না। কোত্থেকে পেলেন?

এতগুলো কথা বলেই শংকা জাগে,– বাচাল ভাবেনি তো?

– সেটা জানার কী দরকার মশাই?

'অ্যাঁ!'– ধুত্তোর, আবার ছড়ালাম!

– মানে, নম্বর কে দিয়েছে– কী দরকার জেনে?

– দরকার নেই তাহলে।

– খেলা দেখলেন? আমার তো দারুন আনন্দ হচ্ছে।

– হুঁ।

– আপনার হচ্ছে না?

– এখন হচ্ছে।

– ওহ্, আগে হচ্ছিল না বুঝি?

– এত কথা ধরছেন কেন?

– এমনি। আর আপনিই বা এত ভয়ে-ভয়ে কথা বলছেন কেন?

– কই না তো!

– উঁহু। সত্যি বলুন তো, ভয় পাচ্ছেন নাকি বিরক্ত হচ্ছেন?

– কোনোটাই না।

– তাহলে নিশ্চয় আমার একা-একা পূর্বা এক্সপ্রেসে ওঠার গল্প শুনেছেন। ভাবছেন বেহায়া টাইপের মেয়ে।

– ধুর, যত্তসব বাজে কথা!

সুনয়না অদ্ভুত ভাবে হাসল, 'বাজে কথা কেন হবে? আমি সোফায় বসলেও লোকে ট্রেনের সীট দেখতে পায়।– চরিত্রের দাগ বোঝেন তো? ওই ট্রেনটা আমার জীবনের সঙ্গে সাপের মতো জড়িয়ে গিয়েছে, বুঝলেন? অবশ্য সাপের বদলে অভিশাপও বলতে পারেন।'

এই সব কথাও মেয়েটা হাসতে-হাসতে বলে কীভাবে কে জানে!

– আমার ওসব কিছুই মনে হয় না। আসলে, চাকরিটা গ্যাছে তো, মন ভালো নেই।

– শুনেছি। সেজন্যই ভাবলাম একটা প্রস্তাব দিই।

– কী প্রস্তাব? আমি কিন্তু কোনো মালটি-লেভেল মার্কেটিঙে ঢুকব না।

'ধ্যার্, আজব মাল তো! দিদি ঠিকই বলেছিল,'–তার গলায় বিরক্তি, 'আপনি একটি উৎকৃষ্ট প্রজাতির আতা। এখানে মার্কেটিং এল কোত্থেকে?'

শশব্যস্ত হয়ে উঠি, 'রাগ করবেন না।... কিন্তু, মানে, তাহলে কী প্রস্তাব?'

– ধুর, মুডটাই মাটি করে দিলেন।

শশব্যস্ত হয়ে উঠি, 'মাইরি বলছি, আর করব না।'

– কী করবেন না?

– মাটি।

– তাহলে কী করবেন?

– জানি না।

সুনয়না হেসে ওঠে, 'পালাবেন?– আমার সঙ্গে? সিরিয়াসলি বলছি কিন্তু।'

– কোথায়?

– কী লোক রে বাবা, অবাক অবধি হয় না! 'কেন'-র বদলে কিনা জিজ্ঞেস করছে 'কোথায়'! এককথায় রাজি?

জীবনের সমস্ত সাহস একজোট করে উত্তর দিলুম, 'বুঝতেই তো পারছেন-!'

দিদিমনিদের মতো গলায় সে বলল, 'কিছু জায়গায় বুঝলেও হয় না। শুনুন, একটা উপদেশ দিয়ে রাখি, মেয়েরা খুব অবভিয়াস জিনিসও শুনতে পছন্দ করে। আমার সঙ্গে শেষ অবধি পালাবেন কিনা তা আপনার ব্যাপার, তবে কথাটা মাথায় রাখবেন।'

– কিন্তু, আমার চাকরিটা তো-!

– নেই দেখেই তো বলছি। থাকলে কী আর পারতেন?

'যাহ্, কী যে বলেন না!'– প্রসঙ্গ ছিল না, তবু লজ্জা লাগছিল।

একটু আগে রাস্তায় কারা যেন বলাবলি করছিল, এবারের বিশ্বকাপ নাকি তেমন একটা জমেনি। তো?– আমরা জিতেছি। আমিই জিতেছি। মনের ফুর্তি কি একটুও কম! শেষের ছক্কাটা আমিই তো হাঁকালুম। ঠিক গিয়ে পড়লো ওই হুঁকোমুখো বাঙাল ম্যানেজারের মুখে।– তার আগের আপারকাটখানা ওই হতচ্ছাড়ি চন্দ্রার,– না না, ওর বরের মুখে। দ্যাখ কেমন লাগে! বোঁচা নাকটা যেন দুমড়ে দিলুম। আহা কী সুখ! এই পৃথিবী যদি দেখতে পেত– এক-একটা মারে জীবনের সব নেমকহারামগুলোকে কেমন উড়িয়ে দিয়েছি, কেমন গুঁড়িয়ে দিয়েছি!

কাল রোববার। ক'কপি বায়োডেটা ছাপাতে হবে। পরশু থেকেই আবার খুঁজব চাকরি। একটা পেয়ে নিই, তারপর... চিৎপুরের রেললাইন থেকে শান্টিংয়ের শব্দ আসছে। এসময় রোজই আসে। জানি মালগাড়ি, তবু শব্দটা কোনো দূরপাল্লার ট্রেনের মতো লাগছে। জানি ডিজেল ইঞ্জিন, তবু এই বুঝি ভুস্ করে একটু স্টিম ছাড়ল। আজ বিশ্বকাপ। আজ যেন...

*****

'অন্তরীপ' বিশেষ হাস্যরস সংখ্যা, ২০২২

চাকা

'...আপনি যেমন চাকা গড়েন প্রাণকৃষ্ণজি।– টুকরো টুকরো কাঠ, সবাই এক গাছের কিনা তা-ও মালুম নাই। কিন্তু, চাকার বুনোটে কেমন মিলমিশ করে থাকে। সেই হল শান্ত রস। এবার বলুন দেখি, এই যে সাত কাঠে পরিধি গড়েছেন, সেই সাত ভাই চম্পার কে আগে আর কে পরে? তারা কেমন হাত ধরাধরি করে জীবন কাটায়। এই হল সখ্য রস। মাঝের এই গুঁড়িখানা, নাড়ির টানে বেঁধে রেখেছে সবকটাকে। সে রস হল বাৎসল্য। এবার একলা চাকা যাবে কই? তার জীবন মানেই যে পথচলা। গাড়ির প্রতি তার যে টান, সে হল দাস্য রস। আর সব রসে টইটম্বুর হয়ে যখন চাকা পথে নামে, পেরিয়ে যায় গাঁয়ের পর গাঁ, সে যে বড়ো মধুর রস;-

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।'

কথার শেষে গোপীচন্দনে মন দেয় শ্রীপতি গোস্বামী। দুধ-সাদা ধুতি-চাদরে সৌম্যকান্তি রূপ। ষাট ছুঁইছুঁই, তবে বয়সের ভারে ন্যুব্জ নয়। কাঁচা-পাকা চুল চুড়ো করে বাঁধা। মুখমণ্ডলে অশ্বত্থের ঝুরির মতো গোঁফদাড়ি।

সাগরদিঘির কাঠুয়াপাড়ায় অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তনের আসর বসেছে দিন-তিনেক হল। চলবে আরও চারদিন। আরও গোটা-পাঁচেক দলের মতো শ্রীপতির দলও এসেছে নামগান শোনাতে। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এ পাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ। কীর্তনের আয়োজকও বটে। পেশায় ছুতোর হলেও তার রুচি বেশ উঁচু তারে বাঁধা। নামগানের নামে আজকাল বেশিরভাগ দলই চটুল হিন্দিগানের সুরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' চালিয়ে যায়। কাঠুয়াপাড়ার আসরে তাদের কোনো স্থান নেই।

দুপুরে হরির লুটের বাতাসা কুড়োতে গিয়ে মুখ কেটেছে প্রাণকৃষ্ণের আট বছরের নাতনির। ভিতরের ঘরে এখনও গুনগুন কান্নার শব্দ। আসর থেকে ভেসে আসছে নামগানের টুকরো টুকরো পদ। প্রাণকৃষ্ণ আর শ্রীপতি ছাড়াও ওখানে আরও দুজন বসেছিল। সতেরো-আঠারোর এক যুবক আর তার গাড়োয়ান। নদীর ওপারে রেলস্টেশন। খেয়াঘাট যাওয়ার পথে চাকা ভেঙেছে তাদের গাড়ির।

কপাল ভালো, ব্যাপারটা ঘটেছে এ পাড়ার কাছেই। পাড়ার সব বাড়িই গরুর গাড়ির চাকা বানায়। কিন্তু, নামগানের সময় লোক পাওয়া মুশকিল।

প্রাণকৃষ্ণের বদান্যতায় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ব্যবস্থা একটা হয় বটে, তবে ততক্ষণে দিনের আলো নিভে এসেছে। যুবকের কাঁচুমাচু মুখ দেখে সে প্রস্তাব দিয়েছিল, 'আজ রাত্তিরটুকু গরিবের বাড়িতেই না হয় থাকুন। নামগান শুনুন। রাতের গাড়ি আর পাবেন না। এতটা পথ ফিরে যাবেন? ভোর থাকতে রওনা দিলে সকালের গাড়ি পেয়ে যাবেন।'

শ্রীপতি এত কিছু জানে না। তবে অজানা কারণে ওই যুবকের মুখটা ওর খুব চেনা ঠেকছে। মাথায় কদমফুলের মতো চুল, মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। আহা রে, সদ্য কোনো আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে নিশ্চয়।

একটু আগে হুঁকো সেজে দিয়ে গিয়েছে প্রাণকৃষ্ণের বৈষ্ণবী। গৃহস্থ বেশ সৌখিন। খাঁটি অম্বুরি তামাকের গন্ধে ম-ম করেছে চারপাশ। গুড়গুড় শব্দে কয়েকটা টান দিয়ে সে হুঁকোটা শ্রীপতির দিকে এগিয়ে দেয়।

– চৌষট্টি বছর বয়স হল আমার। সেই সাতাশ থেকে নামগান দিয়ে আসছি। কিন্তু গোঁসাই ঠাকুর, আজও বুঝলাম না 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' শুনলে দু-চোখ বেয়ে জল কেন নামে!

স্মিত হাসে শ্রীপতি, 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ— সে বড়ো কঠিন ঠাঁই প্রাণকৃষ্ণজি, বড়োই কঠিন। হরে, অর্থাৎ হরণ করে। রামও হরণ করে, কৃষ্ণও হরণ করে। বুদ্ধি বলে, সংসারে থাকো, সুখ ভোগ করো। বিবেক বলে, মায়ার বাঁধন কেটে নিজেকে মিলিয়ে দাও জগতের মাঝে, খুঁজে নাও শান্তি। এই বিবেক আর বুদ্ধির টানাটানিতে মন-প্রাণ বলে, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।'

– সে তো চিরকালের টানাপোড়েন।

– রাম,– 'র-আম' বা আমিত্ব রহে যেথায়। রাম হল বহির্মুখি শক্তি। আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে নিজেকে বড়ো করার দর্শন। গতিপথ সেখানে ব্যক্তি থেকে বিশ্ব। অন্যদিকে কৃষ্ণ ঠিক তার উলটো। অন্তর্মুখি শক্তি। সে আত্মগোপনের ছলে নিজেকে বজায় রাখার দর্শন। গতিপথ সেখানে বিশ্ব থেকে ব্যক্তি/ একক সত্তা। একজন মর্যাদা-পুরুষোত্তম, আর একজন নটখট গোপাল। মানুষ নিজের ভিতরে যখন এই বিপরীত শক্তির টানাপোড়েনে জেরবার হয়, যখন আমিত্বও তার সবকিছু 'হরণ' করে আবার 'বিশ্ব'ও তার সবকিছু হরণ করে,– সে কেঁদে ওঠে, 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ'।

– কোনো পথ নাই?

– পথের খোঁজেই তো গদাধর চাটুজ্জে রাম আর কৃষ্ণকে মেলালেন। সংসারেও সন্ন্যাসী তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণ।

– কিন্তু, তিনি তো শাক্ত!

– শ্রীকৃষ্ণ কালীরূপে দর্শন দেননি? 'কাল-আ' আর 'কাল-ঈ'। আমার মতো মানুষের জন্য এরা দুটি আলাদা মূর্তি। আসলে এরা ভাব। কাল, অর্থাৎ আদি-অন্তহীন মহাসময়। সেই কালের সঙ্গে 'আ' যোগের অর্থ সে মহাসময়ের আধার। আর 'ঈ' যোগের অর্থ সে ওই মহাসময়ের গতিশীলতার আধার। শ্যাম

আর শ্যামায় কোনো তফাৎ নাই প্রাণকৃষ্ণজি।'

সহসা নির্বাক হয় শ্রীপতি। এই কথাটা ও আরও একজনকে বলেছিল। বহুদিন আগে। তখন ও তিনকড়ি বিশ্বাসের দলে পদ গাইত। বিষ্ণুপ্রিয়ার পাঠ করত শ্যামলাল। দলের সবাই তাকে ডাকত 'শ্যামা'। আসরে নামলে প্রেমে-বিরহে-সঙ্গীতে তাকে বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া অন্যকিছু ভাবাও যেত না। তার গানে কান্নার রোল উঠত মহিলাদের মাঝে। কত এয়োস্ত্রী যে বিষ্ণুপ্রিয়াবেশী শ্যামলালের শাঁখায় সিঁদুর ছুঁইয়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই।

অবশ্য ছেলে-ছোকরার দল তার হাঁটাচলা, পিঠ-ছাপানো চুলের বাহার নিয়ে টিটকিরি কাটত। দলেরও দু-একজন সুযোগ পেলে খোঁচা মারতে ছাড়ত না। শরীরে শ্যামলাল হলেও মনেপ্রাণে সে ছিল শ্যামাই। একদিন শুধিয়েছিল শ্রীপতিকে, 'শুধু আমার শরীরটুকু এমন বলে, গোঁসাই, কেন সবাই-?'

ও বলেছিল, 'শ্যাম আর শ্যামায় কোনো তফাৎ নাই। লোকের কথায় দুঃখ পেও না। নিজেকে তাঁর পায়ে নিবেদন করো। তিনি প্রশ্ন করবেন না, তুমি শ্রীচৈতন্য নাকি মীরাবাঈ।'

সে কোনো জবাব দেয়নি। কিন্তু, শ্রীপতির মনে আজ হঠাৎ সংশয় জাগে,– সেদিন বিশ্বাস আর উচ্চারণের মাঝে কোনো ফাঁক থেকে যায়নি তো?

...

– ঠিকই বলেছেন। কালীগানেও ভাবের কমতি নাই।

প্রাণকৃষ্ণের কথায় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়। ও সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

– একটা মজার কথা জানেন গোঁসাইঠাকুর, আমি নিজেও রামপ্রসাদী গানের এক কলি মাঝেমধ্যে গাই।

– তাই নাকি?

– আর বলি কী! ওই যে, একটু আগে আমার বোষ্টমীকে দেখলেন, তিনি যেমন দয়াময়ী, তেমন মুখরা। তিনি চটলেই তাঁর মানভঞ্জনে গেয়ে উঠি, 'আমার হৃদকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।'

ওরা দুজন শব্দ করে হেসে ওঠে। গাড়োয়ান লোকটিও হাতের গামছায় নিজের হাসি ঢাকার চেষ্টা করে।

শুধু ওই যুবক তখনও ম্রিয়মাণ। এই চেনা-চেনা, অপাপবিদ্ধ মুখখানি দেখে বড়ো মায়া জাগে শ্রীপতির। আহা, ঠিক যেন যুবা বিশ্বম্ভর!

রাত নেমেছে। এই প্রহরে নিজের দলের পালা। ও আসন ছাড়ে, 'উঠি প্রাণকৃষ্ণজি, আসরে দেখা হবে।'

কালে কালে বয়সটা কম হল না। একটানা গাইলে আজকাল দমে টান ধরে। পদের গৌরচন্দ্রিকাটুকু সেরে আসর থেকে বিরাম নেয় শ্রীপতি। গাওয়ার পর একটু তামাক সেবন তার বহুদিনের অভ্যেস। রতন ছেলেটা গায় ভালো। শুধু ঠোঁট-সম্বল নয়, বুকে ভাব আছে। কিন্তু ওর নিজের? মনটা ভার হয়ে যায়। বৈতরণীর পাড় আর চোখের আড়ালে নয়। শুধু এক ঘাটপারানিই আজ অবধি

জোগাড় হল না! আজীবনের সঞ্চয়ে চোখ পড়লে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে।

বড়োই বেসুরো হয়ে গিয়েছে আজকাল। শ্রোতারা হয়তো ধরতে পারে না এখনও, তবে তাদের করতালি যেন থাপ্পড়ের মতো গায়ে লাগে। তবে কী কোথাও ফাঁক থেকে গেল? শ্রীপতি নিজেকে আরও একবার ঝাঁকুনি দেয়।– ফাঁক তো আছেই। বলরে মন বল, করতালির মোহ, পাঁচটা গাঁয়ে-গঞ্জে নামডাকের মোহ তোকে পেয়ে বসে নি? ময়ূরের মতো নাচতে গিয়ে ভুলেছিলিস, পেখম তুললে উলঙ্গ হতে হয়! সুর, ভাব একে একে বিদায় নিচ্ছে সব। অথচ, এই সুরের টানেই ঘর ছাড়া, নদীয়ার পথে পথে বৈষ্ণব পদাবলীর মুষ্টিভিক্ষা। হঠাৎ ভিড়ে যাওয়া তিনকড়ি বিশ্বাসের দলে।

মনের আয়নায় গুরুর মুখ ভেসে উঠতেই দু-কানে আঙুল ছোঁয়ায় শ্রীপতি। বড়ো গভীর মানুষ ছিল তার গুরু। বলত, মানুষের জীবনে তিনটে মাত্র বেলা। ভোরবেলা, ঘোরবেলা আর চোরবেলা। শৈশব তার ভোরবেলা। তখন সব ভাবই মিঠা। বিদায়কালে এই শৈশব এক অচীন-ঝোলা দেয় ধরিয়ে। তার নাম মন। যৌবনের ঘোরবেলায় হাত বাড়ালেই রাশি রাশি মণি আর মুক্তা!– দিনরাত শুধু ঝোলা ভরে যাওয়া। কিন্তু, বিষয়বুদ্ধি যত পোক্ত হয়, নজর যায় যতরাজ্যের নুড়ি-কাঁকরে। চুলে পাক ধরতেই মণি-মুক্তা সব ফুড়ুৎ! তখন সেই অচীন-ঝোলায় চুরি ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। যৌবনে যে যত মুক্তা কুড়ায়, এই চোরবেলায় তার ততদিন চলে। কাঁকুরেমাটির মতো কাঁকুরে মনও যে অ-ফসলা। সে বড়োই রুক্ষ।

শ্রীপতি প্রশ্ন করেছিল, 'ভাবের মণিমুক্তার মতো বিষয়বুদ্ধিও তো এই দুনিয়ার অংশ। তাকে নুড়ি-কাঁকর বলছেন, সে কি সত্যি নয়?'

– খাঁটি প্রশ্ন করেছিস। শরীর ধারণ করলে বিষয়-যাপন করতেই হয়। কিন্তু 'বিষয়ী' হওয়াটা কাজের কথা নয়। যে বুকে মুখ দিয়ে শিশু দুধ পায়, সে বুকে জোঁক পায় রক্ত। দুধও সত্যি, রক্তও সত্যি। ভেদ শুধু অধিকারীর।

আজ নিজের ঝোলা হাতড়ায় শ্রীপতি। কোনটি মুক্তা আর কোনটি কাঁকর ঠিকমতো ঠাহর হয় না। বড়ো অন্ধকার। সন্ধে নেমেছে, প্রদীপ জ্বালা হয়নি।

এই সাগরদিঘি থেকে চৌদ্দো-পনেরো মাইল দূরের এক গ্রাম। গ্রামের মুখেই মহান্ত গোবিন্দদাসের আখড়া। প্রায় শতাব্দী প্রাচীন। নাম গোবিন্দবাড়ি। আখড়ার এক প্রান্তে রাধামাধবের মন্দির। মন্দির লাগোয়া ছোট্ট গোয়ালঘর। অন্যপ্রান্তে রথের মাঠ। রথযাত্রা থেকে উলটোরথ— এই ক-টা দিন মেলা বসে। মাঠ-সংলগ্ন নাটমন্দিরে বসে নামগান, যাত্রার আসর।

আখড়ার দক্ষিণে আম, আমলকী, কৃষ্ণচূড়া, সেগুন, পেয়ারা, নারকেল আর হাজার রকম ফুলগাছের বাগান। আখড়া-লাগোয়া ঘরে যখন প্রথম পোস্ট-অফিস খোলে,– সে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কথা, সরকারের খাতায় গ্রামের নামও হয়ে যায় গোবিন্দবাড়ি। উলটোরথ গিয়েছে গতকাল। নামগানের আসরও

সমাপ্ত। এদিকে সকাল সকাল রওনা দেওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে দলের খোলবাদক সাধন হালদার। অসুস্থ মানুষ নিয়ে এতটা পথ যাওয়া মুশকিল। আবার তাকে রেখে যাওয়াও ঠিক নয়। দলের লোক বলে কথা। অগত্যা, গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধনকে ভর্তি করে তিনকড়ির দল গোবিন্দবাড়িতেই থেকে যায় কয়েকদিনের জন্য।

অমন ঈশ্বরপ্রদত্ত গানের গলা আর গৌরকান্তি সুঠাম রূপের অধিকারী যুবক শ্রীপতি সেই ক-দিনেই গ্রামবাসীদের নয়নের মণি। তবে আরও একজন অগোচরে, অনুচ্চারে তাকে মন দিয়ে ফেলেছিল।– আখড়ার সেবাইতের কন্যা বিশাখা।

সন্ধে নামলেই এখানে যেন মাঝরাত! আরতি হয়ে গেছে। শূন্য মন্দিরের সিঁড়ির একপ্রান্তে শ্রীপতি আপনমনে একটি পদ গুনগুন করছিল। গোয়ালঘরের প্রদীপের সলতে উসকে দিয়ে অন্যপ্রান্তে এসে বসে বিশাখা। নদীর মতো শরীর। চোখ দুটি যেন সমুদ্র। এমন নারীমূর্তি বুকে কাঁপন ধরায়। সামান্য প্রদীপের তাপেই সারা দেহে আগুন জ্বলে। ও বারবার সুরের খেই হারিয়ে ফেলছিল।

– কী হল গোঁসাই, থামলে কেন?

রাধামাধবের মুখ থেকে তখনও দৃষ্টি সরেনি বিশাখার। শ্রীপতি গান ধরে—

শুন শুন নিবেদন বিনোদিনী রাই।

তোমা বিনে ত্রিভুবনে মোর কেহ নাই॥'

দু-কলি গেয়েই থমকে যায়,– এ সে কী গাইছে! আবছা অন্ধকারে লজ্জিত মুখ লুকিয়ে দ্রুত অতিথিশালায় ফিরে আসে। বিশাখার আরক্ত মুখখানি চোখে পড়ে না।

বাগান পার হলে ঝিল। ঘাটে দুটি ডিঙিনৌকা বাঁধা। ঝিলপাড়ের মাটির বাঁধ হল আখড়ার সীমানা। অন্য কোনো প্রাচীর বা বেড়া নেই। বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে আম, জাম, কাঁঠাল, বট, ডুমুর, ভেঁটুল, মাদার, বাবলা— অসংখ্য সুফলা অফলা গাছের অরণ্য। নির্জন। ভারী মনোরম।

কিন্তু, কী থেকে যে কী হয়ে যায়! মানুষে-মাটিতে-বৃষ্টিতে তফাৎ যায় ঘুচে! মাটি তখন বিছিয়ে দেয় আঁচল। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। মেঘের আড়াল থেকে কয়েক মুহূর্তের দীপ্ত রোদ। বৃষ্টির আবেশে বাতাস ক্রমশ উন্মাদ। পাতাদের চমক লাগে। কিছুটা উথালপাথাল, মাটির বুকে ঝাপটা দেয় রোদের নিঃশ্বাস। কী খোঁজে? নয়ানজুলি?– কখন যে আছড়ে পড়ে জল!

বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ। বাহুলতা শিথিল হতেই শ্রীপতি হঠাৎ নিজের কণ্ঠিখানি পরিয়ে দেয় বিশাখার গলায়।

– এ কী করলে গোঁসাই?

– কেন? কণ্ঠিবদল।

– ধরা দেওয়ার মানুষ তো তুমি নও। কেন মিছিমিছি-?

– মিছিমিছি! এই সকালটা কি মিছেকথা?

– একটা মাত্র সকাল দিয়ে জীবনটা বাঁধবে গোঁসাই? বিকেলটুকু না ভেবেই? গায়ক তুমি ভালোই। তবে এ গানের মুখরা জমলেও সঞ্চারীতে তাল কাটবে যে।

– তবে আজ বনের পথে এলে কেন?

– তোমার গান আছে, রাধামাধবকে তুমি সুর দিয়ে ডাকো। আর আমি ডাকি মনেমনে। এই মন নিয়ে বড়ো জ্বালা। মন যদি আকুলই না হয়, মন দিয়ে তাকে ডাকব কী ভাবে? আমি মুখ্যু-সুখ্যু মেয়েমানুষ। তত্ত্বকথা বুঝি না। তবে কথায় আছে, ঠাকুরের আসন খালি রাখতে নাই। তুমি আখড়ায় যাও। দুপুরের গাড়িতে তোমাদের ফেরার কথা।

– তুমি?

– এখন ঝিলের জলে চান করব। পদ্মফুল তুলে দেব রাধামাধবের চরণে। তারপর গোয়ালঘরের কাজ, বাপ-মেয়ের রান্না। আর হয়তো দেখা হবে না।

অতিথিশালা থেকে মন্দির সরাসরি দেখা যায় না। সকাল-সকাল গাইতে বসেছিল তিনকড়ি। জলে গোলা খড়িমাটিতে টগরফুল চুবিয়ে ছোপানো বুড়ো হারমনিয়ামখানা এই বুড়োর হাতে যেন কথা বলে! বিক্ষিপ্ত চিত্তে দাওয়ায় বসেছিল শ্রীপতি। তিনকড়ি গাইছে–

'বলি, শুন হে মথুরারাজ।
রাখালি ছাড়িয়া, বেলাবেলি তুমি, রাজা সাজিয়াছ আজ!
তোমারে কী দিব লাজ...'

ধাঁধা লাগে শ্রীপতির, গুরুর তীর কি ওর দিকেই?

দেওয়ালে টাঙানো ছবিতে অশান্ত সমুদ্রের সামনে উদ্বাহু মহাপ্রভু। তিনকড়ি বলে, 'নামগান মহাপ্রভুও করতেন, আমরাও করি। কিন্তু তাঁর সমাধি নীলাচলে। আর আমরা নিত্য মরি দোলাচলে।'

রাত হয়েছে বেশ। বাইরের ঘরের দাওয়ায় প্রবীণ শ্রীপতি। একা। আসরের ভিড় এখন অনেকটাই পাতলা। ঘণ্টাখানেক আগে প্রাণকৃষ্ণের পরিবারও বাড়ি ফিরে এসেছে। ভিতর আর বাইরের ঘরের মাঝে একচিলতে উঠোন। একপ্রান্তে গৃহীর মন্দির। শ্বেতপাথরের সিংহাসনে রাধামাধবের যুগলমূর্তি, বালগোপাল, মা লক্ষ্মীর একখানি পট আর কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো এক প্রৌঢ়ের সরল কর্মঠ মুখ। খুব সম্ভব প্রাণকৃষ্ণের স্বর্গত পিতা। আসরের নামগান কী রসের সঞ্চার করেছে কে জানে, বাড়ি ফেরা ইস্তক প্রাণকৃষ্ণের বুড়ি মা ছলছল চোখে ঠায় বসে মন্দিরের সামনে। সহসা পুলকিত হয় শ্রীপতি, স্মৃতিমন্থনে উঠে আসে কিছু অমৃতসমান শব্দ!– 'ঠাকুরের আসন খালি রাখতে নাই।...'

– গোঁসাইঠাকুর।

সেই গাড়োয়ান লোকটি এসে দাঁড়িয়েছে দাওয়ার সামনে।

– বলো।

– এট্টু আগুন হবে? দোষ লিবেন না দয়াক করে। ভাতের পর একটা বিড়ি না ফুঁকলে রাতে ঘুম হয় না। ইদিকে কলে জল খেতে গিয়ে দিশলাইটা পড়ল গিয়ে কাদার মধ্যে। আপনেরটা যদি এট্টু দিতেন-।

– এই নাও। এখানেই বোসো।

গদগদ মুখে শ্রীপতির পায়ে হাত ছোঁয়ায় লোকটি। দাওয়ার এককোণে বসে আয়েশ করে বিড়ি ধরায়।

– তোমার নাম কী?

– আজ্ঞে এনামুল।

– তা এনামুলভাই, গান কেমন শুনলে?

– আমি ছোটোলোক মানুষ, অতশত কি আর বুঝি? তবে একটা কথা ঠাকুর, নামগানের সুর শুনলে মুনে হয় য্যানে মেলা-দূরের রাস্তায় আপন মুনে যেছি তো যেছিই! খোলের বোলের মুতোন চাকার আওয়াজ, কর্তাল য্যানে বলদের গলার ঘণ্টার মুতোন বাজছে। হাওয়ার মুতোন গানের বোল ভেসে যেছে কানের পাশ দিয়ে। আর সে কী বোল, মুনে হয় ঠাকুর-দেবতারা য্যানে নিজের ছেল্যা-মেয়্যা, ঘরের বৌ, বোন, ইয়ার, দোস্ত, ভাই! তাদের কদমবুসি করা লাগে না, বুকে জাপটিয়ে ধরা যায়।

– তুমি তো বেশ রসিক মানুষ। কোন গাঁয়ের লোক?

– আজ্ঞে গোবিন্দবাড়ি।

চমকে ওঠে শ্রীপতি। গুরু, আজ কী খেলা খেলছ আমার সঙ্গে? কেন আজ মনটাকে বারবার ঠেলছ পিছনপানে? তোমার লীলা তুমিই জানো। দেখি কতদূর নিয়ে যাও!–

– ঠাকুর, গিছেন নাকি আমাদের গাঁয়ে?

– হ্যাঁ। রথযাত্রায়।

– নামগানের ডাক পেয়েছ্যালেন বুধহয়। সেদিন আর নাই। আখড়ার ওই মুন্দিরটুকুনই যা আছে।

– নামগান হয় না?

– ওই রথের দিন গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সব মিলে একবেলা যা করে। সে জুলুস আর নাই। নাটমুন্দির কব্বেই ভেঙে গিছে। এখুন গাঁয়ের মেদোমাতালগুলান উখান থিকে লুহা-লক্কর চুরি করেকরে ব্যাচে।

– এমন দশা হল কেন?

– সে ধরেন পেরাই বিশবছর আগের কথা, পুরুৎঠাকুর বেন্দাবন থিকে 'তিত্থ' করি আসার পর থিকেই কেমুন য্যানে হয়ে গিলেন। কুনও দিকে লজরই নাই! মরেও গিলেন চট করে। সেই থিকেই বারো ভূতে লুটে খেতি লাগল।

শ্রীপতির বুক দুরুদুরু করে, 'সেবাইতের এক মেয়ে ছিল না? তার কী হল?'

'সতী মা? তার লেগেই তো মন্দিরটুকুন টিকে আছে।' চোখ ছলছল করে

ওঠে এনামুলের, 'এই একমাস হল তিনিও চলে গিলেন। বড়ো ভুগছিলেন। ... যার লেগে এসছি,– গোপালবাবু, তিনি উনার, যাকে বলে, পোষ্যপুত্তুর। মায়ের পিণ্ডি দিতে গয়া যাবেন। জানেন ঠাকুর, সতীমার মুতোন মানুষ আর হয় না। গাঁয়ের লুকের জন্য নিজের যা ছিল, সব তো আগেই বিলিয়েছেন, তারপরেও-।... বিধানচাচার শরীল খারাপ হল, ওষুধ কিনতে বেচে দেলেন গরুদুট্যা। জয়নালের মেয়্যার নিকাহ আটকে গেল, আমগাছ বেচে ট্যাকা দিলেন তাকে। মহাজনের লাথ খেয়ে অবিনাশ হালদার গুষ্টিশুদ্ধ গিয়ে উঠল সতীমার ঘরে। একদিন জবরদখল করে লিল! উনি গিয়ে উঠলেন ফাঁকা গুয়ালঘরে। আমরা তাড়াতে গেছলাম, সতীমা দ্যালেন না। বুললেন, আখড়া তো মানুষের লেগেই, উয়াদের কষ্ট দিয়ে কি ঠাকুর-পুজ্যা করা যায়? হায় রে পুজ্যা! যে মুন্দিরকে বুক দিয়ে আগলে রাখলেন, বিশ বছরে তার সিঁড়িতে অবধি পা রাখেননি!'

দেহের রক্ত যেন শীতল হয়ে যাচ্ছে শ্রীপতির, 'কেন?'

– গোপালবাবু যখন এইটুকুন, এক্কেবারে দুধের ছেল্যা, সতীমা ইনারে কুড়িয়ে পেয়েছ্যালেন বেন্দাবনে। আর তখুন একদল হারামি রটিয়েছিল, ইনি নাকি মায়ের নিজের পেটের পাপ। সেই দুঃখেই নাকি পুরুতঠাকুর মরেছে। মায়ের নাকি চরিত্তির ভালো না। মা-ও তেমনি। বুললেন, মুন্দির আপনেদের, আপনেরা না চাইলে মুন্দির ছুঁব না। হারামি শালারা, সব ওই আখড়ার সম্পত্তি লুটার তাল। হক কথা বুলছি গোঁসাইঠাকুর, সতীমার চরিত্তির যদি খারাপ হয়, আমি তাহলে খানকির ব্যাটা!

কোনো কথা কানে ঢুকছে না। শ্রীপতি স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কেন ওই যুবকের মুখ এত চেনা-চেনা ঠেকছিল। কাঁচের আয়নায় দেখা গৌরাঙ্গের সাজে নিজের মুখখানি মনের আয়নায়, অগোচরে পড়েছিল যে এতদিন! ও হাহাকার করে ওঠে, 'হে গুরু, সজ্ঞানে কখনও নুড়ি-কাঁকরে নজর যায়নি আমার। আর এমন কোহিনূর চিনতেই পারলাম না! হে ঠাকুর, মহাপ্রভু নিজের দু-চোখে কাঁটা বিঁধতে গিয়েছিলেন, আজ আমি কী করি?'

সদ্য আলো ফুটেছে। রতনের জন্য প্রাণকৃষ্ণের হাতে চিঠি রেখে এসেছে শ্রীপতি। রতন গুণী ছেলে, সামলে নেবে দলটাকে। অবশ্য যাত্রা শুরুর সময় কোনো পিছুটান না রাখাই ভালো। কাল সারারাত অনেক ভাঙচুর গিয়েছে মনের ওপর দিয়ে। এখন গুরুবাক্যই ভরসা,— এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে যেতে হয়। তবেই তাকে পাওয়া যায়।

ঝরা বকুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর। ভাসছে মৃদুকণ্ঠে মঙ্গলাচরণের পদ।-

থাকে যদি আয়ু শেষ, বিস্তারিব লীলা শেষ যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥

ওদিকে এনামুলের গাড়ি পথে নামতে প্রস্তুত। গোপাল নামের সেই যুবকও তৈরী। শ্রীপতির বুকের তুফান এখন শান্ত। ও ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে।

– ঘাট অবধি একটু পৌঁছে দেবে বাবা?...
দুয়ার-ধারে দাঁড়িয়ে প্রাণকৃষ্ণ। জোড়হাত কপালে ছোঁয়ায়,– 'দুগ্গা দুগ্গা।'
গাড়ির চাকা ঘুরতে শুরু করে।

*****

'শিলাদিত্য', বিশেষ গল্প সংখ্যা ২০১৬

স্যাঙাত

বালুচরে এই বুধবারের হাট বছর-পনেরো আগেও বেশ রমরমিয়ে বসত। হাজার রকমের পসরা নিয়ে শয়ে শয়ে লোক আসত। এখন জৌলুস কমেছে। একদিনে তেরো-চৌদ্দোশো গরু-ছাগল বেচা-কেনার হাটে এখন হড়মা-সার বুড়ি গরু আর দুই-পা ভাগাড়ে রাখা বলদ নিয়ে জনা-তিনেক পাইকার আসে শুধু। কয়েকঘর গরিব মুসলমান আছে বালুচরে। ইদে-পরবে দুটো-একটা বিক্রি হয়, অন্য সময় মাছি তাড়ায় পাইকার।

একজন জাতে পাঁড় মাতাল। তালেরও কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। দ্বিতীয়জন বদ্ধ পাগল। মাথায় জটা, গত দশবছরে ওই এক বৃষ্টি হলে ভেজা ছাড়া স্নান বা শৌচ— কোনোটিই করে না। প্রথমজন, মানে কানাই নেশার ঘোরে থাকে বলেই ওই দুর্গন্ধ উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে পারে, অবশ্য যদি তাকে 'গল্প করা' বলা যায়!

নেশা চড়লেই মেজাজও চড়ে কানাইয়ের। কয়েকবার মারও খেয়েছে, মারের চোটে মাথা ফেটে একবার ক্লাবঘরের সামনে ঝাউতলায় সারারাত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এই নিতাইপাগলা পাহারা দিয়েছিল ওকে, সকাল হতেই কোত্থেকে একটা মাটির ভাঁড় জোগাড় করে ধুইয়ে দিয়েছিল কপালের রক্ত। সেই থেকে কানাইয়ের সমাজদর্শনের নিয়মিত ও একমাত্র শ্রোতা নিতাই। একজন একনাগাড়ে বলে যায়, কখনও কখনও দু-একটা কথার পর হয়তো টানা একঘণ্টা অশ্রাব্য গালাগাল! অন্যজন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ফ্যাক করে হেসে ফেললেই ধমক, 'হেগে ছুচাস না, এত হাসি কীসের বে বোকাচোদা?'

পিচরাস্তা লাগোয়া রঘুর চায়ের দোকান। খুলেছিল ওর ঠাকুরদাদা। হাটভাঙা মানুষ, ব্যায়াম সমিতির স্বদেশিরা চায়ের ধোঁয়ায় ক্লান্তি ওড়াত সে সময়। আর আজকাল সকালের দিকে মূলত পাড়ার চল্লিশ পেরোনো কতগুলো আধবুড়ো আর বিকেলে জিন্‌স পরা ছোকরাদের আড্ডা।

জোর তর্ক বেধেছে আজ। যুযুধান দু-পক্ষ আসলে দুই ভাই। ঠিকানা এক হলেও হেঁশেল আলাদা। সদর দরজাও। বড়োভাই পুজো-আচ্চা করা লোক। লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজোয় ডাকও আসে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে। ছোটোভাই ভূষণ স্কুলমাস্টার। উত্তেজনায় তার গলা বেশ চড়ে গিয়েছে, 'তোমাদের এই বামুনগিরি ছাড়ো বড়দা। কে উঁচু জাত, কে নীচু জাত— এখনও চালাবে? এদিকে পৃথিবী কোথা' থেকে কোথায় পৌঁছে গেল!'

– কোথায় গেল? এ দেশ থেকে প্রথম যে লোক মহাকাশে গিয়েছিল, সেও ব্রাহ্মণসন্তান।

– তাতে কী?

– তুই তো রাজনীতি করিস। সেখানেও তো নেতা-মন্ত্রীদের মধ্যে সেই বাঁড়ুজ্জে-মুখুজ্জে, ভট্‌চাজ্‌-চক্কোত্তিদেরই রমরমা। তা না হলেও তারা বদ্যি বা কুলীন কায়স্থ। এমনকি মুসলমান হলেও তারা খানদানি লোক।

– কে বলেছে? আর হলেও সেটা কাকতালীয় ব্যাপার।

ভূষণমাস্টার চায়ের গেলাসটা সশব্দে বেঞ্চে রাখতেই রঘু মিনমিন করে ওঠে, 'ভাঙলে পয়সা দিতে হবে কিন্তু।'

ফোঁড়ন কাটে একজন, 'বালী-সুগ্রীবে লেগেছে রে রঘু। তুই আর সাইড থেকে তীর মারিস না।'

কানাইয়ের ওই সবে মন নেই। ও ঝিম মেরে বসেছিল। কপালের রগ যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে ব্যথায়। শরীরেও বল নেই। রাস্তা থেকে আধপোড়া সিগারেট তুলে নিয়ে চেয়েচিন্তে আগুন ধরায়। কাল সদর হাসপাতালে রক্ত দিয়েছে, প্রতিমাসেই দেয়। দালালের কমিশন বাদে পেশেন্টপার্টির থেকে বোতল প্রতি সাতশ টাকা আয় থাকে। তার সঙ্গে আপেল, পাউরুটি আর একগ্লাস দুধ। দুধটুকু চায়ের দোকানে বেচলে আরও পাঁচ টাকা।

এদিকে তার স্যাঙাত নিতাই ফেলে দেওয়া বাটারটোস্ট থেকে কাদা মুছতে ব্যস্ত। গোটা তিনেক কুকুরের মনঃপূত হচ্ছিল না ব্যাপারটা। তাদের চাপা গরগর হঠাৎ প্রবল ডাকাডাকিতে বদলে গেল। বালী-সুগ্রীবে তখন সন্ধি হতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না, 'এ হেহেহে! রবিবার সকালটাও যে একটু শান্তিতে কাটাব, তার উপায় আছে?'

– এই আপদদুটো যেখানেই যাবে, সেখানেই উৎপাত! ওই নিতাই, যা ভাগ এখান থেকে।

তাড়া খেয়ে ওরা পার্কের দিকটায় এসে বসে। উত্তরে পিচরাস্তা, দক্ষিণে ভগ্নপ্রায় রায়বাহাদুরের বাড়ি, পূর্বদিকে ব্যায়ামসমিতি, এখন যা ছোটোদের খেলার পার্ক, পশ্চিমে মজা পুকুর।— এই নিয়ে 'হাটের-মাঠ'। একটা ন্যাড়া কৃষ্ণচূড়ার নীচে ওরা দুজন। একদল ছেলেমেয়ে পিটি করছিল পার্কে। নিতাইয়ের হাতে কাঠপিঁপড়ে কামড়েছে। দু-আঙুলে পিঁপড়েটা খুঁটে তুলে সেটি আর নিজের ফুলে ওঠা চামড়া ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। বাচ্চাদের দেখাদেখি কানাই হঠাৎ স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ডন-বৈঠক শুরু করে।

– জৈন মুন্দিরে পরব আছে আজ। হেব্‌বি খাওয়াবে। ব্যা'ম করে খিদা বাড়িয়ে লে বে।

রায়বাহাদুরের বাড়ির দিক থেকে পিচরাস্তার পথে বাগদীপাড়ার একদল মেয়ে-বৌ। দুই স্যাঙাতের কসরৎ দেখে খিলখিল করে ওঠে।

– উই দ্যাখ, গৌর-লিতাই লাচতে লেগেছে।

– গৌর-লিতাই, না জগা-মাধা দিদি?

– চুপ কর ছুঁড়ি। উই কেলেটা আমাদের তুলসীর পেতমপক্কের ভাতার লো!

ওদের হাসি যেন আর থামে না। তুলসী নামের মেয়েটি গম্ভীর মুখে পেরিয়ে যায় পথটুকু। বাগদীপাড়া এখান থেকে মাইলখানেক দূর। ওদের সমাজ আলাদা, ভালো-খারাপের হিসেবও। স্বামী, পতি, বর-এর চেয়ে অনেক বড়ো বাস্তব সেখানে 'ভাতার' শব্দটি। স্বামীর যদি ভাত-কাপড় জোটানোর সঙ্গতি না থাকে, বৌ-মেয়েরা চাইলে ঘর বাঁধতে পারে অন্যলোকের সঙ্গে। কেউ তাদের 'অসতী' বা 'নষ্টা' বলে না। হঠাৎ চোখদুটো জ্বলে ওঠে তুলসীর,– কানাইয়ের জন্য কম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাকে?

শিউপূজন রেলের গেটম্যান। দেশে বৌ-বাচ্চা আছে। তবে সাতহাজার টাকা মাইনে, তার ওপর রেলগেটের পাশে পাকা ঘর। কানাই প্রথমদিকে খুব ঝামেলা করত। আকণ্ঠ তাড়ি বা ধেনো গিলে রাতবিরেতে বেজায় হৈ-চৈ জুড়ত। লাইনের পাথর তুলে ছুঁড়তে থাকত দরজা-জানালায়।

– কাঁহে ইতনা হল্লা করতা হ্যায় বে?

শিউপূজনের গলা পেলেই নুন পড়ত জোঁকের মাথায়, 'হুজুর মাই-বাপ, আপনেরে কিছু বুলিনি খো। তবে উ শালীকে গাল না পাড়লে মুন জুড়ায় না।'

কানাই মাঝেমাঝেই বেধড়ক মার খেত শিউপূজনের হাতে। সেই শিউপূজনই আবার পার্সেল ঘরে ডেকে নিজের গ্যাঁটের পয়সায় 'ইংলিশ' খাওয়াত। বড়োভাইয়ের মতো বোঝাত, 'আ বে বুরবক, হামার ঘরে যদি হল্লা করিস, তোহ্‌কে তো পিটতেই হবে। নেহি তো হামাকে না-মর্দ বোলেগা লোক। কোই ইতনা পাগল হোতা হ্যায় ক্যা? হামার জিন্দেগিতে কি কোই দুখ নাই? হাম ক্যা তেরা মাফিক শোর মচাতা? কোই কাম-কাজ ঢুন্‌ড। অউরত ভি জুগাড় হোয়ে যাবে। তু কব সমঝ্‌বি?'

ও বোঝে না। ফলে, একবার মালগাড়ির তালা ভাঙার দায়ে রেলপুলিশের খপ্পরে পড়ে। দিনকতক হাজতে কাটিয়ে আসার পর থেকে এখন আর হৈ-চৈ করে না। তবু এক-একরাতে চোরের মতো হাজির হয়। চুপ করে চেয়ে থাকে ঘরখানার দিকে। রাত বাড়লে দেওয়ালে কান পাতে। একটু দূরে লাইনের ওপর বসে মিটিমিটি হাসে নিতাই। ছুটে এসে দু-চার ঘা বসিয়ে দেয় কানাই, 'আবার হাসতে লেগেছিস বে হারামি!'

মার খেয়ে নিতাই কাঁদে। কানাইও। গাছের কোটর থেকে তুলসীর রেখে যাওয়া দু-টুকরো মাছভাজা, কী গোটা চারেক হাতরুটি বা একডেলা গুড় পেড়ে আনে, নিজেদের পথে রওনা দেয়।

একদিন শেষ ডাউন ট্রেন যাওয়ার পর দুই স্যাঙাত অন্ধকারের আড়াল নিয়ে গুটিগুটি পায়ে আসছিল রেলগেটের দিকে। সবুজ লণ্ঠন হাতে একজনকে লাইন ধরে আসতে দেখে ওরা ভয়ে লুকিয়ে পড়ে, রেলপুলিশের মার স্মৃতিতে

টাটকা!

না, শিউপূজন নয়। এ অন্যলোক। ওরা দ্রুতপায়ে পেরিয়ে আসে বাকি পথটুকু। সেদিকে তুলসী যেন ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল, 'খাবি চ।'

অবাক হয় কানাই, 'আমার সতীন কি ঘরে নাই?'

– লক্‌সা... দেশে গিয়্যাছে উ। তুই চ ক্যানে।

পিছু পিছু নিতাইও চলতে শুরু করলে তুলসী চাপা গলায় দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে, 'এই শালা পোঁদেপোঁদে আসে ক্যানে? ম্যাগা, গন্ধে লাড়িভুঁড়ি বেরয়ানোর জুগাড়! তাড়া শালাকে।'

– উকে না লিলে আমুও যাব না।

– একলা শুয়ার ঠাঁই নাই, তার আবার শংকরা! ঘরে খাওয়ার থাল্ কিন্তুক দুট্যা বই তিনট্যালাই খো।

– ইর উসব ভ্যাজাল লাই। তুদের পাকা ঘর, মেঝ্যাতেই দিস।

ডাল, ভাত, বেগুনভাজা আর আলু-পটল দিয়ে বোয়ালমাছের ঝোল। কানাই তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল। বারান্দা থেকে নিতাই হঠাৎ 'হুহ্ হুহ্' গোছের শব্দ করতে শুরু করে।

– হনুমানের মতো হুঁপাছে ক্যানে পাগলাটা?

– উ কথা বুলে না। এমুন কর‍্যাই ডাকে। দ্যাখ গা, ভাত লিবে বুধ'য়।

নিতাইকে ভাত দিয়ে কুল করা যাচ্ছিল না। দেওয়ামাত্র গোগ্রাসে গিলে আবার ওই জান্তব শব্দ। তুলসী রেগে কাঁই, 'জম্মের খাওয়া খেচে গো! বাপের কালে জুটে নি কুনোদিন? পেট ফেটে মরবি যে র‍্যা।'...

দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মে ভূতুড়ে অন্ধকার। এ প্রান্ত থেকেও প্রান্ত ছুটে, হাঁফিয়ে, নেচে, লাফিয়ে চলেছে নিতাই। যতক্ষণ ঘুম না পায়, তা-ই করবে। কানাই সিমেন্টের বেঞ্চে চিৎপাত। পকেটে পয়সা ছিল, তবু মদ গিলতে ইচ্ছে করেনি। ঘর ফাঁকা পেয়ে তুলসীকে কাছে টানতে গিয়েছিল আজ। একরাশ গালমন্দ করেছে তুলসী, তারপর কেঁদেছে অনেকক্ষণ ধরে।

চোখের সামনে তারাভর্তি আকাশ। তুলসীর কথাগুলো কানে বাজছে তখনও। 'বদলি হোয়াছে উর। চার ইশটেশন দূরে চলে যেছি আমরা। মাঝরাতে মুততে উঠে তুকে দেখ্যাছে একদিন। কঠিন মার মেরাছে। হাতটা অ্যাখুনো টনটনায়। বুল্যাছে, আবার যদি দ্যাখে, তোকে-আমাকে দুজ্‌নাকেই কুপিয়ে রাত-তিনট্যার ফাস্ট-প্যাসেঞ্জারের তলায় দিবে। বেকার ভয় খাওয়ায়নি খো, সাহেবগঞ্জে থাকতি একজুনাকে ইয়াই কর‍্যাছিল। যে কটাক দিন আছি, ইদিকে আসিস না, না দিনে না রাতে। ভোলার নামে কিরা।'

ভ্যাপসা গরম। একফোঁটা মেঘও নেই আকাশে। বিড়ি ধরায় কানাই। ভোলার কিরা দিয়েছে তুলসী। ওদের একমাত্র সন্তান। জন্ম থেকেই ভুগত ছেলেটা। আজ জ্বর, কাল পেটখারাপ, একটা না একটা লেগেই থাকত। ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-মাদুলি, পাড়ার ডাক্তারের হোমিওপ্যাথি— কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না।

দিন কে দিন যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল ওর শরীরটা। শুধু বড়োবড়ো দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত। কী মায়াই না ছিল সেই চোখে! শেষে পেটে ঘা হল একটা। সদর হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলল, সে নাকি বড়ো কঠিন রোগ, অনেক খরচের ধাক্কা। পারলে নিজের জীবন দিয়েও কানাই তাকে বাঁচাত। ভোলার ওষুধ কিনতেই প্রথমবার রক্ত বিক্রি। তবুও শেষ রক্ষা হল না। মাত্র দু-বছর বয়সে-!

সময় চলে যায় ভাগীরথীর জলের গতিতে। পৌরসভার উদ্যোগে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসেছে বালুচর শ্মশানে। সেদিন তার শুভ উদ্বোধন। ক-মাস আগে নতুন জেটি চালু হয়েছিল শিবতলা ঘাটে। দু-খানা করে রসগোল্লা পেয়েছিল সবাই। আজও সেই আশায় কিনা কে জানে, নিতাই ওকে টানতে টানতে এখানে হাজির করিয়েছে।

চুল্লির দিকটায় বেজায় ভিড়ভাট্টা। নিতাইয়ের পাগলামির ভয়ে কানাই বসেছে একটু দূরে, ল্যাংটাবাবার কালীমন্দিরের চাতালে। সামনে ভাঙাচোরা হাঁড়িকাঠ। সেই থেকে নিতাই নিজের গলাটা সেখানে গোঁজার চেষ্টা করে চলেছে! কানাই কপাল চাপড়ায়, 'কাণ্ড দ্যাখ অবংটার! উই শালা, পরথ্‌ম দিনেই বউনি করাবি নাকি বে?'

মাইকের শব্দ কানে আসছে— 'বন্ধুগণ, নাগরিক সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বালুচর পৌরসভা যে সদা সচেষ্ট, এই বৈদ্যুতিক চুল্লি তার আরও একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, মাননীয় এসডিও সাহেব উপস্থিত হবেন, তাঁর হাতেই হবে শুভ সূচনা।'

গলাটা চিনতে পেরেছে কানাই। ভূষণমাস্টার, রঘুর দোকানে এভাবেই চেঁচায়। ও আপনমনে হেসে ওঠে, এই মাস্টার শালা নিজের বৌ-ব্যাটাকেও 'বন্ধুগণ' ডাকে বুধ'য়! গান-বাজনাও হবে, বক্তৃতার পিছনে তবলায় হাতুড়ি ঠোকার শব্দ।

এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছে। না, দুনিয়াটা আর অতটা খারাপ লাগেনা ওর। চাকরি পেয়েছে। হ্যাঁ, চাকরি। চুল্লির উদ্বোধনের দিন কানাই যখন হাতের তালু বেয়ে গড়ানো মিষ্টির রস চাটতে ব্যস্ত, তখনই ডাকল ভূষণমাস্টার। বলল, ওর জন্য নাকি কাজ আছে একটা। প্রথমটায় হকচকিয়ে যায়, আবার যদি ফাটকে ঢুকতে হয়?– সেসব কিছু নয়। চুল্লিতে লাশ ঢোকানোর লোক রাখবে পৌরসভা। জাতে বাগদী হলেও কানাই সাগ্রহে রাজি। সকাল নেই, রাত নেই, এক ওই খাওয়া-খাওয়া করে দশদিকে ছুটে বেড়ানো আর পোষাচ্ছিল না।

মাসে তিনহাজার টাকা মাইনে। পাঁচশ করে পার্টির চাঁদা দিতে হলেও যা থাকবে, তাই-ই বা কম কী? ভোট-টোট এলে গায়ে-গতরে খাটতে হবে এই যা। শ্মশানের পাশে ঘরও পেয়েছে একটা। এইটুকু জায়গা বালুচর, রোজ-রোজ ক'টা লোকই বা মরে? কাজও বিশেষ নেই।

ঝামেলা বাধল নিতাইকে নিয়ে। যতই হোক, শৌচ না করা লোকের সঙ্গে এক বিছানায় থাকা মুশকিল। তাই বলে এতদিনের স্যাঙাতকে ভাগিয়ে তো

দেওয়া যায় না! নতুন ঘরখানার সামনে ছাদ দেওয়া একটুকরো বারান্দা। কানাই সাফসুতরো করে মাদুর-বালিশও গুছিয়ে রেখেছিল। কিন্তু অবংটা থাকলে তো! ডালে-ভাতে যা রান্না হত, ওর জন্য রেখে দিত কানাই। কিন্তু সে ব্যাটা খেলে তো!

হাত ধরে টানলেও আসে না। ছিটকে পালিয়ে গিয়ে 'হুহ্ হুহ্' করতে থাকে। কথা নেই বার্তা নেই, একদিন কোত্থেকে এসে তোলা উনুনটা ভেঙে দিল! রাগের চোটে ঘা-কতক লাগিয়েও দেয় কানাই।

বহুদিন আগে শম্ভুগুনিন বলেছিল, একটা বয়সে নাকি নিতাই ভালো হয়ে যাবে। ঘোড়ার ডিম হবে! এই সেদিনই, ঘর ফাঁকা পেয়ে বিছানায় হেগে চম্পট দিয়েছে হারামজাদা। 'যা শালা, মর গা, কুত্তার পেটে কি ঘি হজম হয়?'

কিন্তু, ক-দিন পর থেকেই কানাইয়ের ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। চুল্লিতে লাশ ঢুকিয়ে রামের বোতল হাতে বসার সময়, বা এমনিই যে রাতগুলোয় কাজ থাকে না বিশেষ,– নদীর বাতাস যেন পাঁজর ভেদ করে ধাক্কা মারে বুকে।

– সবই দিলে ভগবান, শুধু ক-টা দিন আগে যদি দিতে! ভোলাটাও অমন বেঘোরে মরত না, তুলসীকেও ঘর ভেঙে ছুটে মরতে হত না।

ওর বাপ-মনটা কাঁদে, স্বামী-মনটা কাঁদে। পুরুষ শরীরটাও কষ্ট পায় খুব। যত রাগ গিয়ে পড়ে নিতাইয়ের ওপর। ও চাকরি পাওয়ার পর থেকেই রাতারাতি পালটে গিয়েছে সে ব্যাটার মতিগতি। সবসময় পালাই-পালাই ভাব। শুনুক না শুনুক, বুঝুক না বুঝুক, হারামজাদাটা সঙ্গে থাকলে কথা বলার মতো অন্তত একজনকে তো পাওয়া যেত!

ডাবওয়ালার বাঁহাতের মতো অনিশ্চিত জীবনে যারা অভ্যস্ত, দুঃখ তাদের কাছে দুর্মূল্য বিলাসিতা। তাদের মনের খাদে পলি জমতে সময় লাগে না। সম্প্রতি এক মেথরানি জুটেছে শ্মশানে। সধবা না বিধবা দেখে বোঝা যায় না। মাঝেমাঝেই কানাইয়ের রামের বোতলে ভাগ বসাতে আসে। মনেমনে গালি দেয়, মেয়্যা তো লয়, য্যান অন্য কিছু! মাগী নামে তারা, গতরে কালী আর মিজাজ যেন চামুণ্ডা!

একদিন দুজন মিলে বোতল-কতক গেলার পর তার বুকে হাত দিতে গিয়েছিল কানাই। ক্যাঁত করে তলপেটে লাথি কষিয়েছে তারা, 'শালোর পো, মাঙনায় ফুর্তি লিয়ার তাল? উ হবেক লাই। হয় পয়সা ফ্যাল, না তো বিয়্যা করে ঘরে তুল।'

কড়কড়ে পঞ্চাশ টাকা আর বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে ও তখন ঘরের পথে। ফর্সা হয়ে আসছে আকাশ। হঠাৎ কান ঘেঁষে একটা আধলা ইঁট বেরিয়ে যায়! আর একটু হলেই-! ঘরের সামনে নিতাই। মুখখারাপ করতে গিয়েও থেমে গেল কানাই, সে ব্যাটার চোখদুটোয় যেন আগুন জ্বলছে। সে আর একটা ইঁট হাতে তুলতেই ও নিমগাছের আড়ালে সরে আসে।

– ঢিল্যাচ্ছিস ক্যানে রে আপদচুদা? খিদা পেয়েছে?

মিনিটখানেক কোনো সাড়াশব্দ নেই। ও উঁকি মেরে দেখে নিতাই গায়েব!

পরের ভোটেও হাসতে হাসতে জিতল ভূষণমাস্টারের দল। খুব খাটুনি

গিয়েছে ক'দিন।– এলাকার মানুষজনের সামনে ও পৌরসভার কৃতিত্বে 'মূলস্রোতে ফেরা'র নিদর্শন বলে কথা! গোটা বালুচর চষতে হয়েছে কম করে তিরিশ-চল্লিশবার। বড়ো অদ্ভুতভাবে এই ক-দিনে একবারও নিতাইয়ের দেখা পায়নি। সে যেন আগে থাকতেই টের পেয়ে যেত কানাই কবে কোথায় যাবে। যাই হোক, ওর সাতশটাকা মাইনে বেড়েছে। এখন সত্যি-সত্যিই ভাবছে, হপ্তায় হপ্তায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা খসানোর চেয়ে মেথরানিকে পাকাপাকি ঘরে তোলাই ভালো। হাত পুড়িয়ে রাঁধতেও হবে না সেক্ষেত্রে। ওদিকে মেথরানির দাবি— একডজন রূপোর চুড়ি। টাকার দরকার, বেশ কয়েক হাজার।

টাকা রোজগারের সুযোগ এসে গেল খুব তাড়াতাড়িই। সন্ধে আটটা নাগাদ অফিসঘরে তালা দিয়ে চলে গিয়েছে ঘাটবাবু। এই সময়ের পর সাধারণত কোনো লাশপার্টি আসে না। মেথরানির শরীর খারাপ, কানাইও তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে বোতল খুলে বসেছে।

রাত বারোটা নাগাদ কয়েকটা মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা যায়। শ্মশানেই এসেছে মনে হচ্ছে। বাইরে এসে দেখে, তিনজন ষণ্ডামতো লোক আর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা মেয়ের লাশ। খটকা লাগে। পোড়াতে এসেছে, মোটর সাইকেলে? তাও আবার মাত্র তিনজন! লোকগুলোর মুখচোখও কেমন যেন! কালো জামা পরা লোকটা দুলেপাড়ার মিটিঙে এসেছিল না?

'ঘাটের লোক কই?' রীতিমতো ধমকের স্বর!– 'বডি আছে। পুড়াতে হবে।'

– মুশকিল হল। ঘাটবাবু নাই, অফিসঘরে তালা। ফর্‌মে নাম-ঠিকানা লিখ্যাতে হয়। ডাক্তারের কাগজ লাগে। ম্যালা ভ্যাজাল।

– কাগজ তোর গাঁড়ে দিব বাঞ্চোত।

আর একজন থামায়, 'আহ্ রমেশ, আমাকে কথা বলতে দে।... না ভাই, কাগজ আনা যায়নি। ডাক্তারের দোষেই মরেছে কিনা। না হলে সামান্য জ্বরে কি আর এই হাল হয়?'

লোকটি মোলায়েম গলায় কথাগুলো বলল। কানাই আরও একবার লাশটা দেখে।– চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। গলায় দড়ির দাগ। কানের পাশে জমাটবাঁধা রক্ত। হাতে কালসিটে। তার ওপরে এই রমেশ লোকটার মুখে টাটকা আঁচড়।– জ্বর না ছাই!

ও কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। দ্বিতীয় লোকটি হঠাৎ চার-পাঁচটা হাজার টাকার নোট ওর বুকপকেটে গুঁজে দেয়, 'কাগজপত্রের ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিও ভাই। আমাদের তাড়া আছে।'

ভয় ওকে নড়তে দিচ্ছে না। আবার পকেটের টাকাগুলো বলছে,– তাড়াতাড়ি কাজে লেগে পড়। উভয়সংকট। কী করি, কী না করি ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ লোডশেডিং! ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

– ধুর শালা, কারেন গেল। কতক্ষণ লাগবে?

– এখুনি চলে আসবে, টেনসন লিবেন না।

কানাই কথাটা বলল বটে, কিন্তু মনেপ্রাণে চাইছে, কারেন্ট যেন কিছুতেই না আসে।

– ভূতের মতো বসে থাকব নাকি? হ্যারিকেন, মোমবাতি কিছু নাই?

মোমবাতি, দেশলাই নিয়ে ঘর থেকে বেরোতেই কানাই অবাক। নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে নিতাই! কোমরে কোনোমতে একটা বস্তা জড়ানো। নদীতে ডুব দিয়েছিল বোধহয়। জল ঝরছে সারা শরীর থেকে। দ্বাদশীর চাঁদ তার মাথার ঠিক ওপরেই। চকচক করছে জটা। অন্ধকারেও চোখ ধাঁধিয়ে যায়!

রমেশ নামের লোকটি চাপা গলায় ধমক লাগায় তাদের দলের আর একজন-কে, 'আগেই বলেছিলাম, কেন এসব লাফড়ায় যাচ্ছ, পাথর বেঁধে গঙ্গায় ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।'

– তোর যেমন বুদ্ধি! দড়ি পচে লাশ ভেসে উঠলে? হাজারটা ফ্যাকড়া।

– গঙ্গায় ফেললে ফ্যাকড়া হত, আর পুড়ালে হবে না?

– একবার ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢুকলে কি বুঝা যায়, ছাই-টা মানুষের না কুত্তার? বোধবুদ্ধি তো কিছুই নাই,– জেনে রাখ, বডি না পেলে মাডার কেস হয় না।

– কিন্তু, এই ডোম-মালটা সব টের পেয়ে গেল তো।

– ঘাবড়াচ্ছিস কেন, মেশিনটা একবার চালাতে দে না। এক চুল্লিতে দুটো বডি ঢুকবে।

চাপা গলায় কথা বলছিল লোকগুলো, ওকে খেয়াল করেনি। রমেশ-লোকটি ওকে দেখতেই সটান উঠে দাঁড়ায়, 'ক্ষ্যাপাদা-'

যেন পালাতেও পারছে না কানাই। খটাস করে একটা শব্দ হয়, হাতে-ছোরা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে লোকটি। ঘাম ঝরছে রগ বেয়ে, পেচ্ছাপ পাচ্ছে খুব। কানাই এদিক-ওদিক তাকায়, হঠাৎ অন্ধকার চিরে 'হুহ্ হুহ্' করতে করতে ছুটে আসে নিতাই। লোকটির মাথায় বেলচা চালিয়ে দেয়!

কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে যায় দলটি। সম্বিত ফিরতেই কানাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'নিতাই ভাগ।'...

ভোর সাড়ে তিনটের ফাস্ট প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম ছেড়েছে কিছুক্ষণ আগে। আজকের মতো ডিউটি শেষ। ধীর পায়ে ঘরের পথে শিউপূজন। কিন্তু লাইনের ধারে ওই জটলা কীসের? কৌতূহলে এগিয়ে যায় সেদিকে।

– ইতনা ভিড় কিউ? ক্যা হুয়া?

– টেরেনে কাটা পড়েছে। দু'টুকরা হুয়েও মরেনি গো এখুনও! হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে শেষ লিশ্বাস লিচ্ছে।

কাছাকাছি আসতেই শিউপূজনের মাথা ঘুরে যায়, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায় ঘরের দিকে।– 'তুলসীরে...'

*****

'ঋত্বিক', ২০১৫

বানভাসি

তিন ঘণ্টা হয়ে গেল। বাস তো দূরে থাক, একটা ট্রেকার অবধি আসছে না। নদী-বাঁধের গেট খুলতেই মাইলের পর মাইল ডুবেছে মাত্র একবেলায়। হোস্টেলে একতলার ঘরগুলোয় প্রায় ফুটখানেক জল। যাদের বাড়ি ফেরার উপায় নেই, দোতলায় সবার মালপত্র ঠেসে, বাকি কয়েকটা ঘরে কোনোমতে গাদাগাদি করে আছে। বৃষ্টিও হচ্ছে বটে এবার! টানা আট-দশদিন কখনও ঝমঝম, কখনও টুপটাপ, কখনও সোঁ-সোঁ ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারায়।

গণেশ বুদ্ধি করে জামাকাপড়ের ব্যাগ আনেনি। জলে ভিজে এতক্ষণে নির্ঘাত কেজি কতক ওজন বেড়ে যেত। হোস্টেল থেকে বাসস্ট্যান্ডের পথে হাঁটুজল। তবে বাসরাস্তা এখনও ডোবেনি।

রাস্তার দু-পাশে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে প্রায় তিরিশ-চল্লিশটি বানভাসি পরিবার। কোনোমতে দু-একটা বাঁশ-টাঁশ পুঁতে তাঁবু খাটানোর চেষ্টা করছে কয়েকজন। অন্য সময়ের তুলনায় ভিড় প্রায় চারগুণ। কিন্তু এই চত্বর যেমন সরগরম থাকে, আজ তার সিকিভাগও নেই।

মাটিতে শাবলের আঘাতের শব্দ, ভাঙা ভাঙা সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা, চাপাস্বরে একটানা বিলাপ— চারপাশটা ভীষণ থমথমে। দুশ্চিন্তা হয় গণেশের। ওদের পাড়া প্রায় নদীর লাগোয়া, আরও মাইল-পঁচিশ দক্ষিণে। না জানি কী দশা হয়েছে! বাড়িটা? বাবা-মা?

প্রায় আর্তনাদ করতে করতে একটা বাস আসছে। পেটে অন্তত শ-খানেক লোক। থামতেই ও দ্রুত ছাদে উঠে পড়ে। অসহায়ের মতো ভেজা ছাড়া কোনো উপায় নেই এখন। সামনে ঝাঁকা ভর্তি মুরগি। ভেজা পালকে বুড়ো শকুনের মতো লাগছে। পচা গন্ধ, বাচ্চার কান্না। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বমি করছে একজন। গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে গণেশের। ধুর, যা হওয়ার এতক্ষণে হয়েই গিয়েছে হয়তো, ও গিয়েই বা কী করবে?

ওদের বাড়ির ঠিক সামনে শালকাঠের লম্বা খুঁটি।– পুরনো, ছেঁড়া হাতে-বোনা সোয়েটারের মতো বিদ্যুৎ, টেলিফোন আর নবতম সংযোজন কেবল টিভির তার জট পাকিয়ে ঝোলে। বাড়ির গা ঘেঁষে কাঠ আর করোগেটেড টিনের তৈরি একটা তিন ফুট বাই চার ফুট দোকানঘর। এলাকার কথ্যভাষায় 'প্রমোদের ঢপ'।

প্রমোদ গত চল্লিশ বছর ধরে তার একচিলতে দোকানে সূঁচ, সুতো, কাঁটা, হাতুড়ি, আঠা সম্বল করে পাড়ার জীবনসংগ্রামের ছেঁড়া-ফাটায় তাপ্পি মেরে চলেছে। ঢালাই করা রাস্তার উলটো দিকে মধু বিশ্বাসের 'ফ্যান্সি জেন্টস সেলুন'।

কিছুটা এগিয়ে উঁচুপুল। শ-খানেক বছর আগে প্রাসাদ-জাতীয় কিছু একটা ছিল হয়তো, তার এখন অর্ধেকটা মাটির গর্ভে। যেখানে বর্তমানের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, অতীত নিয়ে লম্ফঝম্ফ সেখানে বিলাসিতা। ফাঁক-ফোকরগুলো নমো-নমো করে বুজিয়ে ওই 'একদা-প্রাসাদে'র ওপর দিয়েই চলে গিয়েছে রাস্তা— উঁচুপুল।

সেদিন খেলার মাঠ থেকে আমবাগানের ভিতর দিয়ে ফিরছিল ওরা। সাদা জামা, ফ্যাকাশে নীলপ্যান্ট, গণেশের গায়ে সেদিন স্কুল-ড্রেস। এক-একটা বোতাম এক-এক রঙের, প্যান্টটাও খাটো হয়ে গিয়েছে খানিকটা।

সরস্বতী পুজোয় মুকুলধরা থেকে জামাইষষ্ঠীর আগে গাছ খালি করা অবধি সময়টা বাদে এই আমবাগানটা আসলে মুক্ত শৌচালয়। পথ চলতে হয় দেখে-শুনে। ওদের দলের একটা ছেলে সুর করে ছড়া কেটে ওঠে, 'থুঃ হালায় থুঃ। কুন আবাগী হাইগ্যা গিছে যেদিক-সেদিক গু!'

একটু আগে এরাই সুবলদা আর দিদিকে নিয়ে ক্ষেপাচ্ছিল ওকে। আগে খারাপ লাগত। ততদিনে গা-সওয়া। সুবল ওর পিসতুতো দাদা। পিসি-পিসেমশায়কে গণেশ কোনোদিন দেখেনি। ছোটোঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর থেকে সুবলদা ওদের বাড়িতেই থাকত।

বছর তিনেক আগে সে আর দিদি হঠাৎ নিখোঁজ হয়। যখন থানা-পুলিশ, ক্লাব, স্টেশন চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে বাবা, গণেশ ভেবেছিল দিদি নির্ঘাত বম্বে গিয়েছে। নায়িকা হবে নিশ্চয়। সুবলদা কোথায় গেল? নিজের বুদ্ধিতে সে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি। কিন্তু, ওদের পাঠানো ইনল্যান্ড লেটারটা আসার পর বাবা আট-দশদিন মরার মতো পড়েছিল। সুবলদার আমেদাবাদের কাপড়কলে চাকরির খবর ছিল চিঠিতে। ওরা বিয়ে করেছে। মা সারাদিন কাঁদত তখন, তবে মুখে আঁচল ঠুসে। কান্নার শব্দ যেন পাড়া-পড়শির কানে না যায়।

বিকেল নেমে আসে। কাছে পিঠের ঝোপঝাড় থেকে শেয়াল ডেকে ওঠে বার-দুয়েক। একদল কুকুর প্রবল চিৎকার করতে করতে সে দিকে ছোটে। বেশ রেগে আছে ওগুলো। এই বিশ্বে বোধ হয় গণেশই একমাত্র প্রাণী, যে ঠিকমতো রাগতে জানে না। রাগ হলে নিজের অজান্তেই কখন যেন ভিজে যায় চোখ দুটো-!

দু-পাশে চাষ-জমি। সরু জাতীয় সড়ক যেন মাঝ বরাবর আলের মতো চলে গিয়েছে। তবে এখন ডানদিকে যত দূর নজর যায়– ঘোলাজলের ঢেউ। জমি ভাসিয়ে ছলকে ছলকে উঠছে রাস্তায়। ছুঁয়ে যাচ্ছে বাসের চাকা। বাঁদিকটা এখনও শুকনো। কালো মেঘের ফাঁকফোকর বেয়ে চুঁইয়ে পড়া সূর্যের আলোয় বন্যার জল আর সোনালি ফসল,– দুই ভিন্ন রঙে ঝকঝক করছে রাস্তার দু-দিক।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে বাসটা থেমে আছে। সামনে আরও তিরিশ-বত্রিশটা

বাস, ব্রেকার। উৎকণ্ঠার ছেঁড়া-ছেঁড়া সংলাপ কানে আসে। গণেশের যেন কোনো বিকার নেই।

দিদি বাঁচল না বেশিদিন। এই ঘোর বাস্তবে ওর দুঃখ পাওয়া উচিৎ নাকি স্বস্তি, বহুদিন বুঝে উঠতে পারেনি। সুবলদাকেও ভালো ছেলে হিসেবেই সবাই জানত। কিন্তু, কেন যে-?

মা আর স্বাভাবিক হতে পারেনি। এখন প্রায় মনোরোগীই বলা চলে। মুখের কথা বা ভাষা, কোনোটিই আর মাতৃসুলভ নেই। এই তো, বছর তিনেক আগে সেদিন মৌমিতার সঙ্গে ওকে রাস্তায় দেখতে পেয়েছিল। তারপর ঘরে ঢুকতেই উন্মাদের মতো ছুটে এসে নিজের পেটে কিল মারতে শুরু করে!– 'আমাকে বাঁজা করে পাঠাওনি কেন ভগবান? ফুর্তি মারছিলেন নবাবজাদা! রক্তের ধারা যাবে কোথায়?' ও সেদিন নিঃশব্দে হোস্টেলে ফিরে আসে। কান্না পাচ্ছিল খুব। এ যন্ত্রণা বড়ো লজ্জার।

মৌমিতা মজুমদারবাড়ির মেয়ে। থাকে কলকাতায়। ছুটি পড়লে মাঝেমাঝে দেশের বাড়ি বেড়াতে আসে। ছোটোবেলায় সমস্যা ছিল না কিছু, দিব্বি বন্ধুত্ব ছিল। বড়ো হতেই হাজারটা যদি-কিন্তু ভিড় করতে শুরু করে। তখন ও নিজেও কি আগের মতো অত সহজে যেতে পারত ওদের বাড়ি? মৌমিতার পাশে যতবার নিজেকে বসিয়েছে,– মালি, ড্রাইভার বা দারোয়ানের বেশি কিছু মনে হয়নি।

মাস তিন-চারেক আগে একদিন ঝোঁকের মাথায় বাসস্ট্যান্ডের টেলিফোন বুথ থেকে ওদের কলকাতার বাড়িতে ফোন করে বসে। ফোন তুললেন মৌমিতার বাবা। ধমক-ধামক কিছুই ছিল না তাঁর গলায়, তবু 'হ্যালো' শুনেই বুক ধরফর করে উঠল। বহু কষ্টে বলল, 'মৌমিতা আছে?'

– তুমি কে বলছ?

– বন্ধু।

– বেশ, বন্ধু যখন, তোমার একটা নাম নিশ্চয় আছে?

সাহসের ভাণ্ডার নিঃশেষিত, ঢোঁক-ঢোঁক গিলে কোনো মতে বলে, 'আমি, মানে, প্রাণেশ বলছি।'

– এই নামে তো ওর কোনো বন্ধু নেই। ... তুমি কি হালদারবাবুর ছেলে গণেশ? দাঁড়াও, ওকে ডেকে দিচ্ছি।

– না না, আমি গণেশ কেন হতে যাব? আমার বাড়ি তো– ইয়ে, গড়িয়ায়।

খটাস শব্দে ফোনটা নামিয়ে দেয়। নিজের বোকামির জন্য নিজেকেই থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে। মস্ত ভুল হয়ে গেল,– গড়িয়াতেই ওদের বাড়ি।

সবকিছুর জন্য দায়ী ওই দিদি আর সুবলদা। ওদের ঘটনাটার পর থেকে ধীরে ধীরে নিজের পরিচয়ই যেন গণেশকে পরিচয়হীন করে দিয়েছে। বাড়ির মধ্যে বাবা-মায়ের অস্বাভাবিক জীবন, আর বাড়ির বাইরে মাঝেমধ্যেই পড়শিদের টিপ্পুনি।– যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাজা রেখেছে ক্ষত।

ইদানীং এক-আধবার সন্দেহ হয়, বিষয়টা আদৌ কি কোনো ক্ষত? পাড়ায় ঢুকলে প্রশ্নটা বড্ড জ্বালাতন করে। তার চেয়ে হোস্টেল ঢের ভালো। এখানে কেউ জানেও না ওর কোনো দিদি ছিল।

অনেক চেষ্টাতেও বিষয়টা গোপন রাখা যায়নি। অন্যের হাঁড়ির খবর জোগাড়ের ব্যাপারে দুঁদে সাংবাদিকও মফস্বলের মানুষজনের সামনে শিক্ষানবিশ মাত্র। সেখানে 'ভাগ্নে চাকরি করতে দিল্লি গিয়েছে' আর 'মেয়ে মামাবাড়িতে'— এমন কাঁচা দুটি মিথ্যে কতদিন আর পাড়াশুদ্ধ লোকের কৌতূহলের মোকাবিলা করতে পারে?

অযাচিত সহানুভূতির অন্ত ছিল না কিছুদিন।– 'আইবুড়ো মেয়ে পেটের শত্তুর', 'দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলেন হালদারদা', ইত্যাদি। তখন বাড়িতে লোকজন এলেই গণেশ প্রমোদ অথবা নিমাইয়ের দোকানে পালিয়ে যেত। মুখ কালো করে আসতে দেখলে তারাও ছোটো একটা টুল বা মোড়া এগিয়ে দিত। ওর দিদির প্রসঙ্গ তুলত না কখনও।

বাস আর যাবে না। উঁচু রাস্তা বাঁধের মতো একপাশের জল আটকে রেখেছিল। আড়াআড়ি খাল কাটা হয়েছে। আচমকা বাঁধ ভাঙলে যেমন হয়, খরস্রোতা জল প্রবল বিক্রমে বাঁদিকে ছুটছে। একলাফে খালটা ডিঙিয়ে আসে গণেশ। এখনও প্রায় দশ মাইল। বাকি পথটা হাঁটা ছাড়া গতি নেই।

ওদের পাড়া থেকে স্কুল প্রায় একঘণ্টার হাঁটাপথ। এদিকে বাড়িতে সাইকেল মাত্র একটা। সকালে টিউশন পড়াতে যায় সুবলদা। তার কলেজের তাড়া, বাবার কাজে যাওয়ার তাড়া, ওর ভাগ্যে আর সাইকেল জোটে না।

শুধু রবিবারগুলো যেন মুক্তির বাতাস। উঁচুপুল পেরিয়ে লাল মোরামের রাস্তা ধরে সাঁইসাঁই উড়ে চলা। প্রায় পাঁচ মাইল গিয়ে বাঁ-হাতে বাজপড়া নিমগাছ রেখে ডানদিকের ঢালু রাস্তায় নেমে পড়া। বিঘেকতক জমিতে কিছু আম-কাঁঠালের গাছ। তারপর একচিলতে মাঠ পেরিয়েই ধবধবে সাদা বালি। সেখানে আর সাইকেল চালানো যায় না। ধীর পায়ে নদীর ধারে পৌঁছানো।

নদীর কাছে এলেই মৌমিতার কথা মনে পড়ে। আসলে ক্ষীণকায়া নদী ঠিক যেন মৌমিতার কপালে এলিয়ে পড়া চুলের মতো বাঁক নিয়েছে ওখানে। শুধু মাঝেমাঝে মাছ ধরার বা গঞ্জে তরি-তরকারি নিয়ে যাওয়ার আনমনা দু-একটা ডিঙ্গিনৌকা ছাড়া জায়গাটা একদম নির্জন। ওখানে এলেই ওর মনখারাপ হয়। মনখারাপের নেশা আছে একরকম, হয়তো সে টানেই ছুটে আসে বারবার।

একদিন মৌমিতাও গিয়েছিল ওর সঙ্গে। সে তখন সদ্য সালোয়ার ধরেছে। নদীর সামনে একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে সে স্মিত হাসে, 'ঠিক বলেছ। এই জায়গাটায় সত্যিই খুব মনখারাপ হয়।'

একই বয়স, হয়তো দু-এক বছরের ছোটোই, তবু তাকে হঠাৎ যেন বড়ো-বড়ো লাগে। সন্ধে হয়ে এসেছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসা শাঁখের শব্দ যেন

ক্লান্ত অবসন্ন চাষিবউয়ের মতো ডুব দিচ্ছে নদীর বুকে। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে ছিল ওরা।

'এই যে ম্যাডাম, এখানে এসব চলবে না।'

চার-পাঁচজন বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে। কাউকেই চেনে না গণেশ। কোনোদিন দেখেওনি।

'কী বলতে চান?' মুখ খুলল মৌমিতা।

– সেটাই তো বললাম। এখানে বসে লটরপটর করায় নিষেধ আছে।

– জাস্ট্ শাট-আপ! আমরা তেমন কিছুই করছি না। অ্যান্ড... হু আর ইউ টু ডিক্টেট্ হোয়াট ইজ টু বি ডান অ্যান্ড হোয়াট নট্?

অন্য আর একজন হেঁ-হেঁ করে ওঠে, 'যাঃ শালা, এ আবার ইংলিশ ঝাড়ছে! আবে বিশু, তুই তো মাত্র সাঁইত্রিশ পেয়েছিলিস মাধ্যমিকে।'

হীনম্মন্যতায় কিনা কে জানে, মৌমিতাকে ছেড়ে গণেশের দিকে এগোয় বিশু-নামের ছেলেটি।– 'মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি মারাতে এসছিস চুদির ভাই?'

রোগা লিকলিকে শরীরে কোনোকালেই শক্তি বিশেষ ছিল না। ধাক্কা খেতেই ও ছিটকে পড়ে।

খুব ভয় করছিল তখন। অবশ্য, বেশি দূর গড়ায়নি ব্যাপারটা। লগি ঠেলে ঠেলে পাড় ঘেঁষে উলটো পথে ফিরছিল চাষিদের একটা নৌকা। তারা আওয়াজ তুলতে ছেলেগুলো পালিয়ে গিয়েছিল।

রাস্তায় এখন হাঁটুজল। পথ চলা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে যেন। জলে ভিজে নরম হয়ে যাওয়া পায়ের চামড়ায় ছোটোছোটো ইঁট-পাথরের কুচি যেন পেরেকের মতো বিঁধছে।

মৌমিতার বাবার নির্দেশ-মতো ঘটনাটা আজ অবধি কাউকেই ও বলেনি। অবশ্য, বলার লোকই বা কোথায় চারপাশে? সেদিন মজুমদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে ও অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়।

বৃথা আশা বা অবাস্তব স্বপ্ন ভাঙলেও কষ্ট পায় মানুষ। তখন অনেকেই খড়কুটো আঁকড়ে ধরে অসহায়ের মতো। অথবা আশ্রয় খোঁজে গান-কবিতা মন্ত্র বা কাঁসর ঘণ্টার শব্দে। গণেশ কয়েকদিন আগে পড়া ওহমের সূত্র অদ্ভুত ভাবে মনেমনে আওড়াতে থাকে! 'উষ্ণতা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহীর বিদ্যুৎপ্রবাহ তার দু-প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক। ... উষ্ণতা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা...।'

কষ্ট হচ্ছিল। বুঝতে বাকি ছিল না– সেদিনই শেষ। বাড়ির বাইরে আসতেই ভিতরে মৌমিতার সঙ্গে তার মায়ের কথোপকথন ওর কান এড়ায়নি।

– হাজারবার বারণ করেছিলাম। এবার হল তো?

– আহ্ মা, এতে ওর কী দোষ?

– চুপ কর। নাক টিপলে দুধ বেরোয়, সব বুঝে বসে আছিস! ওদের

ফ্যামিলিতে যেসব নোংরা নোংরা ব্যাপার হয়, তুই জানিস না? সেই বাড়ির ছেলে, কী আর হবে? ওই ছেলেগুলো নির্ঘাত ওরই বন্ধুবান্ধব।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে কান্না যেন থামতে চায় না! 'উষ্ণতা... দু-প্রান্তের... পার্থক্যের... সমানুপাতিক...'

হঠাৎ আপনমনে চেঁচিয়ে ওঠে গণেশ, 'না।'

জলের মধ্যে জেগে থাকা একটুকরো জঙ্গল। মেটে রঙের হাঁস মুখে নিয়ে সাঁতরে সেদিকে যাচ্ছে একটা শেয়াল। ছপ-ছপ শব্দ হচ্ছে। 'সেই বাড়ির ছেলে'– কেন ও সেই বাড়ির ছেলে? কলকাতার কলেজে সুযোগ পেলেও পড়তে পারেনি। ওখানে হোস্টেলে থাকার খরচ অনেক। এক দূর-সম্পর্কের কাকার সঙ্গে কথা বলেছিল বাবা। কলেজ শুরুর দিনকতক আগে হাজিরও হয়েছিল ব্যাগপত্র নিয়ে। কিন্তু, একদম শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেন তিনি, 'বুঝতেই তো পারছ, বাড়িতে দু-দুটো উঠতি বয়সের মেয়ে। আজকাল আত্মীয়স্বজনকেই বেশি ভয়।'

ততদিনে অ্যাডমিশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্কুলের এক মাস্টারমশায় বলে-কয়ে এই কলেজে ব্যবস্থা না করিয়ে দিলে একটা বছর নষ্ট হত।

...

এখানে জল প্রায় ঊরু-সমান। দাঁড়িয়ে মিনিট দুয়েক জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছিলল গণেশের। বিড়ি ধরাল। বড়ো বিস্বাদ লাগে ধোঁয়ার স্বাদ। দু-টান মেরেই আবার চলতে শুরু করে।

নদীর দিকের পাড়াগুলো সব ভেসে গিয়েছে। গলির মুখে-মুখে বালির বস্তা দিয়ে, ইঁট-সিমেন্টের অস্থায়ী দেওয়াল তুলে বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এ পাড়ার লোকেরা। গণেশ বুঝতে পারছে, এ পণ্ডশ্রম। জলের তোড় এলে এইসব বাঁধ মিনিট দশেকের বেশি টিকবে না। আর তাছাড়া বন্যার জল তো অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নয়, যে শুধু বড়ো রাস্তা দিয়েই চলে। বাড়ির প্রাচীর ফাটিয়ে, পুরসভার ড্রেন উপচে ছুটে আসবে মোঙ্গলদস্যুর মতো।

উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় আজ কারও চোখে ঘুম নেই। রাস্তার জল গোড়ালি-ডোবা হতেই শাঁখ-কাঁসর বাজিয়ে সতর্ক করা হবে সকলকে। অন্যদিন প্রমোদদার নজর থাকে জুতোর দিকে, নিমাই খোঁজে চুলের নতুন ছাঁট, মাস্টারমশায় হিমাদ্রিবাবু দেখেন সামনের লোকটির বিদ্যে-বুদ্ধি, এল.আই.সি.এজেন্ট দিলীপ সাহা জেনে বেড়ায় এ মাসে কার কত মাইনে বাড়ল। আজ তারা সবাই এক পঙক্তিতে। সবার নজর এই নরক ছুঁয়ে আসা ঘোলাজলের স্রোতের দিকে।– রাতের অন্ধকারে যা কুচকুচে কালো।

বাড়ির ছাদে ত্রিপল টাঙিয়ে যতটা সম্ভব মালপত্র মজুত করা হয়েছে। তার মধ্যেই আবার তিনটি মানুষের থাকা, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। কাজকর্ম শেষে গণেশ এতক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়েছিল মজুমদারদের বাড়ির দিকে। পরীক্ষার পরের

ছুটিতে মৌমিতা এসেছিল। ট্রেন-বাস বন্ধ, ফিরতে পারেনি আর। ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না, এই বিষয়ে আর ভাববে না। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসতে না আসতেই হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ! চমকে ওঠে গোটা পাড়া। বাবার যেন কোনো বিকারই নেই। নিজের মনে আউড়ে ওঠেন কথাগুলো, 'চুনের গুদামে জল ঢুকেছে। বোধ হয় উড়েই গেল।'

বাড়ি-বাড়ি শাঁখ বাজতে শুরু করেছে। তার মানে এবার ঘর-দোর ভেসে যাওয়ার পালা। জল ঢুকছে। একটা একটা করে ডুবছে ছাদে ওঠার সিঁড়ির ধাপগুলো। কাছে-দূরে গরু ছাগল মানুষদের আর্ত হাহাকার।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যায়। এরই মধ্যে কার্নিশ ছুঁয়েছে জল। ডুবেছে গোটা পাড়াটাই। শুধু উঁচুপুলের লাল মোরাম এখনও চকচক করছে দিনের আলোর ছোঁয়ায়।

চারপাশ ভাসছে, শুধু খাওয়ার জল নেই। বাড়ির টিউবঅয়েল ডুবেছে। বেশকিছু পরিবারের মতো ওরাও এখন উঁচুপুলে। বারবার পকেট-রেডিওর কান মুচড়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া শব্দ খুঁজছেন মাস্টারমশায় হিমাদ্রিবাবু। কোলাহল থিতিয়ে গিয়েছে অনেকটা। লাগোয়া ক্লাবঘরে বারোয়ারি উনুন। ভেজা কাঠ পোড়ার গন্ধ আর লাগাতার চিটপিট শব্দে পরিবেশ আরও যেন থমথমে। পাড়ার অলিগলিতে ছোটোছোটো নৌকা। কোনো দৃশ্যই তেমন করে দাগ কাটছে না গণেশের মনে। বড়ো একটা নৌকা এগিয়ে আসছে এদিকে, সামনে দুজন পুলিশ।

'মহাদেব হালদার নামে এ পাড়ায় কেউ আছে? মহাদেব হালদার?'

কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা আতঙ্কিত মনে ওর বাবা এগিয়ে যায়।

– সুবল বিশ্বাস নামের কাউকে চেনেন? বডি পাওয়া গিয়েছে। পকেটে ঠিকানা ছিল। মাঝরাতে চুন-গুদামের দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়েছিল।

জলে মুখ থুবড়ে পড়ল দাসবাড়ির প্রাচীর। স্রোতে ছিটকে আসা একটা শোলমাছ পায়ের কাছে লাফাচ্ছে। গণেশের মুখে কোনো কথা নেই। এখন কি তাহলে অশৌচ? মা হঠাৎ চিৎকার করে কাঁদছে। পাঁচ-ছ-জন মহিলা তার কাছাকাছি।

– পাপের শাস্তি একদিন না একদিন তো হবেই।

– কেঁদে আর কী করবে বলো, সবই কপাল।

– গিয়েছিলি মুখে কালি দিয়ে, এই খরা-বন্যায় আবার কোন মতলবে হাজির হচ্ছিলিস, কে জানে বাবা!

হাজার চেষ্টাতেও রাগ হচ্ছে না। গণেশ অবাক হয়ে অনুভব করে,– রাগ নয়, ঘৃণা নয়, শুধু একটা ঝিমধরানো মনখারাপ পড়ে আছে ওর স্মৃতি জুড়ে! সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে উঠছে কলেজ থেকে ফেরার পর সুবলদার ক্লান্ত, অবসন্ন মুখ। সুবলদার সঙ্গে ওর নিজের চেহারার মিল অনেক। সাইকেলে চড়ার ধরনও অনেকটা এক। ত্রিকোণমিতি ওরও খুব প্রিয় বিষয়। বুক ভারী হয়ে ওঠে

গণেশের।

ও ক্লাবঘরের ছাদে। হঠাৎ মনে হল, এই বোধ হয় শেষ মুহূর্ত। সুবলদার মতো ও-ও হয়তো-! খোলা আকাশ চোখের সামনে যেন ছায়াছবির পর্দা। স্মৃতিতে ধরে রাখা হাজারটা দৃশ্য আর চেনা মুখগুলো একে একে ভেসে উঠছে।– উঁহু, এরা সব কেজো ধান্দায় ঘুরে বেড়ানো মেজো আর সেজোদের দল। এরা নয়। তাহলে? পর্দার মুখগুলো যেন জীবন্ত চরিত্র হয়ে আসা-যাওয়া করছে, কিন্তু, দু-দণ্ড থিতু হওয়ার আগেই উড়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

আর কোনো চরিত্র নেই? কোনো দর্শক? কেউ নেই? এই একুশবছরের জীবনের অর্জন? ওকে কেন্দ্র করে বদলে যাচ্ছে চারপাশ। এক্ষুণি যা ছিল মঞ্চ, নিমেষে রূপ বদলে তা হাসপাতাল। আবার পলক ফেলতেই হাসপাতালের বিছানা যেন রঙ্গমঞ্চ! কাল্পনিক ই.সি.জি.-যন্ত্রে সূচকের বেনিয়ম ওঠানামা। মনগড়া ডাক্তার-নার্সের চিন্তিত মুখে ছোটাছুটি। মঞ্চে কোনো দ্বিতীয়জন নেই। তবু সেই জানা পরমক্ষণকে অহেতুক বিলম্বিত করার কী মরিয়া প্রচেষ্টা!– এক ক্লিশে ক্লাইম্যাক্সের নিযুত বা কোটিতম প্রদর্শন।

দরজার মুখে সুবলদা দাঁড়িয়ে। আর ঠিক যেখানে ছায়ার গভীরে মেঘ নেমেছে,– ওই তো, প্রথমবার শাড়ি পরে স্কুলের পথে দিদি। গণেশ নিঃশব্দে আবৃত্তি করতে থাকে ওর মনখারাপের টোটকা, ‘উষ্ণতা... অপরিবর্তিত...।’

জল বাড়ছে। রেডিওর খবর শুনে হিমাদ্রিবাবু বললেন, আজকে ফারাক্কা-বাঁধের আরও একখানা গেট নাকি খুলেছে।

আরও একটা নৌকা। মনে হচ্ছে পাড়ারই লোক। হ্যাঁ, পরিবারের অন্য লোকজনের সঙ্গে মৌমিতাও আছে নৌকায়।– এই বছর-খানেকে আরও বেশি নারী হয়ে উঠেছে যেন সে।

দিগন্তে দৃষ্টি ভাসিয়ে দেয় গণেশ। আজ কোনো ব্যগ্রতা নেই। না পাওয়ার যন্ত্রণা নেই। নেই পেয়ে হারানোর ভয়। শুধু যে সময়টুকু পাশাপাশি, উষ্ণতা হোক বা যেকোনো অবস্থা, সমানুপাতিক সবকিছু॥

*****

‘বর্তমান’, ২০১৬

হৃদয়পুর

খাদের একপাশে নির্জন পাথর। পথচলতি সবার কাছে এ এক দৃশ্য মাত্র। মনে হয়, যেন টোকা দিলেই গড়িয়ে যাবে। কিন্তু, তার শেকড় প্রাচীন বটগাছের মতো গভীর। নির্জন, তবু বিরাট, বিশাল।

তার মুখোমুখি ঐন্দ্রিলা। হাতে একগোছা কাগজ। ও কথা বলছে। পাথর যেন মনযোগী শ্রোতা। গম্ভীর বাতাস। কুয়াশা কাটিয়ে বেশ কিছু দূর দৃশ্যমান। কাছাকাছি কোথাও থেকে ভেসে আসছে এক প্রাচীন সুর, মাটির গন্ধ। ওকে স্পর্শ করছে কিনা বলা মুশকিল।

আজ গলায় যেন কিশোরীর উচ্ছ্বাস। জানো, আজ বাহাদুরের সঙ্গে গল্প করছিলাম। ওর বাবা নেই। বাড়িতে মা আর ওর বাবার বন্ধুর তেরো-চৌদ্দো বছরের মেয়ে, কুসুম। সেই মেয়ে নাকি ওর বাগদত্তা। কুসুমের মা ছিল না। তার বাবা একদিন নেশার ঘোরে বাহাদুরের বাবাকে খুন করে বসে। বাহাদুরের মা ছেলেকে বলে,– মা-হারা মেয়ে, বাপও হাজতে, একা থাকবে? বাড়ি নিয়ে আয়। ষোলোয় পড়লে তোর সঙ্গে বিয়ে দেব। লোকেও কিছু বলতে পারবে না।

আমি অবাক হয়ে ওর গল্প শুনলাম। শুধু মনে হচ্ছিল, এরা এত সহজ-সরল? তখনই হঠাৎ তোমাকে মনে পড়ল। কেমন আছ? কেমন আছে তোমার হৃদয়পুরের ছোট্ট ঘরটা? স্টেশন থেকে রিক্সায় ঠিক সতেরো মিনিট। এখনও তেমন অগোছালো? আমি প্রতিবার সাজিয়ে দিয়েও পরেরবার দেখতাম আবার আগের মতোই অবস্থা! তুমি বলতে, সেই ঘর তোমার অন্য শরীর।– যা দিনের সঙ্গে বড়ো হয়, রাত নামলে ঘুমিয়ে পড়ে। কাঁদে, স্বপ্ন দেখে। আমি বলতাম, ওই ঘর তোমার বর্ষাকাল, যার আড়ালে কষ্ট লুকিয়ে রাখো। তুমি বলতে, ঠিক হল না, বলো আঁখিপল্লব।

মনে আছে? ওই যে, সেদিন সন্ধেবেলা ছাদে উঠতেই তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। তুমি বললে;–

ছাদের মতো দেওয়ালগুলো বড্ড কঠিন।
রইল পড়ে– একটু দূরে... সমস্ত দিন।
কিন্তু ক্ষণিক বৃষ্টিমেদুর আকাশ কালো
অচম্বিতে ভিতরঘরে জল পাঠালো।
সে' জলটুকু মগ্নমিথুন... নজরচুরি।

বাতাসমুখি পর্দা, বুঝি ইচ্ছেঘুড়ি?
সন্ধ্যাপ্রদীপ ভাসছে, যেন কাঁপছে শিখা!
জলের মাঝে বাসর সাজে– বনবীথিকার।
কে দেখেছে? বৃষ্টিফোঁটা সামান্যধন...
পাঁজরছেঁড়া নৌকা বানায় আরেকটা মন।...

মনে নেই? ধুত, তুমি যে কী! নিজেই বলো, পা থেকে মাথা ভিজিয়ে দাও, আবার নিজেই ভুলে যাও।

...

– আচ্ছা, আমি ঠিক কতটা সুন্দর?

– ঠিক যতটা সৌন্দর্য আমার জীবনে প্রয়োজন।

– তবু সচেতন হয়ে ওঠার মুহূর্তে কেন দুটি আলাদা আলাদা পথে ফিরে যেতে হয়?

– শাখা-প্রশাখা নিয়ে বহুদূর যার বিস্তার, তাকে শূন্যতার মাঝে শূন্যতার ছায়ায় ফিরতেই হবে।

– আমার শাড়ির আকাশরঙা আঁচল। কিন্তু, চারপাশে বড্ড চিল-শকুনের ভিড়। ওরা সবসময় যেন ঠোঁট ঘষতে চায়! আঁচড়াতে চায় ঊরুসন্ধি! আমার করুণা হয়। রাগ হয়। ইচ্ছে করে, একটানে উড়িয়ে দিই শাড়ি। ঝড়ো কাকের মতো মাটিতে খসে পড়ুক তারা।

– শুধু মনের জোরে শ্বাসবায়ু আটকে রাখা গোঁয়ার্তুমি।–
আসে যায় পাকদণ্ডিমন।
এক বুকে দুধের গন্ধ পাই,
এক বুক পাথুরে ভীষণ।

– তোমার জামায় বুকপকেট থাকে না কেন?

– বুকপকেটের স্বভাব খারাপ। সুযোগ পেলেই হাবিজাবি ঢুকিয়ে চাপ বাড়ায়। ছিঁড়ে যায়।

সেদিন নদীর ধার। সেদিন কনে-দেখা আলো। কতদিন আগের কথা, তবুও মনে হয়, যেন রোজ ঘটছে!

ঝিকঝিক শব্দে ছুটছে শিশু রেলগাড়ি। ঐন্দ্রিলার মনে হল, একটা ঝর্না থাকলে বেশ হয়। দেখতে-দেখতেই ঝিকঝিক শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে ঝমঝম করে প্রকট হল ঝর্না। পাথর বলল, ‘তোমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।’

ও অবাক হয় না। এমনই তো কথা ছিল। যা সুন্দর, তা-ই সত্য।

সামনে ঋজু পাথর। ওর দৃষ্টি খাদের দিকে। কিছু সময় পর বলল, ‘মা খুব দুশ্চিন্তায় থাকত, আমি সংসার করব কেমন করে? মনেমনে হাসতাম, সংসার! মানে সেই;–

কখনও শীৎকার, কখনও শীতঘুমে,
দেওয়ালজোড়া হিন্দি ছবির 'মিলেঙ্গে হাম তুম'-এ!
ঝিলিকজ্বলা আগুন ওর তারায় ভরা আকাশ।
তবু বিবাগী ঝড় নজরবন্দী। তাই-
আধমোছা লক্ষ্মীর ছাপে
আজীবন চড়াই-উৎরাই।...

বাবা বলত,- আবার ওর পেছনে লেগেছ? ওকে ওর মতো থাকতে দাও না।

মা রেগে যেত। 'তোমাদের বাপ-মেয়ের এই আদিখ্যেতা সহ্য হয় না। আমার হয়েছে যত জ্বালা।'

তবু মা হাল ছাড়ত না। একদিন বলে,- তুই যে কী! মেয়েদের একটু সাজগোজ করতেও তো ইচ্ছা হয়? যতরাজ্যের রঙ-চটা জামাকাপড় পরিস!

– তুমিও তো মেয়ে মা। জানোই তো, যাদের জন্য এই সাজগোজ, তাদের চোখে আমরা শুধুই চামড়া। ওপরে বড়োজোর ওই পোশাকের রঙ চড়ানো।

– চুপ কর। পৃথিবীতে ভালো মানুষও আছে।

– 'ভালো', আবার 'মানুষ'ও! মানুষ হলে সে কি আর ভালো থাকে? একটা কথা বলো,- এই যে তুমি, বাবা, পারমিতা, মৌ, সুজয়, হিমাদ্রি— তোমরা সবাই, পোশাক রঙ-চটা হলে কি তোমাদের কাছে আমার মূল্য কমে যায়?

– এই হিমাদ্রিটা আবার কে?

– আমার বন্ধু।

– থাকে কোথায়?

– হৃদয়পুরে।

– কী করে?

আমি হাসলাম, 'কবিতা। তবে লেখে না, বলে।'

শোনামাত্র মায়ের চোখে আতঙ্ক।– অ্যাঁ, কবি! একটা মাস্টার-টাস্টারও জোটাতে পারলি না? সুজয়-ছেলেটা তো ভালোই ছিল। চাকরি-বাকরি করে, ফ্যামিলিটাও ঠিকঠাক।

– মা! কতবার বলেছি সুজয় আমার বন্ধু।

– রাখ তোর বন্ধু। আর শেখাস না। এমনি-এমনি তিন-কুড়ি বয়স হয়নি! তোর ওই হিমাদ্রি না হিমালয়, সে কাব্যি ছাড়া অন্য কাজকর্ম কিছু করে?

– ওর বিশাল এক সিন্দুক আছে, মণি-মুক্তোয় ঠাসা।

– মানে?

– সংযম ওর সেই মণি। আর কখনও প্রথম হতে না-চাওয়ার সাহসের অভাব হল সেই মুক্তো।

– কথায় কথায় কী যে এত হেঁয়ালি করিস, বুঝি না!

মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মা বলল,- ছাড়। আর জ্বালাস না। তোদের এসব

একদম ভালো লাগে না।

...

সুজয়ের কথা তোমার মনে আছে?– আমার সেই জেদী আর একরোখা বন্ধু? সবসময় ভীষণ গম্ভীর মুখ, আর মুখ খুললেই তর্ক! যখন যেখানে থাকে, তখন সেইখানের বিরোধী। পূর্বদিকে ও ঘোর পশ্চিম, আবার পশ্চিমে ও ঘোরতর পূর্ব। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম,– সবসময় এত তর্ক করিস কেন?

ও কাগজ পড়ছিল। দুই অনুচ্ছেদের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় আঙুল রেখে বলল,– এই হলাম আমি। যদিও ওপরে-নিচের প্যাচপ্যাচানিতেই পাবলিকের বেশি ইন্টারেস্ট। ধর, অফিসের মিটিঙে প্রেজেন্টেশন চলছে, সে মাসের টার্গেটে পৌঁছানো কোনো এক সুপার-অ্যাচিভার তার বিজয়গাথার শেষে একলাইন কাব্য ঝাড়ল,– miles to go before I sleep. পরদিন আমি টয়লেটের দরজায় পোস্টার মেরে দিলাম, 'ক্ষমতার অপচয় কোরো না। ল্যাট্রিনের মতো তাগিদ অফিসের কাজে লাগাও, তবেই টার্গেট অ্যাচিভ করবে। miles to go before I slip.

আমার যে বিয়েটা হতে-হতেও ফস্কে গেল,– ওই যে মিমি না মোমো কী-যেন একটা নাম, তার সঙ্গে কেনাকাটায় গিয়ে যা-ই পছন্দ করি, তারই সম্বন্ধে বলে, 'ছিঃ এত শস্তা জিনিস কেউ কেনে? এটা একটা বিয়ের অনুষ্ঠান। একটু বোঝার চেষ্টা করো, আমার বাড়ির কি কোনো সম্মান নেই?' ফস্ করে বলে বসলাম, 'তোমরা বুঝি মাঝেমাঝেই টাকা দিয়ে সম্মান বাঁচাও?'

কোথাও সাংস্কৃতিক সভা বসেছে। কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রচণ্ড ঘ্যাঙর ঘ্যাং। হঠাৎ লোকাল ট্রেনে কেনা একখানা চটিবই পড়তে শুরু করি।– নাম 'ভূতের বাপের বিয়ে'। চায়ের দোকানে পলিটিক্যাল ডুয়েল,– বেশ নারদ-নারদ অবস্থা। একপক্ষকে বলি,– ঠিক, তোমার কথাই ঠিক। অন্যপক্ষ তেড়েফুঁড়ে আসে। বলি,– ঠিক, তোমার কথাই ঠিক। এক মনোযোগী শ্রোতাও হৈহৈ করে ওঠে,– দুজনের কথা একসঙ্গে কী করে ঠিক হয়? আমার পুরো মোল্লা নাসিরুদ্দিন স্টাইল,– ঠিক, তোমার কথাই ঠিক!

– লোকে বিরক্ত হয় না?

– হোক। আমার এই কোণঠাসাতেই আনন্দ।

– তুই নিজেও কি পারফেক্ট?

– নই বলেই তো চেঁচাই এত। সবকটা গালাগাল আসলে নিজেকেই দেওয়া। নিজের ওই অপ্রিয় টুকরোগুলো সামনে এলেই গায়ে জলবিছুটি লাগে।

– তুই পাগল!

হঠাৎ ওর গলার স্বরে পরিবর্তন,– আমি খুব দুর্বল, এক অতি সাধারণ মাল। যার অর্জন বা সঞ্চয়ের পরিমাণ যেমন হাস্যকর তেমন দুঃখজনক। এদিকে পাওয়ার লোভ ষোলোআনা, আবার খোয়ানোর ভয়ও চূড়ান্ত।

ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে নাইট-শোয়ে অ্যাডাল্ট

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। কেউ যাতে চিনতে না পারে,– টিকিটঘরে লাইন দিলাম সারা মুখে মাফলার জড়িয়ে। তবুও টেনশান যায় না! শেষে হলের আলো নেভার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচি!

সেই নিভেছে, আজও আলোর খোঁজ পাইনি। সেই টিকিটঘরেই দাঁড়িয়ে আছি! সারা গায়ে গুপ্তরোগের মতো হাজারটা ঘিনঘিনে আপোসের দাগ। জঘন্য, অসহ্য! ঘৃণায় কুঁকড়ে যাই।

– উপলব্ধি তো আছে।

– শুধু উপলব্ধি দিয়ে এক গ্লাস জলও গরম হয় না। উলটে একটা ফালতু ইগো জাঁকিয়ে বসে,– 'আমি বড়ো বুঝদার।' অল রাবিশ্। খুব শ্বাসকষ্ট হয়। একটা জায়গা যদি পাই,– বাইরের এই সেঁকা পাঁপড়ের মতো আপাত-কঠিন, সো-কল্ড 'ব্যক্তিত্ব'টা খুলে লজ্জা-ভয়-লোভ মাখা চেহারাটা নির্দ্বিধায় মেলে ধরতে পারি। সেখানে কেউ ঘেন্না করবে না। একটু একটু করে মুছিয়ে দেবে কালি।–

আমি বললাম;–

'বৃষ্টিভেজা জমি।
আজ যে মাটি রজঃস্বলা,
কাল সে বনভূমি।'

– এ লাইন তুই কোথায় পেলি? পুরোটা বল।

– বলব, আগে সম্পূর্ণ হোক।

...

সুজয় সবসময় চায়– চারপাশটা হবে আইডিয়ালিস্টিক। আইডিয়াল নয়, আইডিয়ালিস্টিক। বাকিদের মতো চারপাশের মানুষেরাও যা করে, করে অভ্যাসবশত। ভাবে, এই হয়তো নিয়ম। পরপর দু-বার যদি তাদের প্রশ্ন করা হয়– 'কেন?' তারা রণে ভঙ্গ দেয়। হয়তো একটা সময় অবধি যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বোঝার আর বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। এখন ধৈর্য হারিয়েছে।

পাথর বলল;

'নিয়মমাফিক নিয়মভাঙার ধাত,
অগম্য এক বনবাদাড়ে
ঘুমায় মধ্যরাত।
দেওয়ালস্মৃতি, ঘুম-ভাঙানো মনে।
লাগামছাড়া আগামপুরুষ
ডুবেছে প্রাক্তনে।'

...

– কাল আমার জন্মদিন। উপহার দেবে না?

– কী মুছতে চাও? কপালের ঘাম, না কপোলের অশ্রু?

– প্রশ্ন কোরো না, দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনের মাঝে আজকাল প্রশ্নচিহ্নকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

– বেশ, তাহলে জন্মদিনের মোমবাতির শেষ আলোকবিন্দুকে স্বপ্নে দেখো।

– মাঝেমাঝে মনে হয়, এক বিস্তীর্ণ গোরস্থানে আমি যেন আদিম নৈশপ্রহরী। মৃত্যুর পরও সমস্ত কুশীলব যেখানে রঙ্গমঞ্চে ফিরে ফিরে আসে। যেন বিন্দু বিন্দু শিশিরে ক্রমশ ভরে ওঠে এক শুকনো জলাশয়। তারপর হঠাৎ মিলিয়ে যায়। যেন শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতা এক হয়ে যায় কিছু সময়ের জন্য। রাত্রি কঁকিয়ে ওঠে ভোরের প্রসব যন্ত্রণায়। আর ওই সমুদ্রের মতো বিশাল অন্ধকারে অবাক হই, আমার ভয় করছে না কেন? সারাটা রাত গেল, শিউরে ওঠা দূরে থাক, একবারও তো ভীরু চোখে পিছনে চাইনি।

ওর গলা ধরে আসে, 'তোমার কবিতা তুমি তো কোনোদিন লিখলে না, আমি যখন যেটুকু কুড়িয়ে পাই, জমিয়ে রাখি এই ডায়েরির পাতায়। যেন সবুজ হয়ে ওঠে। তুমি রঙের কথা বলো। আমার ভয় হয়, কতটুকু রঙই বা আমার সম্বল? ক-টা জীবনেই বা সেই রঙ ছোঁয়াতে পারব? অন্তত সুজয়কেও যদি-!'

কথা শেষ হয় না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয় ঝরনার দিকে। জল বড়ো অস্থির। সেদিন সুজয়কেও এমন অস্থির দেখাচ্ছিল। প্রায় ঝড়ের গতিতে ঐন্দ্রিলার ঘরে হাজির! ও চমকে গিয়েছিল, 'কী হয়েছে তোর?'

সে বেশ চিন্তিত, 'আমার কথা পরে হবে, তার আগে ঠিক করে বল, তোর কী হয়েছে?'

– আমার? কই, কিছু না তো!

– 'আজ যে মাটি রজঃস্বলা, কাল সে বনভূমি'– মনে আছে? বলেছিলিস, সম্পূর্ণ হলে পুরোটা বলবি। শব্দগুলো সর্বক্ষণ মাথায় ঘুরছে। জানি তোকে বলে কোনো লাভ নেই, নিজের খেয়ালে থাকিস, প্রশ্ন করলে হয়তো উত্তর একটা দিবি, প্রকাশ কিছুই করবি না। বলেছিলিস, তোর বন্ধুর লেখা। ঠিক করেছিলাম, তোর সেই বন্ধুর কাছেই শুনে নেব। কিন্তু, কে সে? কে এমন বন্ধু,– যার কথা আমি জানি না? অনেক ভেবেও কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না।

– তারপর মাকে জিজ্ঞেস করলি, তাই তো?

– মাসিমা হৃদয়পুরে হিমাদ্রি-নামের তোর এক নতুন বন্ধুর কথা বললেন। অস্বীকার করব না, একটু ঈর্ষা জেগেছিল। কিন্তু, সম্পূর্ণ কবিতাটার টানে গত দু-মাস ধরে হৃদয়পুর-মধ্যমগ্রাম-বারাসাত চষে বেড়িয়েছি। ওই নামের কোনো কবির খোঁজ পাইনি।

– গন্তব্য ঠিক থাকলেও ঠিকানা ভুল করেছিস। আমাকে বলতে পারতিস।

ও তাক থেকে একটা ডায়েরি নিয়ে আসে।– 'হিমাদ্রি লেখে না। ওর কাছে যাই, যেটুকু শুনি, এই ডায়েরির পাতায় আগলে রাখি। ছোটোছোটো কবিতা। কী জানি, হয়তো একটাই কবিতার অনেকগুলো টুকরো! এই নে।'

সুজয় খুব দ্রুত পাতা ওলটাতে থাকে। অবাক হয়ে যায়, 'তুই কি ইয়ার্কি মারছিস আমার সঙ্গে? এ তো সাদা পাতা, একফোঁটা অক্ষর নেই কোথাও!'

– আছে। মন দিয়ে খুঁজে দেখ। পাবি।

...

সুজয় বলেছিল, একফোঁটা অক্ষর নেই কোথাও। কবিতাও নেই। জানো হিমাদ্রি, সেদিন কবিতার রোগশয্যার পাশে আর রাত্রি জাগিনি। আগে তার হৃৎধ্বনি যখন আমার হৃদয়েও বারবার বেজে উঠত, আমি বারবার নেচে উঠতাম সেই সুরে। প্রতিবার ছুটে যেতাম ছন্দ-বাঁধা সারিকার গহন বনে। সবাই বলত, এ তোর ছেলেমানুষি। অমন ছন্নছাড়া বাউন্ডুলের সঙ্গে বেশি মিশবি-টিশবি না।

আমি ওদের কথা কখনও বিশ্বাস করিনি। তুমিই বলো, ছন্দ কখনও ছন্নছাড়া হয়?

তাকে একবার ভেবেছি বাউল। একবার ভেবেছি বৃষ্টিধোয়া ঘাসফুল। তারপর সাতসমুদ্র, তেরো নদী আর তেপান্তরের মাঠ পেরোনোর মতো দিন গেল, রাত্রি গেল। ... তখন ভাবলাম, সত্যি বলছি, 'প্রেম'। ঠিক সেই মুহূর্তেই অনেক কিছু বদলে গেল। এর আগে সে আমায় সঙ্গ দিত, এরপর নিজেকে সঙ্গী পাওয়ার উপযুক্ত করে নিতে চাইলাম। ফলে, মেলামেশা কমে গেল অনেকটাই।

একদিন হঠাৎ খবর পেলাম,– সে নাকি রোগশয্যায়! খুব কষ্ট হয়েছিল। যার স্পর্শে প্রজাপতি রঙিন হয়, তার অমন বিবর্ণ রূপ! ঠিক করলাম, কাছে থাকব।

এরপর সঙ্গদানের এক বিনিদ্র রাতে কে যেন আমার কানে-কানে বলল, 'তুমি এখন আর ছেলেমানুষ নও, এমন কাজ তোমার আর সাজে না।' আমি বোকার মতো তার কথা একবারও না ভেবে ফিরে এলাম।

জানো হিমাদ্রি, তখন আয়নায় চোখ রাখলে বড্ড একা মনে হত নিজের ছায়াকে। আয়না ভেঙে ফেলেও সহস্র প্রতিবিম্বের মাঝে নিঃসঙ্গতা কাটত না! পোশাক ছাড়লে উলঙ্গ হয়ে যেতাম। দেখতাম,– আমার সিঁথি, ঠোঁট, স্তন, ঊরু, সারা শরীর থেকে তার আদরের চিহ্নরা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে!

সেই অস্পষ্ট চিহ্নদের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে কাতর প্রার্থনা করতাম, 'কবিতা তুমি ভালো হয়ে ওঠো। অন্তত, আমার সেই ছেলেমানুষিদের জন্যও তুমি বেঁচে থাকো।'

ঠিক তখনই তুমি বললে;-

'লক্ষ-হাজার ধাপ পেরিয়ে রেলিংঘেঁষা,
শেষ বিকেলের স্নিগ্ধ আড়াল সর্বনাশা-
প্রশ্ন জাগে, আরে!
এই তবে মুখ দেওয়াললিখন, সহস্র পোস্টারের?
ঘন্টাখানেক। পর্ব-কতক অন্ত্যমিলের আদুল গায়ে।
দূরত্বময় ভৌগলিকের চলতি পায়ে–
ফর্মা-তিনেক। শেষের দুটি পৃষ্ঠা ফাঁকা।
ভিড়-হাসানো আধপেটা চাঁদ উহ্য রাখা।
রাত্রি নামে। আগুনতমা উল্কাউড়ান দখিনদিকে।

রাস্তা যেন নিজের কথা বলার ঝোঁকে;-
দূরত্বচোর।
সংসারী হও কবিকিশোর,-
নিক্তিমাপা পংক্তিচয়ন, মাত্রাজ্ঞানে।
কিন্তু শহর, সবাই বুঝি ঋণখেলাপির মর্ম জানে?
নিযুক্তপ্রাণ। পোষমানানো দ্বন্দ্বে যত সূক্ষ্ম-স্থূল
জন্মাবধি শিক্ষানবিশ,- চলতি ভালমন্দগুলোর।
যন্ত্রসচল জ্বলা-নেভার দেউলিয়া মতলবে,
অনুচ্চারে এমনি গল্প সবে-
বুনতে বুনতে পথ হারানো নিজের পাড়ায়!
ছন্নছাড়ায়-
দু-চার ফোঁটা শব্দ তখন ঘরের কোণে!
পয়ার-বাঁধা গেরস্থালি, বৃদ্ধ মনের।...'

পাহাড়ের উঁচু-নিচু পথ ধরে সুজয় চলছে। সারারাতের ট্রেন সফর। তারপর চারঘণ্টা ট্যাক্সি। ড্রাইভারের মুখ যেন থামতেই চায় না। সারাটা পথে তার মোটামুটি সমস্ত জ্ঞাতি-গুষ্টির খবর সুজয়ের অন্তত তিন-চারবার শোনা হয়ে গিয়েছে। স্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর লোকটি বলল, 'খুব বকবক করি বাবু, অপরাধ নেবেন না। আসলে নতুন মানুষ পেলে কথা বলার লোভ সামলাতে পারি না।'

সুজয়ের নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে। সে শুধু যেন গ্লাডিয়েটর, জীবনের সারমর্ম সেনেটের মার্বেল নয়, কলোসিয়ামের বালি। তবে লোকটির একটা কথা ওর খুব মনে ধরেছে।– 'বুঝলেন বাবু, আমাদের এই শহরে সবাই খোশমেজাজে থাকে।'

ওর নিজের শহরে সবাই মেজাজে থাকে, তবে 'খোশ' কিনা বোঝা যায় না। ওর বন্ধুরা, ওর বাড়ির লোকেরা প্রশ্ন করে, 'সবসময় তোর মেজাজ এত তিরিক্ষি থাকে কেন? কোথায় নিজের কাজ করবি, তা নয়, দুনিয়ার হাবিজাবি ভেবে মরিস!'

প্রশ্ন শুনে ওর হাসি পায়। একজন তো বেশ রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, 'সমস্যাটা কী জানিস? তুই সবসময় শুধু নেগেটিভিটি খুঁজিস। চারদিকে দেখ, সভ্যতা কতদূর এগিয়েছে!'

ও ভাবে, সেই আদিমযুগ থেকে সভ্যতা বলতে যা বুঝি, সে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোই হোক বা মিশর, ব্যাবিলন, আজটেক, ইনকা, গ্রিক, রোমান বা আধুনিক বিশ্ব।— সবার ভিত্তি সেই লোভ-ভোগ-হিংসা আর ঈর্ষা। নীল-জলে বহুক্ষণ ডুবে থাকলে সাদা কাপড়ে যেমন নীল রঙ ধরে, তেমনই ওইসব রিপু কখন যে চামড়া ভেদ করে রক্তে মিশে যায়, বোঝা যায় না। পেট আর তলপেট যেখানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেখানে হৃদয়ের কথা বুঝতে যাওয়া রাজদ্রোহের

সমান 'অপরাধ'।

...

দূর পাহাড়ের গায়ে পাইনগাছের বন। চলার পথে মেঘ নেমে এসেছে। ঐন্দ্রিলা কোথায় যেতে পারে– সুজয় তা জানে। ছোটোবেলায় ওদের দুই পরিবার এখানে এসেছিল। ওরা দু'জনে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয়েছিল খাদের ধারে। এক পাশে বিশাল পাথর। ছোট্ট ঐন্দ্রিলা এক মনে তাকিয়েছিল সেদিকে। সেদিন সুজয়ের মনে হচ্ছিল, একই বছরে জন্ম হলেও ওরা যেন সমবয়সি নয়!

কাছাকাছি কোথাও একটা পাখি ডাকছে। কী পাখি এটা? মনে পড়ে না, 'বেশ, এর নাম রাখলাম অচিনপাখি।'

খাদটা মেঘে ঢাকা। ওই তো! ওই ছায়ামূর্তি নিশ্চয় ঐন্দ্রিলা। কিন্তু, এই শব্দ কীসের? হঠাৎ দমকা হাওয়ায় মেঘের আবরণ সরতেই ও অবাক— এই ঝরনা আগে তো ছিল না!

ওর সারা শরীর শিরশির করে ওঠে। মনে আর কোনো রাগ দুঃখ লোভ ঈর্ষা কিচ্ছু নেই। চারপাশে সবকিছু সুন্দর, সত্য। মিথ্যা কিছুই নেই! মনে হয়, এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, চেতনা যখন মহাকাশ স্পর্শ করে।

খোলা চুল হাওয়ায় উড়ছে। ঐন্দ্রিলা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে। শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে সুজয় ওর কাঁধে হাত রাখে।-

বৃষ্টিভেজা জমি।
আজ যে মাটি রজঃস্বলা,
কাল সে বনভূমি।
মেঘের বুকে জমাটবাঁধা
শতক-প্রাচীন জটিলধাঁধা।
সাঁকোর মতো নৌকাখানি চৌকাঠে যায়-আসে।
দূরের কোনো সম্মোহনে। জলের কিছু পাশে।
সুদূর, বহু সুদূর কোলাহল।
গৃহস্থলির বালতি-গেলাস আঁকড়ে ধরে জল।
পুণ্য বড়ো শূন্যতর স্বচ্ছতোয়া।
হাতের চেটোয় কয়েক ফোঁটা,
আধেক তার হৃদয়ছোঁয়া।
তরণীতে এক, ধরণীতে একা,
আর একটু জল ডিঙিয়ে গেলে ডাঙা।
যত মমতায় কলস গড়া—
তত মায়াময় ভাঙা।

...

আজ মনে হয় ডায়েরির পাতাগুলো আমার চোখে আর শুধুই সাদা থাকবে না।

ঐন্দ্রিলার কণ্ঠস্বর ভিজে যাচ্ছে, 'তুই জানিস না সুজয়, এ কী বিশাল প্রাপ্তি!'

– চল, যাই।

– একটু দাঁড়া।

ধীর পায়ে ঐন্দ্রিলা এগিয়ে যায় ঝরনার দিকে। হাতের কবিতাগুলো এক-এক করে স্রোতে ভাসাতে থাকে। সুজয়ের মুখে কোনো কথা নেই। সে ওকে দেখছে শুধু।

অন্তিম পৃষ্ঠাটা জলে ভাসিয়ে ঐন্দ্রিলা আবার পাথরের মুখোমুখি। চোখে-মুখে কৃতজ্ঞ প্রশান্তি। 'তোমার কবিতা তোমারই স্রোতে ফিরিয়ে দিলাম। জানি, সময় এলে ঠিক পৌঁছে যাবে এমন কোনো জীবনের পাশে,– যার খুব প্রয়োজন।'

*****

'শিলাদিত্য', ২০১৬

ছায়া

'বসে বসে মরবে। ছুটে ছুটে মরবে। ধুঁকতে ধুঁকতে মরবে। লাফিয়ে লাফিয়ে মরবে। মাত্র দু'টাকা প্যাকেট! ইঁদুরের বংশ নির্বংশ করুন।'

সাইকেলে বাঁধা করুণ লাউডস্পিকার থেকে করুণতর ভাষার বিজ্ঞাপন কানে আসে মনসুরের। বাসস্ট্যান্ড বলতে শতাব্দীপ্রাচীন নিমগাছ, শনিমন্দির, এহেসান শেখের হিন্দু হোটেল আর নিমগাছের গায়ে পেরেকে আঁটা সাইনবোর্ড,– 'এখানে বাস থামিবে'। কে যেন আবার ফাজলামি করে পাশে লিখে রেখেছে 'না'। তবুও বাস দাঁড়ায়। আর দাঁড়ায় বলেই মৃদুল চাটুজ্জে সাইকেলে ইঁদুরমারা বিষ, চায়না বাম, বিষহরী তেল, বিদ্যুৎমলম, ন্যাপথলিন, সেফ্‌টিপিন, চিরুনি, টিপের পাতা, শায়ার দড়ি নিয়ে সকাল সকাল হাজির হয়। আর হাজির হয় বলেই শহরে যাওয়ার দিনগুলোয় মনসুর একটু আগেভাগে বেরোয়। গালমন্দের ছলে দু-চারটি রসিকতা, কিছু প্রাণের কথা।

পরিচয়ের সূত্রটি বেশ কাকতালীয়। মনসুরের ছেলে ফরিদ ছোটোবেলায় মাঝেমধ্যেই বায়না জুড়ত,– 'আব্বু চটকল দেখুম।' বায়না মেটাতে ব্যারাকপুরের মৃদুলদের চটকলে যাওয়া। সেই আলাপ। আজও বন্ধুকে দেখামাত্র মুখে আপনা থেকেই হাসি খেলে যায়,– 'চিল্লিয়ে কানের পোকা খাও কেন হে? তাও যদি দু'টা ভালো কথা বলতা!'

মৃদুল চাটুজ্জে আবার স্বভাব-গায়ক। হাতের চোঙা নামিয়ে দু'কলি গেয়ে ওঠে;–

'মনের কথা বলব কারে,
কে আছে সংসারে?
আমি ভাবি তাই, আর না দেখি উপায়
কার মায়ায় বেড়াই ঘুরে।'

মনসুর হাসে, 'সে না হয় হল। কিন্তু, ব্যাটারির গুঁড়াকে বিষ বলে আর কদ্দিন বেচবা?'

– রাখো মিয়াঁ, দুই টাকার প্যাকেটে কি বাঘ মারার মতলব করো নাকি? পাঁচটা টাকা খসাও, এমন মাল দিব যে, হাতিও কাবু হয়। অবিশ্যি তোমারে দিব না, মাথাপাগলা লোক, নিজেই কখন গিলে বসো! বামুনের ব্যাটা বলে কথা, বন্ধু হত্যা তো করতে পারি না।

– থামো তুমি। একাত্তরের পর যে-ই এদেশে আসে সে-ই নাকি বামুনের ব্যাটা! তুমাকে তো কালীতে কাটবে আর আল্লায় পুড়াবে। শালা, ছিলা মইদুল, মওকা বুঝে 'মিরদুল' চাটুজ্জে সাজো!

মৃদুল চাটুজ্জের নামকরণের এই অভিনব ইতিহাসের পুরোটাই মনসুরের কল্পনাপ্রসূত। দু'জনে প্রাণ খুলে হাসতে থাকে।

– চললা কোথায় মিয়াঁ, বীজ আনতে বুঝি? কতবার বলি, পাট রেখে ধান ধরো। খরিফে ধান, রবিতে ডাল। বেচলে বেচবা, বিক্রি না হলে খেয়ে তো বাঁচবা। তা না, পাঁচ-ছয়বার লাঙল দাও রে, মই দাও রে, সার দাও রে, কাটো রে, জাঁক দাও রে, পচাও রে, ছাড়াও রে, ধোও রে, দাগ ধরলে আবার তেঁতুলজলে চুবাও রে, শুকাও রে, আঁটি বাঁধো রে...

এতকিছুর পরও পাইকারের আশায় পেটে গামছা বেঁধে বসে থাকো। ওপারে থাকতে বাপ-কাকাকে তো দেখেছি, চাষের দাপটে চাষা বলদ সবারই পাঁজরা গোনা যায়। ওই একখান গান আছে না,— 'আমার সাধ মেটে না লাঙ্গল চষে/ হারা হলাম সকল দিশে!'

কথাটা ঠিক। এককালের 'সোনার আঁশ' এখন আর কদর পায় না। দেশভাগে বেশিরভাগ চটকল পড়ল এপারে আর ভালো জাতের পাটের জমি পড়ল ওপারে। অসমীকরণের প্যাঁচ খুলতে খুলতে রোজই একটা-দুটো করে চটকলের গণেশ ওল্টাতে লাগল। তালা পড়ার পর দলবেঁধে কৌটা নাচিয়ে আর জমানো টাকায় মৃদুলদের ক-দিন চলল। তারপর একে-একে সোনার দুলজোড়া, ব্রোঞ্জের চুড়ি, কাঁসার বাসন, শিশুকাঠের খাট বেচতে বেচতে শেষে ইঁদুরমারা বিষ।

— খবর পেয়েছ? জেলায় নাকি 'শিল্পবিপ্লব' হবে।

— তাতে তোমার কোন উপকারটা হবে সেটা বলো। চাষেও হয়েছিল না একবার—ওই তোমার বিপ্লব? হয়েছেটা কী! আঁটি বাঁধা পাট পড়ে পড়ে পচে।'

— কী যে বলো মিয়াঁ! কিছুই কি হয়নি?

— এহেসানের হোটেলের আলুপোস্ত হয়েছে। আলুই সার, পোস্ত খুঁজতে পুলিস লাগে।

মৃদুল হাসে, 'মাঝেমধ্যে বেশ কথা বলো মিয়াঁ। কিন্তু, গাড়িতে করে লোক এসেছিল গো। এইখানে চা খেতে খেতে কথা বলছিল। নিজের কানে শুনেছি। জমি বুঝে দামের লিস্টি করেছে। দখল নিবে বোধহয়।'

— নিজের জমি, চার পুরুষের ভিটা চাইলে দিব নাকি! মগের মুলুক? তেনারা জমির বুঝেন-টা কী? জমি মানে কি শুধু মাটি?

আবার হাসে মৃদুল, 'তেনাদের আর দোষ কী, জানবে কী করে—পাটগাছের মতো তোমারও শিকড় গজিয়েছে! রেগো না। তেনারা এসেছিলেন মাত্তর। জমি নিয়ার কথা বলেনি। মজা করছিলাম তোমার সঙ্গে।'

মনসুরও হাসে, সে কি আর বুঝি না শ্বশুরের পো, তুমি হলা মিচকা

শয়তান!'

গত দশ দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি। মাটির দেওয়াল গলে কঞ্চি বেরিয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। ঘরের মধ্যেও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। মনসুরের জমির ধার ঘেঁষে কালীমন্দির। টালির ছাদ, জল চুঁইয়ে মহাদেবের মুখ গলে গিয়েছে। সন্ধ্যার ভোগ-আরতির প্রস্তুতি নিতে মন্দিরে আসেন বৃদ্ধ 'ভটচাযঠাকুর', আর্তনাদ করে ওঠেন। ভয়ঙ্কর কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিলাপ করে চলেছেন এখনও।

আসরের আজান ওঠে। বস্তুর ছায়া তার থেকে দ্বিগুণ হলে আসরের নামাজের সময়। হঠাৎ ভয় লাগে মনসুরের, 'মানুষের থেকে তার ছায়া দুই-গুণ হওয়া,— এ যে কঠিন কথা, সে ছায়া মানুষ বয় ক্যামনে?'

কয়েকদিন ধরে আলোর দেখা নেই। আজান যেন বিষণ্ণ। জাবনা ছেড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বলদ দুটি। সবার বুকেই কান্না। আকাশ যেন আরও জোরে কাঁদছে। পাটের চারাগুলির সবে এক মাস। গোড়ায় জল জমলে বাঁচবে না একটিও। আবার বীজ কেনার টাকা নেই ঘরে, বুক কাঁপে। বৃষ্টি তাড়াতে ওঝা ডাকা হয়েছিল। একটা করে বাজ পড়ে আর সে'ব্যাটা একখানা দশহাতি বাঁশ উঁচিয়ে সেদিকে ছোটে, আকাশকে জোর ধমক লাগায়! আরবি, সংস্কৃত, বাংলা মেশানো মন্ত্র ঝাড়ে, তেড়ে গালাগাল করে। এই ঝড়জলের মধ্যেও বেশ লোক হয়েছিল তার কাণ্ড দেখতে। ওঝার সারা গা সপসপে ভেজা। দমে টান পড়েছে, ঠাণ্ডায় কাঁপছে বেচারা।

— ক্ষান্ত দ্যান বাবা। আল্লার মর্জির সঙ্গে কি মানুষ পারে পাল্লা দিতে! ভিজা কাপুড় ছেড়ে লুঙ্গি-চাদর পরেন। জল তাড়াতে এসে জ্বরে মরবেন দেখি!

কপালে চিন্তার ভাঁজ গাঢ় হয়। ছেলেবেলায় বাজের শব্দ হলে আম্মি বলত, 'গোনাহের বিচার। শয়তানের পিঠে কোড়া পড়ছে!'

'কত গোনাহ্ করেছি আল্লা গো?' অনুচ্চারে কেঁদে ফেলে মনসুর।

হঠাৎ হাঁকডাকে সংবিৎ ফেরে। কাশীপাড়ার রামু এসেছে ছুটতে ছুটতে, 'সব্বোনাশ হয়েছে চাচা, মৃদুলকাকা বিষ শুঁকেছে!'

মনসুর পড়িমরি করে ছোটে। বিচিত্র সব মানুষ, বিচিত্র তাদের বিপদ! নিজের বাপের থেকে এই নেশা পেয়েছে মৃদুল, রাতের খাওয়ার পর একটান নস্যি। এদিকে সম্প্রতি রাতকানা রোগে ধরেছে মৃদুলের বউ সঙ্গীতাকে। মগরিবের আজান হতেই দু'চোখে পর্দা নামে। হাতের আন্দাজে গেরস্থলি, ভুল করে বিষের প্যাকেট ঢেলে রেখেছিল নস্যির কৌটায়। টান মারতেই নাক-মাথা জ্বলে যায়। কিছুক্ষণ কাটা পাঁঠার মতো তড়পে ঝিম মেরে যায় মানুষটা।

মনসুর পৌঁছে দেখে শরীর প্রায় ঠাণ্ডা, মুখে গ্যাঁজলা। চাষের মুলুক। দূরে দূরে সব বাড়িঘর। ডাকাডাকি করতে গিয়ে আছাড় খেয়েছে সঙ্গীতা, তার সারা গায়ে কাদা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে সারাটা সময় মনসুর দোয়া পড়তে থাকে। সঙ্গীতা একবার চেঁচিয়ে কাঁদে, একবার স্বামীর গায়ে-মাথায় হাত বোলায়।

ছটফট করতে থাকে পাগলের মতো।

দুই সপ্তাহ পর মৃদুল ঘরে ফিরল মাথাখারাপ হয়ে। খিদে-তেষ্টার বোধও যেন নেই। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাওয়ায় বসে থাকে সর্বক্ষণ। চুপচাপ কী যে দেখে, সে-ই জানে! হাঁ-মুখে মাছি যায়-আসে, কোনো বিকার নেই। কাপড়চোপড়ে করে ভেবলে বসে থাকে এক-একদিন।

আগের মৌলবি ছিলেন জ্ঞানী, নরম স্বভাবের লোক। মসজিদে শরিয়ত-মারফতের বাহাস বসাতেন। কতকিছু জানা যেত। নতুন মৌলবি হুমায়ুন কাদেরের এক চোখ কানা। হাবভাব খুব গোলমেলে।– তার কথাবার্তায় ভক্তির বদলে ঘেন্না বেশি ছড়ায়। অথচ, হিন্দু-মুসলমানে কোনো কাজিয়াই ছিল না এতদিন। বিরানব্বইয়ের দাঙ্গাতেও গাঁয়ের মন্দির-মসজিদে আঁচড় পড়েনি। সেদিনও ঈদ-বিজয়ায় সিমাই-নাড়ু আসত-যেত এ'পাড়া-ও'পাড়ায়। মোল্লা এসেই লোক খ্যাপাতে লাগল। তার ওপরে, কথায় কথায় ফতোয়া। মানুষজনের জান যাওয়ার জোগাড়। এই সেদিন শামিম আলমের বিবির কপালে ঝাড়ুপেটার বন্দোবস্ত হল।–

চালের খোঁজে বেরিয়েছিল শামিমের বিবি। রাস্তায় হাঁটুজল। এদিকে ঘরে দু-একটা বই শাড়ি-সেমিজ নেই। কাদার থেকে বাঁচাতে শাড়িটা একটু তুলে হাঁটছিল।– মৌলবির চোখ এড়ায়নি। সেদিনই সভা ডেকে 'ঘরের মেয়েছেলেরা বেশরম বেপর্দা হয়েছে', 'কপালে কেয়ামত নাচছে' –করে হুমায়ুনমোল্লা ভুব চেঁচাল ক্ষণিক। তারপর জোড়া মুরগির জরিমানা আর একশ ঘা ঝাড়ুপেটার শাস্তি ঘোষণা।

ঝাড়াই না-হওয়া ধানের শিষ গোছ করে বেঁধে সপাসপ মার পড়ছিল পিঠে। পাকা ধানের তুষ চামড়ায় কাঁটার মতো বিঁধে-বিঁধে যায়। রক্ত ঝরে। অস্ফুট আরবি-তে কলমা পড়তে পড়তে হাত চালাতে থাকে মৌলভি।

ভিড়েরে মধ্য থেকে গুজগুজ কয়েকজন,– 'মায়াদয়া কিছু নাই নাকি শরীলে!' 'মোল্লা কানা তো কী, মেয়েছেল্যার ঠ্যাং তার চোখ এড়ায় না!'

...

এদিকে বড়ো বেকায়দায় পড়েছে মনসুর। একে চাষ-আবাদ লাটে ওঠার জোগাড়, তার ওপরে মৃদুলের এই দশা!—একা ছাড়তেও ভয়। এদিকে হুমায়ুন কাদেরের জন্য পাড়া-গাঁয়ের অবস্থা খুব জটিল। তবে মনসুরের বিবি রাহেলা দয়ালু মানুষ, কিছুটা তার ভরসাতেই মনসুর ওদের নিয়ে আসে। কিন্তু, পরদিনই ডাক পাঠায় মৌলবি।

— শুনলাম, তুই এক হিন্দুকে ঘরে তুলেছিস?

— বন্ধু মানুষ, বিপদে পড়েছে।

— কাফেরের সেবা করা যে হারাম। বন্ধুরে ইসলাম কবুল করতে বল। তাহলেই আর কোনো ঝামালা নাই।

মাথা গরম হয়ে যায় মনসুরে, 'রুগী মানুষ, তয় মাথার ঠিক নাই। তারে এই সব আজাইরা কথা বলতে পারব না। বন্ধুর পাশে দাঁড়ানো যে কোন মজহবে

হারাম হয়, তা আমার জানা নাই।'

— দ্যাখেন ভাইসব, আস্পদ্দা দ্যাখেন। এক চাষা কিনা হাজি হুমায়ুন কাদেরকে মজহব শিখায়!

চারপাশে গুঞ্জন ওঠে। মনসুরের কাছেই ছিল শামিম আলম। সেদিন মার খাওয়ার পর থেকে এখনও চিৎ হয়ে শুতে পারে না তার বিবি। গোনাহ্ কী হয়েছিল সবটা মাথায় ঢোকে না। সাজা যখন পেয়েছে, কিছু একটা হয়েছিল তো বটেই। সে মনসুরের কানে ফিসফিস করে বলে, 'মৌলবির সঙ্গে বাহাস কোরো না। এনারে চটায়ে গেরামে কি থাকতে পারবা?'

এদিকে হুমায়ুন মোল্লা আর একখানা হাঁক ছাড়ে, 'বলেন, ভাইসব, কুনওদিন কুনও হিন্দু কুনও মুসলমানকে ঘরে তুলেছে? একশো গেরাম ঘুরেও দেখতি পারবেন না। মুসলমানের ছুঁয়ায় তাদের যদি এত ঘেন্না, তাদের দোস্ত বলে বুকে টানব ক্যানে! এবার বলেন, এ গোনাহ্ করেছে কি না?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'জি হাঁ।'

হুমায়ুন মোল্লা একজনের কথাকেই বেমালুম সবার কথা হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। ঘর থেকে কাফের তাড়াও নয়তো জরিমানা নগদ বিশ হাজার।

— কোথায় পাব? চাষ অবধি পড়েনি এ'বছর।

— যদ্দিন জরিমানা দিতে না পারিস, জমির কাগজ জমা রাখ। ভাতে মরবি না। চাষও করতে পারবি। তদ্দিন শুধু ছ'আনা ফসলের মালিক হবে মসজিদ। কী ভাইদব, আপনারা কী বলেন?

উপস্থিত কয়েকজন তার কথায় সম্মতি জানায়।– মৌলভির বিচারে কোনো ফাঁক নেই।

মোল্লা সেয়ানা ঘুঘু। খুব ভালো করেই জানে,— দশ আনা ফসল বেচে মনসুর এই বছরে জরিমানা শুধতে পারবে না। এলাকায় কারখানাবাবুরা মাপজোক করে গিয়েছেন। এ'জমি বাদে এ'চত্বরে কারখানা হওয়া অসম্ভব। মওকা বুঝে 'মসজিদের জমি', 'ওয়াকফ্ সম্পত্তি', 'হাত দিলে গোলমাল বাঁধবে'— এইসব বলে বেশ মোটা টাকার দাও মারা যাবে।

আজান মিলিয়ে যেতেই ঝিঁঝিপোকা আর ব্যাঙের ডাক স্পষ্ট হয়। দাওয়ার খুঁটে হেলান দিয়ে বসে আছে মৃদুল। পাশে তার রাতকানা বউ। বলদ দুটির আজ কোনো সাড়াশব্দ নেই। দুপুরের জাবনা এখনও অবধি মুখে তোলেনি। মনসুর মাথায় গায়ে হাত বোলায়, 'খা ব্যাটা, মনমরা কেন? সব গেলেও পরিচয় যায়নি রে বাপ!'

চার বছর আগে ঠিক এমনধারা বৃষ্টিই নেমেছিল।– উঠোন, জমি, পুকুর, সব একাকার। বলদ দুটো সারাদিন-সারারাত জলের মধ্যেই বসে-গড়ায়। ফরিদ একটা খেটো বাঁশ নিয়ে নালার মুখটা খোঁচাতে লাগল। হঠাৎ হাতে কুলকাঁটা বেঁধার মতো যন্ত্রণা! ভেবেছিল জলঢোঁড়া বুঝি। গরম দুধের সঙ্গে মণিরাজ আর

হরকোচের শিকড় বেটে খাওয়ালেই সব ঠিক। কিন্তু, জলঢোঁড়া নায়, তা ছিল গহমাখড়িশ। এক ঘণ্টার মধ্যেই সবকিছু শেষ।

হিন্দু পাড়ায় শাঁখের ফুঁ পড়ে। কুপি হাতে গোয়ালঘরে ঢোকে রাহেলা। শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই ভেজা-স্যাঁতস্যাঁতে সন্ধেয় ঝিঁঝির ডাক, শাঁখ-আজানের শব্দ— সব যেন মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছিল। এক ফাঁকে রাহেলা বলল, 'ঘরে দিন-পনেরোর বেশি চাল-আটা নাই। কিছু একটা ব্যবস্থা করো। না হলে যে-!'

সে'কথা মনসুরের অজানা নয়। প্রায় প্রত্যেকটা বছরই জমির চারাগাছ দেখিয়ে হাত পাততে হয় পাইকার-মহাজনদের কাছে। কয়েক-কুইন্ট্যাল 'আগাম' পাট বন্ধকি থাকে। ফুল ধরার সময় পাটের আঁশ হয় সবচেয়ে উন্নত জাতের, কিন্তু তখন ফলন বড়োই কম। চুকোতে আটআনা গাছই কাটা পড়ে। কিন্তু এবার? কবে চাষ পড়বে— আল্লাই জানে। যদিও বা গতি কিছু হয়, ছ'আনা খাবে হুমায়ুন মোল্লা। বাকি দু'আনা ফসলে চার-চারটে পেট! পাইকার-মহাজনরা তো আর খয়রাতির আসর বসায়নি, বাকি জমিটুকুও যাবে। তখন জান থাকে, না পরিচয়?

রসুইঘর থেকে টুকরো টুকরো কথা কানে আসে, 'সম্বরা-ডালই বেশি ভাল্লাগে। জানো, আব্বা পাঁচফোড়ন দ্যালেই রাগ করত। হিন্দু-হিন্দু গন্ধ লাগে নাকি!'

ওরা দু'জন হাসছিল। অবাক লাগে মনসুরের। এরা কত সহজে কান্না গিলতে পারে! এত বছরেও এই সহজ-সরল মেয়ে মানুষের রহস্য ধরা গেল না।

হাতের আন্দাজে রুটি বেলছে সঙ্গীতা। রাহেলা সেঁকছে। উনুন থেকে চাটু সরলেই দুটি দীর্ঘ ছায়া গড়িয়ে পড়ছে প্রায়-অন্ধকার দাওয়ায়।

সব ভুলে আবার সেই চিন্তাটি মনসুরের মাথায় ঘুরপাক খায়,— মানুষের থেকে তার ছায়া দুই-গুণ সে'ছায়া মানুষ বয় ক্যামনে? দিন-রাতও আসলে আলো-ছায়ারই খেলা। মাঝদুপুরে ওর মতো জোয়ান মরদও ওইটুকুন আর দিনের শেষে দেড়-হাতি পোলাপানও লম্বায় তালগাছ! কিন্তু, আসল কোনটা? কেনই বা ছায়া মেপে আল্লাহকে ডাকার নিয়ম?

কাছেপিঠে কোথাও প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ে, হঠাৎ চোখ ঝলসানো আলো!

— তিনিই যে আলো। তাঁর সামনে মানুষের ছায়াটুকুই পড়ে যে।

চমকে ওঠে মনসুর। ওর মনের কথা মৃদুল শুনে ফেলেছে নাকি!

রান্না শেষ নিভু-নিভু আঁচে রাহেলাদের ছায়া দাওয়া ছাড়িয়ে দেওয়াল ছুঁয়েছে।– ছায়াদুটি তখন মিলেমিশে এক। মনসুর প্রবল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে!

মাস-খানেক পর বাসস্ট্যান্ড আবার সেই লজঝড়ে সাইকেল। চিরুনি সেফ্‌টিপিন, বিদ্যুৎমলম, ইঁদুরমারা বিষ। লাউডস্পিকারের করুণ শব্দ, '...বসে বসে মরবে। ছুটে ছুটে মরবে। ধুঁকতে ধুঁকতে মরবে।...'

নিমগাছের একটা ডালে বাজ পড়েছিল। করাতের ঘ্যাস্-ঘ্যাস্ শব্দ।

এহেসান শেখের হোটেলে রান্না নামে। ভাজা মাছ আর 'হিন্দু' ডালের গন্ধ। বাসের সময় হয়েছে, রাস্তায় অনেক মানুষের ছায়া।

এতক্ষণ চেঁচিয়ে গলা ধরে গিয়েছে মনসুরের।

*****

'বর্তমান', ২০১৮

প্রদীপের তেল

বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে আসা কিছু পুরনো টালি। পচা খড় আর নারকেল পাতায় ছাওয়া একফালি বারান্দা। একতাল মাটি হাতে কয়েক মুহূর্ত থমকে যায় নারায়ণ। শিরদাঁড়া জেগে ওঠা পিঠ এলিয়ে পড়েছে বাঁশের খুঁটিতে। চাকের সাঁইসাঁই শব্দের আড়ালে দীর্ঘশ্বাস নিজের কানেও যেন ধরা পড়ে না। সকালে খেলতে খেলতে গোটা-চারেক কাঁচা ঘট ভেঙে ফেলেছে ওর তিন বছরের নাতি, রামু। মায়ের হাতে বেজায় মার খেয়েছে বেচারা।

বুক মুচড়ে উঠেছিল নারায়ণের, এই সামান্য লোকসানটুকুও ওদের কাছে বেশ বড়ো। কুমোরের কাজ করে আর সংসার টানা যাচ্ছে না। বাপ বেঁচে থাকতেই মাটির থালা-বাসনের চল উঠেছিল। কুঁজো, জালা– এসবের চাহিদাও আজকাল কম। বানানোর ঝক্কিও বেশি। ভালোজাতের এঁটেল মাটি চাই, জ্বালানী কাঠ, কয়লার গুঁড়ো চাই। কথায়-কথায় মহাজনের কাছে হাত পাততে ভয় করে। এক চায়ের ভাঁড় বানিয়ে ভাতের থালা বা মন– কোনোটিই ভরে না।

পুজো-পার্বণের জিনিস? সরা-মালসার বদলে কাগজ-থার্মোকলের থালা এসেছে অনেকদিন হল। দামে শস্তা, ওজনেও হালকা। পট আঁকার লোক নেই। রইল পড়ে ঘট, ধুনুচি আর প্রদীপ। মাত্র কয়েক বছর আগে অবধিও ভাদ্রমাস পড়লেই গোটা কুমোরপাড়া নাওয়া-খাওয়া ভুলে প্রদীপ গড়তে জুটত।– তাতেও কূল পাওয়া যেত না, এক দাসপুরের হাটেই এক-একজনের হাজার দশেক করে বিকোতো! এছাড়া সদরের, কলকাতার পাইকার তো আছেই। আর এখন? সব মিলিয়ে হাজার দুয়েক বিক্রি হলেই কুমোরের সাতজন্মের ভাগ্য! ফলে, কুমোরপাড়া নামেই, নারায়ণ আর সদানন্দ বাদে সবার ভাঁটিই ঠাণ্ডা।

বহু লোকে বলেছে, নিজেও এক-আধবার ভেবেছে অন্যকিছু করার কথা। পরক্ষণেই মুচড়ে উঠেছে বুক। মাটি তার পেশা হতে পারে, কিন্তু এই মাটির সঙ্গে যে শিকড়ের যোগ। তাই প্রতিদিন একটু একটু করে সেই শিকড়ে টান ধরে। কাদামাটি আর আঙুলের ফাঁকটুকু চোখের জলে ভরাট হয়। হয়তো সেজন্যেই ওর হাতের প্রদীপের শিখা অমন করুণ। তুলসীতলায় রাখলে মনে হয় প্রদীপ তো নয়, যেন সজল চোখ পেতেছে কেউ! কিন্তু সে আনন্দঅশ্রু। এককুচি হাসির মতো আলো ঢেলে দেয়।

ইদানীং হাসি-কান্নার কদর নেই বিশেষ। কী এক এল.ই.ডি. টুনি এসেছে বাজারে, তেল-সলতের ঝামেলা নেই, বাতাসের ঝাপটায় নিভেও যায়না, চটজলদি সাজিয়ে সুইচ টিপলেই হাজার রঙের ঝিকিমিকি আলো। নারায়ণ ভেবে পেত না ওই নকল আলোর সঙ্গে কি প্রদীপের তুলনা হয়? সেই আলো কি মনের তারে তেমন সুর তোলে? অযোধ্যানগরীতে টুনি সাজালে কি বনবাস শেষ হয়?

কলকাতার পাইকার গোপাল সাহা যেদিন বায়না ধরাতে এল, কথায় কথায় তার সামনে তুলে ফেলেছিল প্রসঙ্গটা। হিসেব লিখছিল গোপাল সাহা। লেখা থামিয়ে বলল, 'প্রশ্নটা খাঁটি নারায়ণ, কিন্তু প্রশ্ন করাটা বোকামি। হাতে প্রদীপ নিলে ঘরের মেয়ে-বৌকে লক্ষ্মীপ্রতিমা মনে হয়, ঘরকে মনে হয় মন্দির। কিন্তু সেই মন কোথায়? আমরা পুরনো মানুষ, এত শত ভাবি। এখন সবাই চায় ওপরের চেকনাই। সবাই চায় সময় বাঁচাতে। চোখের দেখায় সে চেকনাই মন্দ লাগে না, কিন্তু দেখার চোখে? ভেবে পাই না, এত সময় যে বাঁচে, তা যায় কোথায়? ক্যালেন্ডারের কোন পাতায়?'

খাঁটিকথা বলেছে গোপাল সাহা, কেঁদে কী লাভ? নারায়ণের মাধ্যমিক-পাশ ছেলে বিধান কাজ নিয়েছিল সাধু মল্লিকের হিমঘরে। একদিন মালিকেরই মেয়ের সঙ্গে পালাল। মল্লিকের লোকজন তছনছ করে গেল ঘরদোর, ভাঁটি। হাউহাউ করে কাঁদছিল ওর বউ অমলা। নারায়ণ বলেছিল, 'কাঁদিস না, কেঁদে কী লাভ?'

একমাস পর বিয়ে করে ঘরে ফিরল বিধান। বছরখানেক এদিক-ওদিক করার পর বৌ আর দুধের ছেলেকে ফেলে, জমানো টাকাপয়সা ফতুর করে ভর্তি হল কলকাতার কোন আই.টি.আই. কলেজে। পাশ-টাশ করে ওদিকেই কোথাও একটা কাজে লেগেছে। মরে গেলেও সে কুমোরের চাকে হাত দেবে না। বাপ-ঠাকুরদার পেশার প্রতি এত ঘেন্না? চোখে জল এসেছিল নারায়ণের। অমলা বলেছিল, 'কেঁদে কী লাভ?'

তাগাদায় এসে মহাজন প্রভু মণ্ডলের ছেলে চাপড় মেরেছিল ওর ছেলের বউয়ের পাছায়। ছেলে বাড়ি নেই, বুড়ো কলজেয় জোর ছিল না কিছু বলার। সেদিনও যেন বাতাসে ভাসছিল কথাটা, 'কেঁদে কী লাভ?'

চাকটা কাত হয়ে আছে একপাশে। হাতের কাদা-জল শুকিয়ে খরার মরসুমে চাষের মাটির মতো ফাটা-ফাটা দাগ জেগে উঠেছে। সোজা হয়ে বসে নারায়ণ, দেড়-হাতি লাঠি দিয়ে বনবন ঘোরাতে থাকে চাক।

দাসপুরের হাট থেকে আধঘণ্টার হাঁটাপথ। পৃথিবীর গতি আশ্বিন ছাড়িয়ে কার্তিকে, তবু রোদ বেশ চড়া। গাছতলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে গোপাল সাহা। বয়স তো আর কম হল না, এটুকু হেঁটেই ঘামে ভিজে গিয়েছে জামা। মিনিট দুয়েক বাদে একটা ভ্যানরিক্সা এসে দাঁড়ায়, 'কোথায় যাবেন বাবু?'

ভ্যানওয়ালার চেহারা বেশ ভীতিপ্রদ। রোদে পোড়া ফিনফিনে চামড়ার

নীচে শরীরের হাড়গুলো স্পষ্ট গোনা যায়। খালি গাড়ি টেনেই তার জিভ বেরিয়ে গিয়েছে! চেহারা দেখে ভরসা জাগে না, তবু বেগতিক-।

– নারা'ণ পালের বাড়ি চেনো?

– ক্যানে চিনব না? মাঝেমধ্যিই তো খদ্দের লে যেতি হয়।

কথা না বাড়িয়ে তার গাড়িটিতে চড়ে বসে গোপাল সাহা। ভ্যানে চড়লেই কেমন যেন খটকা লাগে, পিছনদিকে পা ঝুলিয়ে বসতে হয়তো, গাড়ি চললে কেবলই মনে হয় উলটোদিকে ছুটছে বুঝি! অথচ সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই তো নিয়ম।

আজ রওনা দেওয়ার সময় থেকেই একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। বরাহনগর বাজারে তার পাইকারি দোকান, 'মাটির সংসার'। থালা, মালসা, হাঁড়ি, সরা, ঘট, কুঁজো, জালা– মোটামুটি সবরকমের জিনিস থাকলেও তার দোকানের মূল বৈশিষ্ট্য প্রদীপ। সে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর ধরে দীপাবলি-কালীপুজোর আগে বাছাই করা কুমোরদের থেকে প্রদীপ জোগাড় করে করে আনে।

সাধারণ একমুখী প্রদীপ থেকে চতুর্মুখী, পঞ্চমুখি, কমলমুখী, নাগমুখী, ঘোটকমুখী, অর্ঘ্যমুখী, চতুর্দশমুখী, দীপান্বিতা— কত তার ধরন, কত তার রঙ-রূপের বাহার! আবার স্থান অনুসারেও প্রদীপের রূপ বদল হয়। একটু অভিজ্ঞ চোখ ধরতে পারে চব্বিশ পরগনার প্রদীপ আর হুগলির প্রদীপ এক নয়।

আবার পার্বতীপুর, সামাদবেড়িয়া, রাজনগর, রাধাবন, কোতলুই— প্রতিটি এলাকার প্রদীপের আলাদা আলাদা নিজস্বতা। কিন্তু তার কদর করার লোক কোথায়? ঘূর্ণিগ্রামের সাধন পাল একবার চতুর্দশমুখী প্রদীপের গায়ে টেরাকোটার কাজে সাতকাণ্ড রামায়ণ ফুটিয়ে তুলেছিল। পেশায় ব্যবসায়ী হলেও প্রাণে ধরে বেচতে পারেনি সে। এই সাধন পাল, নারায়ণ পালদের সঙ্গে তার সম্পর্ক তো শুধু ক্রেতা-বিক্রেতার নয়, দুই দশক ধরে এই লুপ্তপ্রায় লতাগুল্মদের সাধ্যমতো সার-জল জুটিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু আজ?

নারায়ণ দুই হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে। সকালের ডাউন ডানকুনি লোকাল, বেশ ফাঁকা। এর আগে ও কোনোদিন কলকাতায় যায়নি। একান্ত নিরুপায় বলেই আজ ট্রেনে ওঠা। গন্তব্য গোপাল সাহার দোকান। সে বিচক্ষণ লোক, কিছু না কিছু রাস্তা ঠিক বাতলে দেবে।

বড়ো বিপদে পড়েছে নারায়ণ। সেদিন গোপাল সাহা ধরানো বায়না অর্ধেক করে গেল। সে আগে যা ভেবেছিল তার তুলনায় নাকি এবার প্রদীপের চাহিদা অনেক কম। বায়নার টাকা মাফ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে আর কতটুকু? খড়, কয়লা, রং-তুলির জন্য মহাজনের কাছে অনেকগুলো টাকা ধার। বায়না বাতিল হলেও ধার তো আর তামাদি হবে না। কদিন ধরে মাঝেমাঝেই মহাজনের ছেলের চেহারা মনে পড়লে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডাস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। অগত্যা, প্রদীপের ঝুড়ি নিয়ে রওনা দেওয়া কলকাতার পথে।

আগের স্টেশনটি ছিল দক্ষিণেশ্বর। ট্রেন থেকেই চোখে পড়েছিল বিশাল

মন্দির। কালীপুজোর এখনও তিনদিন বাকি। ভরসা পেয়েছিল, মায়ের এত কাছে এলে কি আর কারও আর্তি বিফল যায়?

কিন্তু, বরাহনগর স্টেশন আর বরাহনগরের মাঝে যে প্রায় মাইলখানেকের ফারাক, সেই ধন্দটা বুঝতে পারেনি। স্টেশন-ব্রিজের তলায় দাঁড়িয়ে ও থৈ পাচ্ছিল না– কোনদিকে যাবে। শয়ে শয়ে বাস, লরি, ট্যাক্সি, অটোরিক্সা ছুটছে। মানুষ যা দেখা যায়, তারাও খুব ব্যস্ত। যতদূর চোখ যায়, দশকর্মার দোকান একটিও নজরে আসে না। গোপাল সাহাকেও চেনে না কেউ। ঝুড়ির ওজন অনেক, মাথায় নিয়ে হাঁটাচলাতেও কষ্ট। নারায়ণ ব্রিজের নিচে ফুটপাথে বসে পড়ে।

ফুটপাথ লাগোয়া এক কালীমন্দিরে পুজোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে এর মধ্যেই। মানুষের ভিড়। শাকসব্জি, ফল, মাংস, মিষ্টি, মুদিখানা, পান-বিড়ি-সিগারেট, হরেক জিনিসের একের পর এক দোকান। আলো ঝলমল করছে চারদিকে। আতসবাজি, শস্তা জামাকাপড় আর মোমবাতি-টুনিলাইটের অস্থায়ী কয়েকটি দোকানও বসেছে বেশ জাঁকজমক করে।

এইসবের থেকে একটু দূরে, পৌরসভার সুলভ শৌচালয়ের পাশে ঝুড়ি নিয়ে বসে নারায়ণ। গত কয়েকদিন মাথায় তেল-জল পড়েনি। গালে কদমফুলের মতো দাড়ি। পরনের ধুতি-ফতুয়া এমনিই মলিন, তার ওপর রাস্তার কালি-ধুলোয় এখন যা রূপ, দেখেই দু-হাত দূরে সরে যাচ্ছে লোকজন। নারায়ণের সেদিকে মন নেই। ও ভাবছে, আজব শহর এই কলকাতা। দীপাবলির আগে একঝুড়ি প্রদীপ নেওয়ার মানুষজন পাওয়া যায় না! ওদিকে রাস্তাজুড়ে অমুক-তমুক পুজোকমিটি, শাড়ির দোকান, পার্টি-অফিস, টিভি-গাড়ি-মদ-মোবাইল কোম্পানির 'শুভ দীপাবলি' লেখা ইয়া বড়োবড়ো ব্যানার আর পোস্টার। আর সবেতে প্রদীপেরই ছবি লাগানো।

যা এনেছিল দু-দিনে তার চারআনাও বিক্রি হয় না। খদ্দের যা-ও বা কয়েকজন আসে, কেউ বলে, 'প্রদীপ রেখেছ, সলতে রাখো নি?' কেউ বলে, 'পোড়ামাটির তো, নাকি কাঁচামাটির ওপর রং করে এনেছ?' কেউ বলে, 'বারো টাকা ডজন? বলো কী? গেল-বছরই তো পাঁচ টাকা ছিল!'– ফুটপাথে যারা ঝুড়ি নিয়ে বসে, সারা দেশে তারাই যেন একমাত্র প্রতারক!

দীপাবলির আগের দিন পাশের এক দোকানদার বুদ্ধি দেয়, 'এখানে আর তেমন সুবিধা হবে না। দক্ষিণেশ্বর যাও। মায়ের পুজো, অনেক লোক হয়।'

কিন্তু, অভাগা যেদিকে ধায়, সাগর শুকায়ে যায়। বুক ফেটে কান্না আসছে। ঝুড়ির প্রদীপগুলো যেন অনূঢ়া কন্যার মতো উদাসী। ওর এক দূর সম্পর্কের কাকা, বদ্রিনাথ পাল বর্ধমানের রাজবাড়িতে প্রতিমা বানাত। ছেলেবেলায় দেখেছে, প্রতিমার নেত্রদানের মুহূর্তে নাটমন্দিরে যেন উৎসবের মেজাজ! ঢাক, কাঁসর, শাঁখের শব্দে শিহরণ জাগত গায়ে। আহা, মায়ের সে কী রূপ! রং-তুলি হাতে বিহ্বল ভাবে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকত বদ্রিকাকা। ওরও এমন দশা হয় প্রদীপের ওষ্ঠদানের মুহূর্তে। ঠোঁট নিখুঁত না হলে কি আর হিরের কুচি ছড়ানো

হাসির মতো আলো জ্বলে?

লাউডস্পিকারে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ। পুজোর এক-এক পর্বে যখনই ভেসে আসে ঢাক-কাঁসরের শব্দ, বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। ওই, শেষের পথে আর এক পা এগিয়ে গেল দীপাবলির রাত! প্রায় অসম্ভব কিন্তু গভীর আন্তরিক আশাটির বুনোটে ফাটল ক্রমশ বাড়ে। তখনও তো রাত কিছুটা বাকি, কেউ একজনও কি আসবে না,– কদরদার, একটু কম হিসেবি লোক,– নিয়ে যাবে ওর সমস্ত প্রদীপ?

ধুতির গিঁঠে সামান্য কিছু টাকা। সামনের এক দোকান থেকে তেল, সলতে আর দেশলাই কিনে ফেলে নারায়ণ। রাস্তার ধার বরাবর সাজাতে থাকে প্রদীপগুলো।– সে এক অপূর্ব দৃশ্য! চোখ ভাসিয়ে কান্না নামে ওর। তিনদিন ধরে নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঝুড়িতেই এলিয়ে পড়ে দুর্বল শরীরটা।

কালীপুজোর রাতটা প্রতিবার দক্ষিণেশ্বরেই কাটায় গোপাল সাহা। নাটমন্দিরে বসে বিষয়-চিন্তা পাপ। কিন্তু, এবার বড়োই অস্থির লাগছিল। যাদের কাছ থেকেও মাল নেয়, তাদের মধ্যে নারায়ণ পালের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সেই অসহায় মুখ। কে জানে, হয়তো দেনার দায়ে হাঁড়ি চড়াও বন্ধ হবে লোকটির। একটা অপরাধবোধ বড্ড খোঁচা মারছে মনে। কিন্তু কী-ই বা করত সে? একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসার ধর্ম তো মানতেই হবে। না মানলেও কতজন নারায়ণকে বাঁচাতে পারবে সে?– মুদিখানা আর দশকর্মার দোকানগুলো আছে বলে রক্ষে, হাঁড়ি-মালসার ব্যবসায় তো মূলধনে হাত পড়ার দশা!

পুজো শেষ হল ভোররাতে। সূর্যোদয়ের পর গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি ফেরা। ফেরার পথে থমকে দাঁড়ায় গোপাল সাহা। রাস্তার ধার ঘেঁষে প্রায় শ-খানেক নিভে যাওয়া প্রদীপ। ঝুড়ির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক বুড়ো।– আরে, নারায়ণ না? বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে, বেঁচে আছে তো?

কুমোরের চাক ধর্মেই গতিশীল আর কুমোরের জীবনের গায়ে যেন কয়েক শতাব্দীর শেওলা। কিন্তু প্রথমে কলকাতার রাস্তায়, আর তারপর হাসপাতালে ছয়-সাতদিন কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পর থেকে নারায়ণের জন্য যেন একের পর এক চমক অপেক্ষা করছিল। ও যেদিন কলকাতা যায়, সেদিন বিকেলেই বিধান ফিরে এসেছে। শ্বশুরের সঙ্গে নাকি মিটমাট হয়ে গিয়েছে তার। সাধু মণ্ডলের চারখানা বাড়ির মধ্যে একটি মেয়ে-জামাইকে যৌতুক দিয়েছে, সঙ্গে লাগোয়া দোকানঘর।

ইলেকট্রিকের দোকান দেবে বিধান, তার শ্বশুরই জুগিয়েছে মূলধন। প্রস্তুতিও প্রায় সারা, মালপত্র আপাতত ডাঁই করে রাখা আছে একপাশে। একবস্তা এল.ই.ডি. টুনিও দেখতে পায় নারায়ণ।

অমলার মনে খটকা জাগে, মানুষটা চিরকালই কম কথা বলে, কিন্তু এ যেন ভূতে পাওয়া লোক! হয়েছেটা কী? আগেরদিন এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা, ফতুয়ার পকেট থেকে কিছু টাকা ধরিয়ে বলল, 'গোপাল সাহা দিয়েছে। যাও, ওদের সংসার গুছিয়ে দিয়ে এসো।'

অমলার কী দোষ,– নারায়ণ নিজেও কি জানে, কী হয়েছে ওর? রাগ না দুঃখ। ওই একটুকরো বারান্দায় বসে দিনরাত আকাশের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। রামু ঘরের মধ্যে খেলছিল। কিছু একটা নিয়ে মায়ে-ছেলেতে বেধেছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা ওর কানে আসে। ঘর থেকে একছুটে রামু ওর কাছে আসে। হাতে নারায়ণের বানানো চতুর্দশমুখী প্রদীপ, 'দাদা, এটা আমি নেব।'

ছেলের পিছে পিছে মা-ও হাজির, 'রেখে দে বাঁদর ছেলে। এক্ষুণি তো ভাঙবি!'

হঠাৎ নাতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে নারায়ণ। চোখ ভিজে যায়, 'নিতে দাও বৌমা, নিতে দাও। ভাঙুক, খেলুক, গড়ুক, যা ইচ্ছা তাই করুক।'

আজ বিধানরা ও বাড়ি চলে যাবে। তাড়াতাড়ি সারতে হবে রান্না। কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে উনুনে আঁচ দিয়ে সামন্তদের পুকুরপাড়ে গিয়েছিল অমলা।– অর্দ্ধেক দাম বাকি রেখে অনেক মিনতি করে সাত-আটশো গ্রাম ওজনের একটা পোনা মাছ এনেছে। কিন্তু, বাড়ি ফিরে সে অবাক। নারায়ণ সাতসকালেই মাটি মাখতে বসেছে!

– কী ব্যাপার গো?

– সামনে ছটপুজো না? আসছে হপ্তায় পাটনা যাব বৌ। শুনেছি ওদেশে প্রদীপের খুব কদর।

*****

'বর্তমান', ২০১৬

কাছিম

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। জীববিজ্ঞান ও জলবায়ু-বিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এর আগে তিতিরের বেশ কিছু গবেষণাপত্র এখানে-ওখানে প্রকাশ পেলেও এত বড়ো মঞ্চে এই প্রথম। এক সপ্তাহের সম্মেলন, আজ চতুর্থ দিন। যতটুকু পারছে, মনযোগ দিয়ে শুনছে বাকিদের কাজের বিষয়ে। এখানে স্বল্প পরিচিত বা বিতর্কিত কোনো বিষয়ে আলোচনায় বিশেষ ছুৎমার্গ নেই। গতকালই, অসাধারণ একটা প্যানেল ডিস্‌কাশন ছিল গাছের ওপর ক্লাসিকাল আর রক মিউজিকের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ওপর! তাহলে কি শৈশবে পড়া স্বার্থপর দৈত্যের গল্প নেহাৎই রূপকথা নয়?

একজন ডাচ্ আবহাওয়াবিদ বললেন 'বাটারফ্লাই-এফেক্টে'র কথা। কালিংপঙের প্রজাপতি ডানা নাড়লে নাকি ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘূর্ণিঝড় হতে পারে! –এই ছোটো ছোটো হাজার-একটা অনুঘটক নিয়ে আবহাওয়া, যার আন্দাজ পেতে আধুনিক বিজ্ঞানের হাতেও কিছু তথ্যসাপেক্ষ ডিডাক্‌শন ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

শুনে তিতিরের মনে হয়, এই বাটারফ্লাই-এফেক্ট্ মানুষের জীবনেও থাকে। নইলে, অতীতের নিতান্তই তুচ্ছ কিছু ঘটনা বারবার ভবিষ্যতের নির্ণায়ক হয়ে ওঠে কেন?

গত দশ বছরে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়া পাঁচটি প্রাণী নিয়ে বলছিলেন ফিনল্যান্ডের এক গবেষক। এক বিলুপ্ত প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিমের ছবি সামনের পর্দায় ভেসে উঠতেই তিতির চমকে যায়,– এ তো সেই কাছিমটা!

কাছিমটা ছিল। তখন পাড়াটাও ছিল অন্যরকম। বোসবাড়ির ফ্রিজে পালবাড়ির মাখন, সেনগুপ্তর বিবাহবার্ষিকীর বাড়তি 'প্লাস্টিক-চাটনি'। সাধুখাঁর ছেলের বৌভাতে দাস, বিশ্বাস, মিত্র, মন্ডল, চক্রবর্তী –সব বাড়ির ছেলেরা সদ্য ইস্তিরি করা প্যান্টের ওপর গামছা বাঁধত।– একহাতে গামলা, অন্যহাতে পরিবেশনের চামচ। বিজয়ার সময় ক্লাবঘরে খবর দিতেন মল্লিককাকীমা রায়জেঠিমা,– মাংসের ঘুগনি বা ক্ষীরের মালপোয়ার।

শুধু হাতের লেখা ভালো হওয়ার সুবাদে অন্ততঃ একডজন কচি, পাকা, কাঁচামিঠে প্রেমকাহিনীর হাল-হকিকত জানত নন্দীবাড়ির মন্টু। পাশের বাড়ির

সঞ্জয়দাকে জেলুসিলের পাতা কি নকুলদানা আনতে বলার আগে দু'বার ভাবতেন না মজুমদার বাড়ির রাঙাদিদা। আবার সেই দিদার নিজের নাতিকে চটকলের মাঠে সিগারেট টানতে দেখে ধমক লাগিয়েছিল সঞ্জয়দা।...

তখন তিতির আর কেকা বন্ধু। সে'বার দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিল ওরা। কয়েকদিন শুধু সমুদ্রে দাপাদাপি করেই কেটে গেল। ফেরার দিন সন্ধেয় সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখে মনখারাপ করছিল খুব। ঢেউ এসে পায়ের পাতা ভিজিয়ে যাচ্ছে বারবার। হঠাৎ কী যেন পয়ে একটা ঠেকল! –ছোট্ট কাছিমছানা। সমুদ্রের কাছিম সৈকতে ডিম পাড়ে, তার-ই একটা। ঢেউয়ের দোলায় উল্টে গিয়েছে। ভয়ে খোলের মধ্যে পা-মাথা ঢুকিয়ে ফেলেছে।– যেন একটা বড়ো মাপের কড়ি!

– কী মিষ্টি দেখতে! আমি পুষব।

– রাখবি কোথায়?

– কেন, কেকাদের ওখানে!

কেকাদের বসার ঘরে অনেকগুলো অ্যাকোরিয়াম একদিকের প্রায় গোটা দেওয়াল জুড়ে।– সাত-আট জাতের টেট্রা, গোল্ডফিশ, রেইনবো, সিকলিড, ডিসকাস, র‍্যামফিশ,– অভাব নেই কিছুর!

তখন দেখতে দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। কে জানে, হয়তো সেই জন্যই আজ ও মেরিন-লাইফ নিয়ে গবেষণা করে চলেছে এতগুলো বছর ধরে।– হয়তো ওই সময়গুলিই ওর জীবনের বাটারফ্লাই এফেক্ট্।... কিন্তু, কাছিমের কী হল শেষ পর্য্যন্ত?

দাদার চিনারপার্কে ফ্ল্যাট। বাবা-মা ওখানেই থাকে এখন। তিতিরও অধ্যাপনার সুবাদে কোয়ার্টার পেল, সেই থেকে পাকাপাকি ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা। পুরোনো পাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। হয়তো থাকত, যদি না-!

কাছিমের জীবন অনেক সহজ। অন্ততঃ কোনো প্রতিযোগিতার বালাই নেই। তবু কেন যে হারিয়ে যায়! ওদের জীবনকাল তো অনেক বড়ো, কোনোমতে যদি আজও বেঁচে থাকে,– একটি প্রজাতি তাহলে রক্ষা পায়। কিন্তু, খোঁজ কে দেবে? শুধু ডাক্তারিতে সুযোগ পাওয়া-কে ঘিরে দুই পরিবারে যে এমন প্রতিযোগিতার চোরাস্রোত থাকতে পারে,– ওর কল্পনাতেও আসেনি। শুধু পরিবার কেন, গোটা পাড়াও যেন দু'টি শিবিরে বিভক্ত! কেকা সিভিল সার্জেনের মেয়ে,– তিনতলা বাড়ি, দু'টি গাড়ি। অতএব, একজন সাধারণ চাকুরের মেয়ে হিসেবে তিতিরের নৈতিক কর্তব্য তাকে হারিয়ে দেওয়া।

বাড়ির একতলায় চেম্বার করেছে কেকা। পসার বলার মতো কিছু নয়। ঘটনাচক্রে, খালপাড়ের বস্তির মানুষগুলো বাদে রুগী তেমন কিছু হয় না বললেই চলে। একটু রেস্ত থাকলে লোকে খোঁড়া ডাক্তারনির কাছে যাবেই বা কেন?...

কেকার হাউস-ইন্টার্নশিপের সময়ের ঘটনা,– রাতের ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিল। একেই শীতকাল, তার ওপরে তখন দিনের আলো-ও ফোটেনি।

মেডিক্যাল কলেজের মতো জায়গাতেও একটা ট্যাক্সির নামগন্ধ নেই! ক্লান্ত শরীর। কুয়াশা ঠেলে হাঁটছিল। হঠাৎ ম্যাটাডোরের ধাক্কায় পথ চলা থমকে গেল সারাজীবনের জন্য।

এক বিলুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কাছিম থেকে পুরোনো পাড়া, প্রায় হারিয়ে ফেলা বন্ধুত্ব। মনের গতিবিধি আবহাওয়ার মতোই! মাঝেমাঝে কেকার জন্য খুব খারাপ লাগে তিতিরের। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, আজ সে পঙ্গু না হলে এত সহজে কি এই টান ফিরে আসত? –কে জানে!

কিছুদিনের মধ্যেই বেশ বড়োসড় হয়ে ওঠে কাছিমটা। অত বড়ো অ্যাকোরিয়ামেও বড্ড বেমানান লাগত। পাড়ার পুকুরে ছেড়ে আসতে হয়। পুকুরের একদিকে মাঠ, অন্যদিকে আবীরকাকুদের ভাঙাচোরা একতলা বাড়ি। আবীরকাকু সাতের দশকের জেলখাটা মানুষ, অবশ্য তিতিরের স্মৃতিতে শুধুই খুঁড়িয়ে হাঁটা টিউশন মাস্টার। বাবা বলত,– 'আবীরটার নিজের দোষেই কিছু হল না। ওর সঙ্গী-সাথীরা কোথায় উঠে গিয়েছে!'

আবীরকাকু বলত, 'অমলকান্তি বিদ্রোহী হতে চেয়েছিল, শেষে তাঁবেদার হয়েছে।'

কাছিমটা বিকেলের দিকে পুকুর থেকে মাঠের পাশে উঠে আসত। তাকে দেখতে পেলেই পাড়ার গোলকীপার বিজন খেলা ছেড়ে উল্টে দিয়ে যেত। খোলের ওপর শুয়ে বৃথাই পা-মাথা নাড়ত বেচারা। আবীরকাকু একদিন বলেছিল, 'এ তো দেখি রায়-বাহাদুরের মন্ত্রীসভা!'

এদিকে আজকাল রিক্সার বদলে টোটোর চল বেশি। পাড়ায় ঢুকতেই মনে আশঙ্কা, আবীরকাকু বেঁচে আছে তো? পুরোনো বাড়ির গলির মুখে তিতির টোটো ছেড়ে দেয়। চারপাশের মুখগুলো নতুন। হরিকাকুর টেপ-টিভি-রেডিও সারাইয়ের দোকানটা আর নেই। তিনতলার জানালায় আর চারতলার ব্যালকনিতে দু'টি কৌতূহলী মুখ। তিতিরের খেয়াল হয় –ও বেশ কিছুক্ষণ একটি ফ্ল্যাটবাড়ির পাঁচিল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। দাদা বন্দোবস্ত করে গিয়েছিল। ওদের আর দাসজেঠুদের বাড়ি মিলিয়ে এই 'আশাবরী আবাসন'।

কেকাদের বসার ঘরে তার বাবা-মায়ের বড়ো ছবিটা এখনও রয়েছে। পাশাপাশি দুটি গার্ডেন চেয়ারে তারা দু'জন, ব্যাকগ্রাউন্ডে হাতে আঁকা পাহাড়-ঝরনা। তফাৎ শুধু ফ্রেমে আটকানো সাদা মালাটা। এতদিন পর ফোন, বাড়ি আসতে চাওয়া –তখন কেকা কিছুটা অবাক হয়েছিল সন্দেহ নেই, তবে আসার কারণ শুনে হেসে ফেলে।

– ফোন করব-করব ভাবতাম রে, কিন্তু কিছুতেই তোর নাম্বারটা– শেষে পুরোনো ডায়েরী ঘেঁটে-

– এলি তো অন্ততঃ। খবর কী বল।

'চলে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রী, নিজের রিসার্চের কাজ।' মজা করার চেষ্টা করে তিতির, 'আসলে আমার নামের আগের 'ডক্টর'টা তোর-টার মতো লোকের

উপকারে লাগে না তো, তাই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি।'

– বিয়ে করেছিলিস না?

– টিকল না।

– কেন? অবশ্য তুই যদি বলতে না চাস-।

সোফার গায়ে হাত বুলোয় তিতির, 'জাস্ট্ হল না।'

– টিকিয়ে রাখার কোনো কারণই খুঁজে পেলি না?

– না।... হয়তো খুব একটা চেষ্টাও করিনি।

কেকা ম্লান হাসে, 'আমাদের যাবতীয় যুক্তির দৌড় তোর ওই কাছিমের মতো। বিপদ বুঝলেই খোলের ভিতর মুখ ঢোকায়।

– ফিলোজাফার হয়ে গে'ছিস!

– জীবনে গতি কমলে ফিলোসফি ফিরে আসে বোধহয়!

নিজের রসিকতায় কেকা একাই হেসে ওঠে। ওর গলায় কোনো শ্লেষ নেই, অথচ কী যেন একটা তিতিরের মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকে।

– ওহ্ ভালো কথা, তুই কি স্পিসিসটার ব্যাপারে শিওর?

– হ্যাঁ। পরে ভেরিফাই করেছি। আর আমাদেরটারও চেহারা যতটা মনে আছে-। আচ্ছা, পুকুরেই তো ছাড়া হয়েছিল, তাই না?

– গিয়েছিলিস ওদিকে?

তিতির মাথা নাড়ে,– না।

– শুকিয়ে গিয়েছে প্রায়। ওটা তো আবীরকাকুদের, কাকু চলে যাওয়ার পর-

– সে কী! আবীরকাকু-?

– অনেকদিন হল। পুকুর বুজিয়ে ফ্ল্যাট হবে শুনেছিলাম। মাটি ফেলাও সবে শুরু,– তারপরেই মামলা। এখনও চলছে। কিছুই হল না, এদিকে পুকুরটাও দিন দিন শুকোতে থাকল!

'কেন?' –প্রশ্নটা করেই ওর মনে হল বড্ড বোকা-বোকা হয়ে গেল।

কেকা হাসে, 'জলের কি অভিমান হতে নেই?'

– কাছিমটা নিজে নিজে অন্য কোথাও যেতে পারে না?

– কাছাকাছি জল কোথায় আর?

– ইশ্, তখন যদি জানতাম-!

কেকা ওর কথাটা শেষ করতে দেয় না, 'তাহলে কিছুতেই ছাড়তিস না, তাই তো?'

তিতির চুপ। হতচ্ছাড়া কাছিম সব প্রসঙ্গে ঢুকে পড়ছে কেন? এই পাড়ায় আরও অনেক কিছু পড়ে আছে।– অযত্নে, অবহেলায়। এক যাত্রায় কতটুকুই বা কুড়োনো সম্ভব?

যোগেশ্বর,– যোগী। টিভি-সারাইওয়ালা হরিকাকুর ছেলে। 'সাত চড়ে রা কাড়ে না' গোছের। ওদের চেয়ে বছর-দুয়েকের ছোটো-ই হবে। ওরা একটা করে

ক্লাস ডিঙোলেই হরিকাকু ছেলের জন্য পুরোনো বই, নোটের খাতা নিয়ে যেত। আর ওদের দুজনের নানার বায়নাক্কায় রসদ জোটাত যোগী। টোপাকুল থেকে কামরাঙা, পেনের রিফিল থেকে ঘটিগরম,– সে সবসময় ছুটছে। প্রথম প্রথম কাছিমটা খাচ্ছিল না কিছু। এই যোগী-ই নরম শ্যাওলা, জলের নিচের ছোটো ছোটো গাছ জোগাড় করে আনে।

– কোত্থেকে পা'স রে এ'গুলো?

– বড়ো রাস্তার ওপারে।

– ওপারে কোথায়?

– চটকলের জঙ্গলে পুকুর আছে একটা।

– আমাকে নিয়ে যাবি?

– তোমাকে!...

অ্যাকোরিয়ামের জলে কাছিমটাও সারারাত সাঁতার কাটত কিনা– কে জানে, ওই সময় তিতির কিন্তু প্রায় রোজরাতেই স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নগুলো 'কেমন যেন'!– কিছু কিছু কেকা জানত, বাকিগুলো বলতে পারেনি কাউকে।

ও তখন ক্লাস নাইন। একদিন সন্ধেবেলায় পার্কের পিছনদিকে, অর্জুন গাছের আড়ালে,– ব্যাপারটা ছেলেমানুষীই! তাই প্রথম চুমুর স্মৃতিতে ভালোবাসার বদলে লেগে রইল কৌতূহলপূরণের লজ্জা। যোগী আর কোনোদিন শ্যাওলা বা কামরাঙা হাতে ওদের সামনে আসেনি।

কেকার কথায় আজকের দিনটা সে থেকে গেল বটে, কিন্তু পরিষ্কার মনে হচ্ছে –কোথায় যেন তাল কাটছে বার বার। কাছিমের জন্য 'একাডেমিক ইন্টারেস্ট্'-টুকু হয়তো আছে।– কিন্তু, খোঁজার যে তাগিদ বিগত কিছুদিন ধরে তাড়িয়ে মারছিল, এই মুহূর্তে তার রঙ কিছুটা ফিকে।

স্নান সেরে গেস্টরুমে ঢোকে কেকা। তার সিঁথির দিকে এতক্ষণ নজর পড়েনি, বেশ অবাক হয় তিতির, 'বিয়ে করেছিস?!'

– বছর খানেক।

– কী করে সে?

কেকার ঠোঁটে হাসির আভাস।– প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ?

– 'কে'-এর বদলে 'কী করে' প্রশ্নটা প্রথমে মাথায় এল?

– না, মানে ঠিক-

– স্কুল মাস্টার। প্রাইমারী। বসিরহাটের দিকে।

– কে?

– তোর যোগীকে মনে আছে?

এ কি শুধুই সমাপতন? কেকা আর যোগী!– মোটা দাগের সিনেমার বাইরে কি এমন হয়?

– অবাক হো'স না। গভীর আঘাতে অনেক সময় অহেতুক কাঁটাতারগুলো ভেঙে যায়।...

কাছিমের সৌজন্যে আজ পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পরেছে ওরা। কুয়াশা আর শিশির মাখা বি.টি. রোড। এখন ধুলো, ধোঁয়া বা পোড়া ডিজেলের ঝাঁঝ অনেকটা কম। সরু রাস্তাটা এই বি.টি. রোড টপকে সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পড়েছে। বি.টি. রোড ঘেঁষা সদ্য গজানো কয়েকটা ফ্ল্যাট বা শো-রুম। ডিঙোলেই ধাঙরপট্টি। একদল লোম-ওঠা ঘেয়ো কুকুরের স্যানেটরী ন্যাপকিন কাড়াকাড়ি। কাঁচা নর্দমা। তেলচিটে চায়ের দোকান। একপাল শুয়োরের ঘোঁৎ- ঘোঁৎ কুচকাওয়াজ!- অসুন্দর কিছু দৃশ্য! তবে সভ্যতার অগ্রগতির ওপর 'ভরসা' করা যায়,- বি,টি. রোডের ধার তো ছুঁয়েই ফেলেছে, কিছুদিনের মধ্যেই এ'সব ধুয়ে মুছে যাবে।

চটকলের প্রাচীর সরু রাস্তাটির ছায়াসঙ্গী। অগুনতি ঘুঁটের মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা হাতে লেখা পোস্টার।- মালুম হয় ধর্মঘট চলছে। তবে 'ধর্মঘট' শব্দটি শুনলেই যেন গায়ে আগুনের আঁচ লাগে,- এখন আর ব্যাপারটা ঠিক তেমন নেই। বিশবছর ধরে চটকলের উৎপাদন বলতে পাটের বস্তা।- 'মরি মরি' করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা! কী জানো তিতিরদি, বর্তমানের মুখের ওপর থেকে জরীর ওড়নাটা সরালে বলিরেখা ছাড়া আর কিছু পড়ে থাকে না।...

যোগীর মুখে চটকলের গল্প শুনতে শুনতে অবাক হচ্ছিল তিতির। সে'সময় রাস্তার মোড়ে চাঁদার কৌটো হাতে বা বাড়ির দরজায় ধূপকাঠি-ফিনাইলের ঝোলা কাঁধে কিছু চটকলের শ্রমিক দেখেছে, কিন্তু দৃশ্যগুলো স্পর্শ করেনি তেমন। কিন্তু, সেই কাকু-জেঠুরা আজ কোথায়? -কত কিছুই যে বিলুপ্ত হয়ে গেল!

মরচে-ধরা গেট। ঠেলেঠুলে চটকলের ভিতরে ঢুকল ওরা। কোনো একসময়ে বাগান ছিল এ'দিকটা। এখন বেশ ঘন জঙ্গল। মাটিতে শেয়ালের পায়ের ছাপ। হঠাৎ কাছাকাছিই কোথাও তক্ষক ডেকে ওঠে।

- এত কাছে গঙ্গা থাকতে তুই এখানে এনেছিলিস কেন?

যোগী কিছুটা সময় চুপ করে থাকে।

- পাড়ার পুকুরে তখন মাটি ফেলা শুরু হয়েছে। একদিন দেখলাম কাছিমটার মর-মর অবস্থা। -বাড়ি নিয়ে গেলাম। ... তখন কেকা অ্যাম্পিউটেশনের যন্ত্রণায় ছটফট করছিল।- সহ্য হত না দৃশ্যটা।... একটা দুর্বলতা তো ছিলই, প্রতিদিন যেতাম। ঘরের এক কোণে ঝিমিয়ে থাকত কাছিমটা।... হঠাৎ একদিন মনে হল,- রূপকথার গল্পের মতো ও-ই বোধহয় তোমার বন্ধুর প্রাণভোমরা! ও যদি বাঁচে, কেকাও বাঁচবে।

তখন আর কিছুই ছিল না। একটা চাকরিও না। অন্ধের মতো বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে ধরলাম। ধীরে ধীরে দু'জন ভালো হয়ে উঠল। বাড়িতে রাখা যেত না, কিন্তু প্রাণে ধরে গঙ্গায় ছেড়ে আসতেও পারিনি। মনে হল,- কী জানি, যদি সত্যি-সত্যিই কেকার সঙ্গে কাছিমটার কোনো যোগ থাকে, একজন কাছাকাছি থাকলে যদি দ্বিতীয়জনও কোনো একদিন-।

গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদের ঝিলিক। ওরা পৌছে গিয়েছিল। এই সেই পুকুর। শ্যাওলা আর জলজ লতার ফাঁকে ফাঁকে শালুক ফুল। তিতিরের বুক

টিপটিপ করতে শুরু করে,– এত কাছে এসেও যদি না দেখেই ফিরতে হয়? যদি সত্যিই কিছু হারিয়ে গিয়ে থাকে?...

ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছিল তিতিরের। ভোর থাকতেই দিল্লী থেকে উড়েছে, আকাশের রঙ এখনও কমলা। পশ্চিমগামী ইন্টারন্যাশানাল ফ্লাইটের ভোরগুলি এমন প্রলম্বিত-ই হয়। ব্রেকফাস্ট ঘোষণা হয়েছে। ইচ্ছে নেই তেমন একটা। সীট-পকেট থেকে এ'মাসের 'ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক্' পত্রিকাটা তুলে কয়েক পাতা উল্টে ওর চোখ আটকে যায়। প্রায় লাফিয়ে ওঠে হঠাৎ;– কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে নিশ্চয়॥

*****

'বর্তমান', ২০২০

অবলাকান্তের দপ্তর

কাশীরামবাবুর বৈঠকখানায় সেজবাতি জ্বলিতেছে। বাবুগণ 'ম্যানেজমেন্ট' নামক এক জটিল বিষয়ে জটিলতর আলোচনায় রত। আমি আফিম চড়াইয়াছি। বস্তুতঃ, নিজস্ব অজ্ঞানতার হেতু এইরূপ আলোচনাকে আমার 'চোনা'-র সমার্থক বলিয়া ভ্রম হওয়াও একান্ত অস্বাভাবিক নয়। সেই কারণে, আজ আফিমের মাত্রা দ্বিগুণ করিয়াছি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম, কোথা হইতে একখানি পতঙ্গ আসিয়া চারিপার্শ্বে উড়িতে লাগিল। বিস্ময়জনকভাবে ইহা স্বভাবসিদ্ধ 'চোঁওও' অথবা 'বোঁওও'-এর পরিবর্তে 'স্ট্র্যাটেজিক ভেরিয়েবল', 'প্রোঅ্যাকটিভ ওরিয়েন্টেশান', 'অরগানাইজেশানাল গ্রেপভাইন', 'স্লিপারি স্লোপ', ইত্যাদি যুগপৎ অতিমানবিক ও অমানবিক শব্দে গালিগলাজ করিতে লাগিল। চটিয়া কহিলাম, 'তুমি কে হে নচ্ছার? ভদ্রগৃহে অযাচিত প্রবেশ করিয়া কটুবাক্য কহিতেছ?'

প্রসঙ্গতঃ কহিয়া রাখি, আফিম প্রসাদৎ আমি দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হই। শাস্ত্রে যাহাকে বলে 'প্রবদ্ধমিব সুপ্ত',– সকলের গোপন কথা কর্ণগোচর হয়, অদৃশ্য বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, ইত্যাদি।

যাহা হউক, পতঙ্গ কহিল– 'অযথা কাপ্তানি করিও না। তোমার চতুর্পার্শ্বে এই রূপ শব্দব্রহ্মের গুঞ্জন প্রত্যক্ষ করিলে নিশ্চিত হইবে নিকটবর্তী স্থলে অবশ্যই কোনো এম.বি.এ. উপস্থিত।'

আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত।– 'পূর্বে বি.এ. শুনিয়াছি। স্নাতক পণ্ডিতগণ নামের অন্তে যাহা লাঙ্গুল রূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু, এই এম.বি.এ. কী বস্তু?'

– ইহা স্নাতকোত্তর লাঙ্গুলবিশেষ। প্রদানকেন্দ্রের নাম বিজনেস-স্কুল। যদিও সেই ইশকুলের প্রবেশিকা যেই রূপ শক্ত, লাঙ্গুল ধারণের পদ্ধতি ততোধিক কিম্ভুত-কিমাকার। উচ্চ মেধা ভিন্ন সেই মহাকর্ম সম্পন্ন করা অসম্ভব।

বিস্ময় কাটে না। 'বন্ধুবর, কহিতেছ ইহা নাকি মেধাবীদিগের উপযুক্ত। কিন্তু, মেধা ও লাঙ্গুল– শরীরে এই দুই সত্তার তো পরস্পর বিপ্রতীপ অবস্থান! ইহাও কহিলে, এম.বি.এ. ধারণ করিতে কী এক বিচিত্র ইশকুলে গমন করিতে হয়। স্নাতক হইবার পর পুনরায় ইশকুলে গমন ভীমরতির লক্ষণ নয় তো?

পতঙ্গ দৃশ্যতঃ ক্রুদ্ধ– 'মূর্খের ন্যায় প্রগলভতা করিও না। এই ক্ষণে জানিয়া লও, একদিন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এম.বি.এ. জাতি ব্যতিরেকে কোনো প্রকার বাণিজ্যকর্ম

সম্পাদনা অসম্ভব হইবে।

পুনরায় অজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম, 'তুমি কহিলে এম.বি.এ.-জাতি! ইহা নূতন কোনো ধর্ম? কিছু কাল পূর্বে দেবেনবাবু, কেশববাবুরা ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,– সেই কথা জানি। কিন্তু, এই ধর্ম কাহার দ্বারা সৃষ্ট?

পতঙ্গের মুখমণ্ডলে বিদ্রূপজনিত হাস্য– 'স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও ইহার অধীন। ম্যানেজমেন্ট ভিন্ন তাঁহার পূজাকমিটিও অচল। তবে সঠিক কহিয়াছ, ইহা একপ্রকার ধর্মই বটে। দীক্ষাগ্রহণের পশ্চাতে ভাষা, পোশাক, আহার, কর্ম, প্রাকৃতিক কর্ম, নিদ্রা, মৈথুন তথা সম্পূর্ণ জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। বরাহ অবতার মহাপ্লাবন হইতে পৃথিবী রক্ষা করিয়াছিলেন, ধরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মনুর বিধান। সেই রূপে গ্লোবালাইজেশান নামক এক গলগ্রহপ্রায় গোলযোগে এই এম.বি.এ. ধর্ম ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে।'

সোৎসাহে এই নবধর্মের কিয়দ্ ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলাম। পতঙ্গ কহিল, 'শাস্ত্রানুসারে অপাত্রে দান পরিহার্য। তদুপরি ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম তোমার অনুর্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে কিনা– তাহাও সন্দেহাতিত নহে। তবুও ক্রমান্বয়ে কহিতেছি, শ্রবণ কর;-

আমাদিগের ভাষা মূলতঃ ইংরাজী। তবে অবিদ্বজন অথবা পারিবারিক পরিমণ্ডলে কথোপথনের নিমিত্তে 'বাংরেজী' নামক এক নূতন ভাষার পত্তন হইয়াছে। বাংলা জাতীয় ইতর ভাষা সভামধ্যে অনুচ্চার্য।

আমাদিগের আহার মূলতঃ সুরা-সঙ্গত ও বিলিতি মতানুসারে। মাংসজাতীয় খাদ্যে আমাদিগের রুচি এইরূপ প্রবল যে, খাদ্যগ্রহণকে খাণ্ডবদহন বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এহেন খাদ্যাভ্যাসের কারণে অধিকাংশের দেহে মেদিনীতুল্য মেদ বিদ্যমান থাকে। তবে সমস্ত প্রকার খাদ্য, এমন কি দুর্গাপূজার অষ্টমী-প্রসাদ অবধি, আমরা চমস ও কন্টকাকীর্ণ-চমস সহযোগে ভক্ষণ করিয়া থাকি। উক্ত তৈজসদুটি তোমার অপরিচিত বোধ হইতে পারে, উহাদিগের প্রচলিত নাম স্পুন ও ফর্ক।

দেশীয় শৌচালয় অতীব অস্বাস্থ্যকর। তাই প্রাকৃতিক কর্মের নিমিত্তেও একপ্রকার বিলিতি যন্ত্র আমদানি হইয়াছে। উহার নাম কমোড। পরিবেশ সচেতনতার হেতু আমরা জল ব্যবহার করি না। 'কলা-কাগজ' বা টিস্যু-পেপারের মাধ্যমে আবশ্যিক শুচিতা পালিত হয়। শিষ্টতা রক্ষার্থে এই বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা বর্জনীয়।

পোশাক বিষয়ে 'ড্রেস-কোড' নামক এক অলঙ্ঘনীয় সংবিধান বর্তমান। অতীব গ্রীষ্মেও আমরা কোট-টাই বহন করি, অতীব শৈত্যেও বাঁদরটুপি বর্জন করি। একমাত্র বিবাহ, শ্রাদ্ধকর্ম ও আদিখ্যেতা ভিন্ন সজ্ঞানে নির্লজ্জ দেশীয় পোশাক স্পর্শ করি না।

কোনো-কোনো দিবসে ক্রীড়াপ্রেমের তাড়ণায় আমরা পরিচর্যার বাহুল্যযুক্ত হরিৎ চারণভূমিতে আসিয়া একটি শুভ্রবর্ণ গোলককে লৌহযষ্ঠির দ্বারা প্রহার

করিতে করিতে মূষিক-গহ্বরে প্রেরণ করি। এই ক্রীড়ার নাম 'গল্‌ফ'।

পশুপ্রেমের কারণে আমাদিগের কর্মকাণ্ড তথা জীবনযাপন ও দর্শনে ভ্রম হইতে পারে যে, আমরা মনুষ্যরূপ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ গর্দ্দভশ্রেণীতে পরিণত হইতেছি। ইহা দৃষ্টিবিভ্রম। ঘটনাচক্রে, নিজ-নিজ পরদারকে গোপনে 'হানি' বা মধু সম্ভাষণের বাহুল্যে আমাদিগকে ভল্লুক বোধ হওয়াও অসম্ভব নহে।

বস্তুতঃ, আমরা পাণ্ডিত্যে শৃগাল, স্বজাতিভক্ষণে সর্প, ভেকধারণে অতিশয় নিম্নজাতের সরিসৃপ, আলস্যে জলহস্তী, কটুবাক্য শ্রবণে গণ্ডার, প্রভুর সম্মুখে সারমেয়, স্বগৃহে শজারু, ইত্যাদি চরিত্র ধারণ করিয়া থাকি। আমরা প্রতিযোগিতাজীবি। সহস্র ক্রীড়নক হস্তগত হইলেও সেইক্ষণ অবধি সন্তুষ্ট হই না– যতক্ষণ না নিশ্চিত হই যে অন্যের অপেক্ষা অধিক পাইয়াছি। তাই 'কেরিয়ার' নামক এক বিচিত্র কলে মূষিক-দৌড়েও আমাদিগের দুরন্ত আগ্রহ।

বৈদিক মানবাচারের চারিটি বর্ণ– বিদ্যা, দান তপস্যা এবং সত্য। বিদ্যা আমরা বিক্রয় করি। দান করি কেবলমাত্র মল-মূত্র। তপস্যার মন্ত্র সেন্সর-বোর্ডে নাকচ হয়। সত্য কদাপি উচ্চারণ করি না। বস্তুবাদের প্রবর্তক, গ্রীকদেশীয় পণ্ডিত ডেমোক্রিটাস কহিয়াছিলেন, 'বিবাদ হইল গতির উৎস'। ইহা কিঞ্চিৎ অর্থবিকৃত হইয়া আমাদিগের আপ্তবাক্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবনে গতিসঞ্চারের নিমিত্তে, অন্য কাহারও অনুপস্থিতিতে নিজ প্রতিবিম্বের সহিতই আমরা বিবাদমান হই। অন্যদিকে, গতির তাড়ণায় বারংবার উচট লাগিলেও, পদযুগল ক্ষতবিক্ষত হইলেও, যন্ত্রণায় প্রাণপণে উদর নিষ্পেষণ করিতে হইলেও এক অদৃশ্য গাজরের অমোঘ আকর্ষণে পূর্ববর্ণিত গর্দ্দভ-প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটাইয়া সর্বদা ছুটিতে থাকি। ছুটিতে ছুটিতে এক পর্য্যায়ে আমাদিগের কর্মে নিরাসক্তি জন্মায়। সেই সময় আমরা 'স্টার্ট-আপ' নামক অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হই।'

– ইহা কী বস্তু?

– অনুমান করো, কোনো এক দিবসে নিজ গৃহের শাকান্নে অরুচি জাগিল। প্রতিবেশীর গৃহ হইতে আগত তৈজসপত্রের ঝঙ্কার এবং সুখাদ্যের ঘ্রাণ অনুভব করিয়া ভাবিলে, সেথায় বাদশাহি পলান্ন পাক হইতেছে বুঝি। প্রলুব্ধ হইয়া ধাবিত হইলে। তাহার পর উপলব্ধি করিলে, সেই স্থলে পলান্নের চিহ্ন মাত্র নাই। একখানি উচ্ছৃঙ্খল মার্জার রন্ধনশালা লণ্ডভণ্ড করিতেছিল। হাঁড়িকুড়ির সহিত বসরাই গোলাপজল ও ভাগলপুরি ঘৃতের শিশি দুইটিও হতচ্ছাড়া উলটাইয়া ভাঙিয়াছে– ইহাই স্টার্ট-আপ।

পতঙ্গের বক্তৃতা তখনও সমাপ্ত হয় নাই,– 'এতক্ষণে নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়াছ, আমাদিগের জীবনযাত্রা হইল সর্বোচ্চ মার্গের দর্শন। সর্বক্ষেত্রে তাহার নিদর্শন রাখিতে প্রচেষ্টা করি।

বস্তুতঃ, আমাদিগের জীবনই যেন এক বহ্নিশিখা। ভোগবহ্নি অ্যান্টনি-ক্লিওপেট্রার অধিক। রূপবহ্নি শকুন্তলার অধিক। ঈর্ষাবহ্নি ওথেলোর অধিক। ইন্দ্রিয়বহ্নি বিদ্যাসুন্দরের অধিক। তিতিক্ষাবহ্নি সেকেন্দার শাহের অধিক।

লিপ্সাবহ্নি মাদাম বোভেরির অধিক। বুদ্ধিবহ্নি বেতাল পঞ্চবিংশতির অধিক। ... ইহাই সমাপ্তি নহে, আমাদিগের চেতনায় ডক্টর জ্যাকেল ও মিস্টার হাইড নামের দুই সত্তা চকমকির ন্যায় একে-অপরের সহিত ঘর্ষিত হইতে-হইতে সর্বদা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিচ্ছুরণ ঘটাইতে থাকে।

কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদিগকে প্রত্যহ সত্যবিকৃতি ঘটাইতে হয়। মিথ্যা নহে, ইহা 'ম্যানিপুলেশান অফ্ ট্রুথ'।

রমণ আমাদিগের অতিপূজ্য। সেই হেতু সামান্য পরিমাণ ক্রোধের উন্মেষ হইলেই আমরা স্ত্রী-পুরুষ-ক্লীব নির্বিশেষে 'তোমাকে রমণ করি', অর্থাৎ 'ফাকিউ' এবং 'ইহা কী প্রকার রমণ', অর্থাৎ 'হোয়াট দ্য-' বলিয়া হাঁক পাড়িয়া থাকি। লক্ষণীয়, অন্তিম পদবন্ধের সর্বশেষ শব্দটি সর্বদা উহ্য থাকে। দ্রোণাচার্যের প্রতি যুধিষ্ঠির উবাচঃ 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'-এর ন্যায়।

কিছুপূর্বে পোশাকের প্রসঙ্গে কহিয়াছিলাম, এইক্ষণে অবগত হও– অগ্নিমূল্য না হইলে পোষাক কেন, কোনো দ্রব্যই ক্রয় করি না। আমরা প্রাপ্তবয়স্কতাপ্রাপ্তি হইতে আমৃত্যু প্রায় প্রতি ষান্মাসিকে নব-দূরাভাষ, প্রতি বৎসরে নূতন বাহন অবং প্রতি পঞ্চমবর্ষে নূতন গৃহ ক্রয় ও পুরাতনগুলি বিক্রয় করিতে থাকি।

নিশ্চুপ থাকিতে অপারগ হইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'একবিংশ শতাব্দীর কারিগরী উপাদান কি এইরূপ ভঙ্গুর? নসিরামবাবুর বসতবাটি ও ছ্যাকড়াগাড়িখানি তো তাঁর পিতৃব্যের কাল হইতে চলিতেছে।

পতঙ্গ ইংরাজীতে কহিল 'তোমাকে রমণ করি'। তারপর সম্মুখবর্তী গবাক্ষে উন্নাসিক দৃষ্টি স্থাপন করিল। দূরাভাষ, বাহন এবং গৃহের নিয়মিত পরিবর্তন শাস্ত্রে স্ট্যাটাস-সিম্বল নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। তুমি নগণ্য প্রাণ, মহানতার ধর্ম তুমি আর কী অনুধাবন করিবে? সমগ্র মানবজাতি, অর্থাৎ 'হিউম্যান বিইংগস্'কে শুধুমাত্র 'হিউম্যান রিসোর্স'-এ রূপান্তরিত করিতে যে পরমহংসীয় বোধ অর্জন করিতে হয়, তাহা কি সহজলভ্য?

– আর কী কী রূপান্তর করিয়া থাকো?

– অসংখ্য। উদাহরণস্বরূপ, এই যে তুমি অঙ্গার অথবা লবণ দিয়া দন্তমার্জন করো;– আমরা প্রথমে উহাকে ক্ষতিকারক এবং বিলিতি বুরুশ ও দন্তমঞ্জনকে স্বাস্থ্যকারক রূপে ঘোষণা করিব। তুমি পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করিবে। তাহার কিছুকাল পর সেই দন্তমাঞ্জনেই লবণ ও অঙ্গার সংযুক্ত করিয়া তোমাকে প্রশ্ন করিব– আপনার মাঞ্জনে কি অঙ্গার আছে, লবণ আছে?

– ঈশ্বর তোমাদিগকে মার্জনা করুন!

পতঙ্গ নিবৃত্ত হয় না,– 'ইহার ব্যাতিরেকেও রূপান্তরের বহু উদাহরণ বর্তমান, যথা– ক্ষৌরকর্ম হইতে হেয়ার-গ্রুমিং, গাত্রমর্দন হইতে বডি-স্পা, কুলাচার্যবৃত্তি অর্থাৎ ঘটকালি হইতে ম্যাট্রিমনি-সার্ভিস-।' ইতিমধ্যে পতঙ্গ আমার কর্ণসমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। মৃদুস্বরে কহিল, '... এমনকি গণিকাবৃত্তিও এসকোর্ট-সার্ভিস রূপে কৌলীন্যলাভ করিয়াছে।

– হাঁপানিরোগকে অ্যাস্থামা ডাকিলেই যদি কৌলীন্যপ্রাপ্তি ঘটিত, আমার সেজোখুড়া বরলাট হইতেন।

পতঙ্গ হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছিল, 'তোমাকে-!'

– বেশ বেশ, করিও। তাহার পূর্বে ব্যখ্যা কর, তোমাদিগের সমাজের অর্থনীতির ব্যবস্থা কীরূপ?

– কুবেরসদৃশ বিত্তশালী হইবার চূড়ান্ত বুভুক্ষা অন্তরে পালন করিলেও সমাজজীবনে সর্বদা মধ্যবিত্ত, অর্থাৎ মিডলক্লাস সাজিবার চেষ্টা করিতে হয়। উচ্চবিত্তগণ রাজ বাঁচাইতে সাজে আপার-মিডলক্লাস। নিম্নবিত্তগণ লাজ বাঁচাইতে সাজে লোয়ার-মিডলক্লাস। প্রকৃতপক্ষে, এই মধ্যবিত্ততা মোক্ষলাভের পন্থাবিশেষ।

ভাবিতেছিলাম, যে মধ্যবিত্তকূল এযাবৎকাল আতা-ফলের বীজের ন্যায় নামমাত্র শাঁস সম্বল করিয়ে ভুতুরিমধ্যে ঘন হইয়া টিকিয়াছিল, আজ সেইখানে উচ্চবিত্তের ল্যাজা ও নিম্নবিত্তের মুড়া দলে-দলে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাসাগরের ভিড় বাঁধাইয়াছে! কহিলাম, 'মধ্য লইয়া এই পরিমাণ উত্তম-মধ্যম কেন, তোমাদিগের মূল পেশা কি দালালি– থুড়ি মধ্যস্থতা?'

– তোমাকে রমণ করি! আমাদিগের মূল পেশা ডিসিশান-মেকিং। যাহার সারমর্ম্ম হইল, এক-কোপে কদাপি মুণ্ডচ্ছেদ করিতে নেই। ক্রমাগত আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া, ক্ষতবিক্ষত করিয়া, একবাক্যে জগাখিচুড়ি রন্ধন করিয়া ভেন্টিলেশানে প্রেরণ করিতে হয়।

– সাংঘাতিক! ... এইবার তোমাদিগের পরিবার সম্বন্ধে কহ। ইহাও কি আমাদিগের অপেক্ষা ভিন্ন?

– তাহা মূলতঃ মুখপুস্তিকা নির্ভর।

– ইহা কী প্রকার পুঁথি? নাম শুনি নাই।

– তুমি সৌভাগ্যবান। হাসি-কান্না হীরা-পান্না সকলই সেথায় নিয়ম করে প্রচার করিতে হয়। মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন, বশীকরণ– ষড়যন্ত্রের যে চক্রেই পিষ্ট হই না কেন, সেই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিতে হয়। তবে মহাকালের নিয়মে মিলন ও বিচ্ছেদ আমাদিগের জীবনে ক্রমাগত আবর্তিত হয়। আমরা সদর্পে ঘোষণা করি– 'ইটস্ কমপ্লিকেটেড'। পিতা-মাতা বিষয়ে আমরা বৈদিক বানপ্রস্থ প্রথায় বিশ্বাসী। তাহা নিতান্তই অসম্ভব হইলে তাহাদের 'ওল্ডেজ-হোম' নামক আধুনিক কাশীধামে প্রেরণ করি। আমরা সপ্তাহভর কর্মযোগে লীন থাকি এবং মুখপুস্তিকায় যথাবিধি সাক্ষ্য রাখিয়া শুধুমাত্র সপ্তাহান্তে সন্তানাদি পালন করি। বৃহত্তর ও মহোত্তর উদ্দেশ্যের হেতু সন্তানপালনের ন্যায় ক্ষুদ্রস্বার্থ আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। উহাদিকে শৈশবে ধাত্রী, অর্থাৎ আয়া ও বাল্যকাল হইতে টিচারিণীগণ পালন করে।

চমকিয়া উঠি, 'কী কহিলে?'

– 'ইহা কী প্রকার-'! দ্বিচারিণী নহে, শব্দটি টিচারিণী। ইতর ভাষায় তাহাদিগকে শিক্ষিকা বলা হয়। ইহারা ইংরাজী-মিডিয়াম টোলে ম্যানারস্-শাস্ত্রে

শিক্ষাদান করেন। পদতল কন্টকবিদ্ধ হইলে 'উহ্' অথবা 'আহ্' নহে, 'আউচ্' বলিয়া আর্তনাদ করিতে হয়, কুক্কুরগণ ভৌ-ভৌ অথবা ঘেউ-ঘেউ নহে, উফ্-উফ্ রব করে, ক্রন্দনকালে চ্যাঁ-ভ্যাঁ অথবা প্যানরপ্যানর-এর পরিবর্তে 'স্নিফ্-স্নিফ্' করিতে হয়, ইত্যাদি। তবে শুধু ইংরাজী-মিডিয়ামই নহে, গোমূর্খদিগের জন্য বাংলা-মিডিয়াম টোলও আছে।

– শিক্ষাজগতেও উচ্চ অথবা 'হাই' ত্যাজিয়া এত মধ্যম, অর্থাৎ মিডিয়ামের উপদ্রব কেন? ভবিষ্যতে কি মিডিয়াম হইতে লো, এবং অন্তে লুপ্ত হইবে?

– তোমাকে-!

কটুবাক্য শ্রবণমাত্র দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিলাম, 'শাস্ত্রপাঠ করো?'

– করি। মূলতঃ অর্থশাস্ত্র, যাহার অপর নাম ইকোনমিক টাইমস্। শেয়ারবাজারের উত্থান-পতনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

বোধ হইল, ইহাদিগের হাব-ভাব ঠিক কাশীরামবাবুর ভৃত্য রামার ন্যায়! দু'পয়সা অধিক আত্মসাৎ করিবার টানে ধুরন্ধর ব্যাটা ভাণ্ডাহাটে বাজার করিতে যায়। পুনরায় বাক্-ধর্ষণের আশঙ্কায় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম না।

কিছুক্ষণ পশ্চাতে কহিলাম, 'কিন্তু, বন্ধুবর, তোমাদিগের কর্মের প্রকৃত স্বরূপ-টি এতক্ষণেও সুস্পষ্ট হইল না।'

পতঙ্গের বিজ্ঞহাস্য প্রতীয়মান হইল। 'আমরা ল্যাপটপ নামক এক ক্রোড়স্থিত অক্ষয়-তূণীরে শক্তিবিন্দু নামক এক ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করি। ইহার দ্বারা আমরা যাবতীয় উন্নতিকে সহস্রগুণ বিবর্ধিত করিয়া ও ক্ষয়ক্ষতিকে শতগুণ সংকুচিত করিয়া প্রচার করি। এই ব্রহ্মাস্ত্রের অপর নাম পাওয়ার-পয়েন্ট। ইহা চালনা করিবার কালে মুখনিসৃত বাণী ঢক্কানিনাদের সমতুল্য হয়। এই বাণী কাব্যগুণসম্পন্ন ও আলঙ্কারিক। চালক যদি কহে, 'বিগত বৎসরের তুলনায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছি', ইহার অর্থ– চারিআনার পরিবর্তে সিকি জুটিয়াছে। অপরদিকে, বাণিজ্যলক্ষ্মী প্রস্থান করিয়াছেন, অবিলম্বে কোম্পানির গণেশ উলটাইবে– এইরূপ ভাব প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয়– 'বিশ্ববাণিজ্যের সার্বিক অস্থিরতার নিরিখে আমরা উত্তম ফল লাভ করিয়াছি' রূপে। আবার 'আউট অফ্ বক্স চিন্তা করিতে হইবে'– এই বাক্য আসন্ন সর্বনাশের পূর্বাভাষ। প্রকৃত বার্তা– কোম্পানির উর্ধতনের বুদ্ধিশুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় দশা হইয়াছে।

– এই ভাষ্য সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়?

– সর্বসাধারণের বোধ বিষয়ে নির্বোধগণ ভাবনা করে। আমাদিগের পূজা-অর্চণার সকলই সর্বেসর্বা হইয়া উঠার নিমিত্তে।

– সেই পূজার বীজমন্ত্র কী?

– ম্যানেজমেন্টের মূল মন্ত্রই হইল– কী উপায়ে অন্যের দ্বারা কর্ম সমাপন করিতে হয়।'

– ইহা কী এমন প্রকাণ্ড বিষয়? কাশীরামবাবু হাঁক পাড়িলেই তাঁহার ভৃত্যগণ সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া দেয়।

পতঙ্গ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় হুঙ্কার ছাড়িল, 'তোমাকে-! নরাধম, কোথা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কর্মযজ্ঞ, কোথা কাশীরাম! তাহার না আছে বৃহৎ লাঙ্গুল, না আছে সমতুল্য আত্মবিশ্বাস। দেখিবে, ওই সেজবাতির শিখার মধ্য দিয়া উড়িয়া আসিব-?'– বাক্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সে শিখার অভিমুখে উড়িয়া গেল। পরমুহূর্তেই আমি ও তাহার আত্মবিশ্বাস, উভয়কেই হতবাক করিয়া ফরর্-ফট শব্দে গঙ্গাপ্রাপ্ত হইল! অজান্তেই উচ্চারণ করিলাম, 'হোয়াট দ্য-!'

দিব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতেছিলাম,– যে নির্বুদ্ধিতা সমালোচিত হয়, তাহার নাম মূর্খতা। আর যে বুদ্ধিহীনতার কোনো উল্লেখযোগ্য সমালোচক নাই, তাহা দেশাচার অথবা যুগাচার রূপে অভিষিক্ত হয়। গতি উহাদিগের দেশাচার আর দুর্গতি হইল যুগাচার।

ইহারা ছুটিতে ছুটিতে মরিতেছে, তবু মরিতে মরিতেও ছুটিতেছে! যেন দাবানল লাগিয়াছে। নিজেরা ছুটিতেছে আর শাবকগুলির পৃষ্ঠেও বোঁচকা বাধিয়া ছুটিতে বাধ্য করিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে ইহারা অবসরকেও 'ছুটি' নামে ডাকিতেছে। বস্তুতঃ ইহাদিগের ছুটিবার ও লুটিবার প্রবৃত্তি এইরূপ প্রবল যে, 'আমাদের ছুটি ছুটি চল্ নেব লুটি'– জাতীয় গীত গাহিতেছে।

তন্দ্রা আসিয়াছিল। কাশীরামবাবু জাগাইলেন। 'রাত্রি নিশিথ হইল অবলা। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে না?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলাম। 'ব্রহ্মাণ্ডের মূল দর্শনই অজ্ঞাত রহিল কাশীবাবু, গৃহের আর মূল্য কী? মনস্থির করিয়াছি শাস্ত্রপাঠ করিব।'

কাশীরামবাবু যৎপরোনাস্তি বিস্মিত,– 'কী শাস্ত্র?'

অতীব গাম্ভীর্যের সহিত কহিলাম, 'ম্যানেজমেন্ট।'

... কিন্তু, ধর্মে সহিবে কি?

*****

'দেশ', ২০১৬

বাপের ঠিক

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উশখুশ করছিল মান্তু। কখন যে বাজারটা দেবে কে জানে! বাড়ি নিয়ে কাটা-ধোয়া আছে, এক-পদের হলেও রান্না আছে, তারপর কলেজ। ঠাকুমা চোখে ভালো দেখতে পায় না। ওর বোন পান্তু ভাতটুকু বসাতে পারে, নামাতে ভয় পায় এখনও। তারও স্কুল আছে। বাজার পেতে দেরি হলে রুটি-তরকারি গিলেই সারাদিন কাটাতে হবে।

এক উনুনে চা, অন্যটায় আলু মটর সোয়াবিন সেদ্ধ হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে চায়ের হাতা আর তরকারির খুন্তি একপাক করে নেড়ে নাগাড়ে রুটি বেলে চলেছে তার মা। কপালে ঘাম, হাতদুটো কনুই অবধি সাদা। বাবা মাছবাজারের ভেতরে কোথাও একটা। দেখা যাচ্ছে না।

সপ্তাহের সাতদিনই ওই দুজনের বাঁধা রুটিন। বিশু সকাল পাঁচটার মধ্যে কলোনিবাজারের দোকানটার ঝাঁপ তুলে ঝাঁট দেওয়া সেরে ফেলে। তারপর দুধ কিনে, আঁচ ধরাতে পৌনে ছ'টা। ততক্ষণে ঘর সামলে শঙ্করীও পৌঁছে যায়। আটটা অবধি মূলত চা-বিস্কুটের খদ্দের। তারই মধ্যে ডিমের ট্রে ঢোকে, বেকারির টাটকা পাউরুটি, কেক। গুছিয়ে তুলতে না তুলতেই এ'দোকান-সে'দোকান থেকে চা, রুটি-তরকারি, ঘুঘনি-মুড়ি, বাটারটোস্ট, ডিমটোস্টের অর্ডার আসার শুরু। খদ্দেরদের যার-যার দোকান ছেড়ে আসার যো নেই। শঙ্করী দোকান সামলায়, আর হাঁক পড়লেই চায়ের কেটলি বা কাগজের প্লেটে খাবার হাতে বিশু বাস অটো ট্যাক্সি বাইক সাইকেল টোটো রিক্সাদের পাশ কাটিয়ে রাস্তার এপার-ওপার ছুটতে থাকে।

সংসার টানতেই তাদের আমদানির চোদ্দআনা যায় ফুরিয়ে। বাপ একখানা ভাঙাচোরা ঝুপড়ি ছাড়া প্রায় কিছুই রেখে যেতে পারেনি। তিলে তিলে ইঁটের দেওয়াল উঠেছে ঘরে, মেঝে পাকা হয়েছে। করোগেটেড টিন, অ্যাসবেস্টার থেকে ঢালাই হয়েছে ছাদ। রান্নাঘর পাকা হয়েছে, একচিলতে বারান্দাও। কিন্তু, আজও ঘর বলতে সেই একখানাই। তার মধ্যেই মা, বউ, দুই মেয়ে নিয়ে গাদাগাদি করে থাকা। সে একদিন গিয়েছে বটে! মা মুখ ঘুরিয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকত, ঘুমন্ত মেয়েদুটোকে ডিঙিয়ে চোরের মতো দাম্পত্যযাপন। তখন তবু মেয়েদুটো ছোটো ছিল। পান্তু তেরোয় পড়েছে গত বৈশাখে, মান্তু এখন উনিশ। সোমত্ত বয়স, আর একটা ঘর না তুললেই নয়। একজন স্কুলে যায়, বড়োজন কলেজে ঢুকেছে গতবছর। লেখাপড়ার জায়গাটুকুও ঠিকমতো নেই। আজ বাদে কাল তাদের

বিয়ে-থা'র প্রশ্ন আছে। জামাই এসে উঠবে কোথায়?– শাশুড়ি-দিদিশাশুড়ির সঙ্গে এক ঘরে! বছর চার-পাঁচ ধরে শঙ্করী হামেশাই প্রসঙ্গটা তোলে। অনায্য কিছু নয়। কিন্তু, জামাইয়ের অস্তিত্বের জন্য মেয়ের বিয়েও দিতে হয়,– তার খরচ নেই?

অনেক কিছু করার আছে। পটারিবাজারের জীবন মণ্ডল গুল-কয়লা ছেড়ে ইনডাকশানের উনুন বসিয়েছে দোকানে। আঁচের ঝামেলা নেই, ধুঁয়ো-কালির বালাই নেই। ওই জিনিস কিনতে হবে একটা। দোকানের ছাদটাও পাকা করা দরকার। কিছু কাপ-প্লেট, কয়েকটা চেয়ার টেবিল। একটা ছোটো ফ্রিজ,– চায়ের বদলে কোল্ডড্রিংকসে ঝোঁক বেশি উঠতি ছেলেছোকরাদের। হাতে কিছু টাকা এলেই-।

সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে পা চালাচ্ছিল বিশু। আজ একটু দেরীই হয়ে গিয়েছে। দোকানে পৌছে সাইকেলটা কোনোমতে ঠেস দিয়েই লেগে পড়ে কাজে। গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথে চেইন পড়ে যাচ্ছিল বারবার। সাইকেলের দোকানে মিনিট পনেরো নষ্ট হল। শঙ্করী খাবার নিয়ে এ'দোকান-সে'দোকান ছোটাছুটি করছিল এতক্ষণ। উনুনের সামনে মান্তু। কলেজ যাওয়ার সময় হয়েছে তার। বাবাকে ফিরতে দেখে 'মা আসছি'– বলেই পড়িমরি ছুট লাগায় বাসরাস্তার দিকে।

মুহূর্তের জন্য একটা দুশ্চিন্তা উঁকি দেয় মাথায়,– কলেজে যাওয়ারই তাড়া তো? মাসকতক ধরে সাজগোজের বহর একটু যেন বেড়েছে। চোখদুটোও বড্ড চঞ্চল। দোকানে বসতেও তোলা সালোয়ার কামিজ গায়ে চড়ায়। গুল-কয়লা ছুঁতে চায় না। বয়সটা সাংঘাতিক, তার ওপর মেয়েটা রূপও পেয়েছে তেমন। গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের তুলনায় কিছুটা বেশিই লম্বা, কাটা-কাটা চোখ মুখ, তেমন টকটকে ফরসা। নিজের মা বাপ ঠাকুমার সঙ্গেও চেহারায় মান্তুর কোনো মিল নেই। ওদের মতো পরিবারে এমনধারা রূপের অস্তিত্বে কিছু কিছু লোকজন আড়ালে হাসাহাসি করে। বিশুর কানেও এসেছে দু-একবার,– 'কাকের বাসার কোকিলছানা!' আগে খুব গায়ে লাগত, এখন সয়ে গিয়েছে।... হয়তো মেয়ের বাপেদের অনেককিছুই সইয়ে নিতে হয়।

সেদিন একটু জ্বর-জ্বর লাগছিল। সন্ধের মধ্যেই কাজকর্ম গুটিয়ে বাড়ির একমাত্র চেয়ারখানায় গলদঘর্ম শরীরটাকে সবে এলিয়ে দিয়েছে, কানে এল– মান্তু তখনও ফেরেনি। এমন তো হয় না কখনও! ছুটি হলেই যে মেয়ে সোজা বাড়ি ফেরে, সে-! শঙ্করীর নির্লিপ্ত ভাবসাব দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে বিশু।– 'এত নিশ্চিন্তি তোমার আসে কোত্থেকে?'

শঙ্করী উত্তর দেয় না। যে কোনো দিকে এক পা বাড়ালেই যেখানে কারো না কারোর গায়ে ধাক্কা লাগে– তেমন ঘর ওই বয়সের একটি মেয়ের কাছে খাঁচার সমান। মেয়ের প্রতি সে গা-ছাড়া নয়, কিন্তু এ-ও বোঝে যে, খুব বেশি বাঁধতে গেলে খাঁচার উপস্থিতিটা প্রকট হয়ে ওঠে। তখন সামান্য ফাঁক পেলেই-! নজর কড়া রাখলেও কলেজ ফেরতা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে একটু-আধটু মেলামেশা নিয়ে

সে খিটখিট করে না।

কিন্তু, আজ সত্যিই যেন একটু বেশিই দেরি হচ্ছে। মিনিটের কাঁটার তালে তালে চিন্তাগুলো দুশ্চিন্তায় পরিণত হতে শুরু করে। বাড়িতে সাকুল্যে একটাই ফোন। মান্তুর জনাকয়েক বন্ধু-বান্ধবের নাম্বার যা তাতে সেভ্ করা ছিল, এর মধ্যে সবাইকেই ফোন করা হয়ে গিয়েছে। কেউই তেমন কিছু জানে না। দুজন তো বলল, আজ নাকি কলেজে মান্তুকে দেখেওনি।

সাড়ে আটটা বাজতেই উদ্ভ্রান্তর মতো এদিক-ওদিক শুরু হয়ে যায়। নতুনবাজারের সাধনদার ছেলে মান্তুর সঙ্গেই পড়ে। বিশু সাইকেল নিয়ে সেদিকে ছোটে। সেখান থেকে ফিরতেই যাবতীয় উৎকণ্ঠা মনের মধ্যেই চেপে রেখে শঙ্করী এগিয়ে আসে ওর দিকে, 'কিছু খবর পাইছো?'

মান্তু কলেজে গিয়েছিল ঠিকই, বেরিয়েওছে যথাসময়ে। সাধনদার ছেলে আর বেশি কিছু বলতে চাইছিল না শুরুতে। বিশুর অনুনয়-বিনয়, নিজের বাপের ধমক-ধামকের শেষে জানিয়েছে, সিনেমা দেখতে গিয়েছে মান্তু। কোন এক পুলক না কে যেন, তার সঙ্গে।

বিশুর রাগারাগিতে রাত ন'টার ঝিমিয়ে পড়া কলোনিবাজার হঠাৎ চাঞ্চল্য পায় যেন। ওর দোকানের ঠিক উল্টোদিকেই অশোক দাসের খবরের কাগজ আর পত্রিকার কাউন্টার। রাতের দিকে এই ব্যবসার চাপ বিশেষ থাকে না। কালে-ভদ্রে দু-একটা পত্রিকা-টত্রিকা হয়তো কাটে। কাউন্টার খুলে রাখা মূলতঃ আড্ডার টানে। রোজের মতো আজও সেখানে বিভিন্ন বয়সের জনা পাঁচ-ছয়েকের ভিড়। কেউ অফিসফেরৎ, কেউ পার্টিঅফিসফেরৎ, কেউ ইনস্যুরেন্স্ এজেন্ট, কেউ চাকরিপ্রত্যাশী প্রাইভেট টিউটর। সকালের আধবাসি কাগজের পাতা উলটোতে-উলটোতে টুকটাক কথাবার্তা, খুচখাচ তর্ক। মাঝেমাঝে চা আসে বিশুদের দোকান থেকে। পান্তু অ্যালুমিনিয়ামের থালায় একটা স্টিলের বড়ো গ্লাসে চা আর গোনাগুনতি মাটির ভাঁড় রেখে যায় কাউন্টারের ডেস্কের ওপর।

বিশু যে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চিন্তিত মুখে রাস্তায় পায়চারি করছিল,– সেটা নতুন কিছু নয়। তাদের কত্তা-গিন্নির দোকানে হামেশাই ঠোকাঠুকি লাগে। শঙ্করী ঠিক জাঁদরেল না হলেও রাস্তার ধারের দোকান চালাতে চালাতে তার আগের পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে বহুদিন আগেই। বিশু ধমক-ধামক খেয়ে সপ্তাহে অন্ততঃ বার দুয়েক 'এর সঙ্গে ঘর করা যায় না' বা 'এর সঙ্গে ব্যবসা করা যায় না'– বিড়বিড় করতে করতে এদিক-ওদিক করেই। কিন্তু, আজ মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে অমন ছটপটানি দেখে লোকজন কিছুটা ভড়কে গিয়েছিল।

তারা বিশুকেই দেখছিল। এর মধ্যে পান্তু অশোকের পাঞ্জাবী ধরে টান দেয়, 'কাকা, জামাইবাবুর মোবাইল নম্বরটা লিখে দ্যান তো। মা চাইছে।'

চিরকুট নিয়ে পান্তু রাস্তা পেরিয়ে গেলে জটলার একজন সকৌতুহলে প্রশ্ন করে, 'ব্যাপার কী অশোকদা, বিশুদার বড়োমেয়ের বিয়ে হল কবে? কার সঙ্গে?'

– বুঝলে না কেসটা? পুলক।

– সকালে যে বাড়ি-বাড়ি তোমার হয়ে কাগজ দেয়? তোমার সেই দূরসম্পর্কের ভাগ্নে?

– হ্যাঁ।

– বলো কী! ছোঁড়ার বয়স তো বড়োজোড় কুড়ি-একুশ বছর বয়স। ইভনিংয়ে বি.কম. পড়ছে বলেছিলে না? এরমধ্যেই বিয়ে-?

– বিয়ে না হাতির মাথা! মান্তুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করছে বোধহয়। বিশুদার ছোটোটা তাই বেমালুম 'জামাইবাবু' ডেকে বসল! চায়ের দাম-টাম দেওয়ার সময় ব্যাটা মান্তুকে যেভাবে মৌমিতা-মৌমিতা করতো, আমারও সন্দেহ হয়েছিল বারকতক। প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি কাকে ডাকছে। বিশুদা দোকানটা নিল যখন, মান্তু তখন কোলে। সেই থেকে দেখছি, অথচ আমিও ভালোনামটা জানতাম না।

ইনস্যুরেন্স্ এজেন্ট বলে, 'আমি জানতাম। বৌদি পলিসি করিয়েছিল মেয়ের নামে।'

– থাম তো, দুনিয়ার সবাই তোর কাছে পলিসি করিয়েছে! এদিকে তিন বছরে সাইকেলের মাডগার্ডটাও লাগাতে পারিসনি!

– তবে যা-ই বলুন, বিশুদার বউয়ের নাম শঙ্করী, এটা যেন ঠিক মানায় না। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, আর হাজার হলেও শিবের সঙ্গে তার শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক!

'ডেঁপো ছোকরা, লোকের বউয়ের নাম তোমার এত মাথাব্যথা কেন?'– মৃদু ধমক লাগায় পার্টিঅফিসফেরৎ, একদা আগুনখোর জননেতা দেবাশীষ হালদার।

কিছুটা খোঁচানোর জন্যই অশোক বলে, 'ওটা শাস্ত্রসম্মত দেবাশীষদা। অষ্টমীর অঞ্জলির সময় মন্ত্র বলে শোনেননি, – যিনি কিনা শিবে সর্বার্থ সাধিকে, তাকেই আবার নারায়নী নমস্তুতেঃ!'

আগে সাহস হত না, রাজ্যে সরকার পালটানোর পর থেকে অনেকেই তার সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করতে শুরু করেছে ইদানিং। বেশ রেগে যায় প্রৌঢ় লোকটি, 'তোমার এখানে আর বসা যাবে না দেখছি অশোক। তুমিও শেষে কলোনি কালচারে মাতলে?'

দেবাশীষ হালদার হনহন করে রওনা দিলে প্রাইভেট টিউটর চোখ ওলটায়, 'যাহ্, ঝামেলায় পড়ছে একজন, আর গোঁসা হল আর একজনের!'

বিশুর ভাবগতিক দেখে শঙ্করী বেশ বিরক্ত। মানুষটার কি কাণ্ডজ্ঞান হবে না কোনোদিন? চিন্তা হওয়া এক কথা, কিন্তু তার জন্য এমন রাস্তায় লম্ফঝম্ফ করে পাড়া-বেপাড়ায় জানাতে হবে? লোকজনের যা খুঁৎ ধরার স্বভাব, এরপর মেয়ের বা গুষ্টির মানসম্মান বলে কিছু থাকবে? অশোকদা আর ছেলেটাকে আলাদা করে ডেকে কথা বললেও হত, কিন্তু ওই, সমস্যায় পড়লেই মানুষটার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দেয় যেন। পান্তু নম্বরটা এনে দিতে সে বলল, 'তোর বাবাকে ডেকে

দিয়ে তুই বাড়ি চলে যা। ঠাকুমা একা আছে।’

কিন্তু, পুলককে ফোন করে জানা গেল, মান্তু তার সঙ্গে কোথাও যায়নি। ঘটনাচক্রে, বিশুর হৈ-হট্টগোল শুরুর অন্তত ঘণ্টাখানেক আগেই সে কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। তবে কিছু একটা যেন বলতে চাইছিল পুলক। শঙ্করী টের পায়, ছেলেটা সঙ্কোচ করছে। মুখোমুখি কথা বলা ভালো। বিশু আর অশোক দাসকে সঙ্গে নিয়ে পুলকের মেসের গলিতে পৌছায়। অশোক দাসই প্রশ্নটা করে, ‘তুই কি কিছু জানিস?’

-ঠিক শিওর না মামা। তবে আমার একটা বন্ধু আছে। ওর নামও পুলক। কাউন্টারে এসেছে কয়েকবার। তুমি দেখেওছ।

– হুঁ, তো?

– মৌমিতাকে দেখে ওর-। মাস-দুয়েক আগে পুলক আমাকে একটা চিঠি পৌছে দিতে বলেছিল। মৌমিতার তো ফোন নেই, তাই।

‘এই করতে তুই কলকাতা এসেছিস!’– কিছুটা ধমকের গলায় বলে ওঠে অশোক দাস।

‘বকাবকি করবেন না দাদা।’– শঙ্করী তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। ‘পুলক, তোমার বন্ধুর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখো না। মেয়েটা যদি তার সঙ্গে-।’

– আপনার ফোন আসার পরেই আমি ওকে ফোন করেছিলাম। সুইচড্ অফ বলছে।

এবার ভয় করতে শুরু করেছে।– পালিয়ে গেল? কিন্তু, বাপ-মা যেখানে জানেই না, ফলে আপত্তিরও প্রসঙ্গ ওঠেনি, সেখানে পালাবে কেন? তাও আবার মাত্র দু-মাসের মধ্যে!

‘তোর বন্ধু থাকে কোথায়?’– অশোক দাসের গলাও চিন্তিত শোনাচ্ছিল।

– মা।..

পান্তু দেখে শঙ্করী খানিকটা অবাক, ‘তোকে যে বললাম বাড়ি যেতে! ঠাকুমা একা-।’

– দিদি ফিরেছে। কথা বলছে না।

পড়িমরি করে ছুটে এসেই ঠাস্-ঠাস্ দুখানা চড় কষিয়েছিল শঙ্করী। মান্তু রা অবধি কারেনি। নিশব্দে গড়িয়েছে তার চোখের জল। বিশুর চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে, মেয়েকে আপাদমস্তক দেখে যাচ্ছিল বারবার, জামাকাপড় আস্ত আছে তো? কাঁধের সেলাইটা যেন-!... কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পান্তু কপাল কুঁচকে কী যে ভাবছিল সে-ই জানে। বুড়ি ঠাকুমা একমাত্র ভাবলেশহীন।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। হাজারটা প্রশ্নের সামনে ছেঁড়া-ছেঁড়া কয়েকটা উত্তর ছাড়া মান্তু মুখ খোলেনি তেমন একটা। তবে কিছু একটা যে হয়েছে– ওরা প্রত্যেকেই টের পাচ্ছিল। নমঃ-নমঃ করে খাওয়ার পর্ব চুকেছে বেশ

কিছুক্ষণ আগে। বিশু বাইরের একচিলতে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়েছে। শঙ্করী পান্তুর ঘুমোনো অবধি অপেক্ষা করতে চাইছিল। আবার ভাবছিল– শুনলে শুনুক, সেও বিপদসীমার তেমন কিছু দূরে নয়।

কুঁকড়ে একপাশে শুয়ে আছে মান্তু। শঙ্করী সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখতেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। শঙ্করী মেয়ের মাথা কোলে তুলে নেয়।– তখনও সে কেঁপে চলেছে।

– অশোকদার ভাগ্নের বন্ধুই তো?

থেমে থেমে উত্তর দেয় মান্তু,– 'আর একটা ছেলে ছিল। চিনতাম না। বলল, বন্ধু... সিনেমা দেখার পর বলেছিল গাড়িতে করে ছেড়ে দিয়ে যাবে... এখানে খামচে ধরেছিল মা! এখানেও-।'... নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের প্রতি আঙুল তুলে চলেছিল মান্তু, 'সামনে ড্রাইভার ছিল। পুলকদা শক্ত করে হাত দুটো ধরে রেখেছিল।'

মান্তুর ফরসা কব্জির ওপর কালসিটে দাগগুলো অনেক আগেই লক্ষ্য করেছে শঙ্করী।

রীতিমত ফোঁপাচ্ছিল মান্তু, 'অনেক বাধা দিয়েছি। শুনছিল না। মুখখারাপ করছিল। বলছিল– টাকা নিবি তো বল... যার বাপেরই ঠিক নাই, তার আবার এত ন্যাকামি কিসের!

গা জ্বলে যায় শঙ্করীর,– এইটুকু মেয়ের এমন সর্বনাশ করলি, তার ওপর এতবড়ো কথা– বাপের ঠিক নাই!

বুড়ি ঠাকুমা চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। শুনতে শুনতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ফিরে যাচ্ছিল বারবার। স্মৃতি ধূষর হলেও কালো দাগগুলো স্পষ্ট নজরে পড়ে।...

বুরুঙ্গামারিতে ঘর ছিল তাদের।– জোতদার নুরুদ্দিন মিঞার বড়োবিবির ঝি, ইন্দুবালা। নিজের বাপকে সে দেখেনি কোনোদিন। শুনেছে ধার শুধতে না পেরে তার মাকে মিঞাসাহেবের কাছে জমা রেখেছিল সেই লোক। তার জন্মের আগেই।

ওই নুরুদ্দিন আগে হিন্দু ছিল। বুরুঙ্গামারি পাকিস্তানে পড়ায় জোতদারি বাঁচাতে মুসলমান হয়। তার পর থেকেই মসজিদের ইমামের সঙ্গে তার খুব ভাব। দেখতে দেখতে সাল-একাত্তর এল। বুরুঙ্গামারি বাজারের উত্তরে হাইস্কুলে খানসেনাদের ক্যাম্প বসল। নুরুদ্দিন মিঞা আর ইমামসাহেবের সঙ্গে তাদের খুব দহরম-মহরম। এলাকার কে-কে মুক্তিযোদ্ধা, কারা তাদের মদতদাতা, কোন পথে তাদের যাতায়াত– সব খবর ক্যাম্প অবধি পৌছে দিত এই দুজন।

খানসেনার অফিসারদের মন জোগাতে নুরুদ্দিন তার ছোটো বিবিকে মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হাই স্কুলের ক্যাম্পে। তখন কতই বা বয়স বেচারির, এই মান্তুর মতোই। চাকু দিয়ে বুক-পাছা ফালা-ফালা করে ফেরৎ দিয়েছিল ওরা।

নুরুদ্দিনের বিকার ছিল না তেমন, কাকে যেন একটা বলেওছিল– বিবি গেলে বিবি আসবে, জমি গেলে আসবে না।

তারপর দশ থেকে চল্লিশ এলাকার সব মেয়েগুলোকে দলে দলে ক্যাম্পে ঢোকানো শুরু হয়। সেও ছাড় পায়নি। কতজন-কতবারের হিসেব ছিল না কোনো। টানা তিনমাস! গায়ে সুতো অবধি ছিল না। সকাল-দুপুর-বিকেল যখন-তখন উলঙ্গ হয়ে সার বেঁধে দাঁড়াতে হত। যে-যার পছন্দ মতো নিয়ে যেত সেনারা। যাতে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে তারা প্রাণ দিতে না পারে, তাই ওই অবস্থাতেই গাদাগাদি করে শুইয়ে রাখা হত ইস্কুলের হলঘরে। মেয়েগুলোর কেউ-কেউ হাহাকার করে কাঁদত, পড়ে-পড়ে গোঙাত কয়েকজন। কেউ ততদিনে বদ্ধ উন্মাদ।

সে'বছর আশ্বিনে দুর্গাপুজো হয়নি। তবে মুক্তিবাহিনী দখল নিয়েছিল বুরুঙ্গামারির। ক্যাম্প ভাঙল। নুরুদ্দিনকে তাড়া করে মেরেছিল মুক্তিযোদ্ধারা। ধরা পরার আগে লোকটা নাকি শাড়ি পরে পালাচ্ছিল! এদিকে ছাড়া পেয়েও মোটামুটি আর সব মেয়েদের মতো তারও যাওয়ার জায়গা ছিল না কোনো। নতুন করে সেনাও ঢুকতে লাগল চারদিক থেকে। বুরুঙ্গামারি তখন দস্তুরমতো যুদ্ধক্ষেত্র!

নওগাঁ-বাঘমারা-পারিল্লা-রাজশাহীর পথ ধরে এদেশের এদেশের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই একজোড়া শাখা আর খানিকটা সিঁদুর জুটিয়েছিল ইন্দুবালা। না, বিয়ে তার কোনো কালেই হয়নি। তবে ওদুটো জিনিস ত্রিশূল না হলেও, অভেদ্য না হলেও ঢাল তো বটে। আসলে, ততদিনে বিশু এসে গিয়েছিল পেটে। যে মানুষটাকে বিশু বাপ বলে চিনেছে জেনেছে, যার মুখাগ্নি করেছে, সেই নারায়ণ মণ্ডল এদেশে আসার সময় তারা একই নৌকায় পদ্মা পেরিয়েছিল। তার দিন সাতেক আগে অভাগা লোকটার হতভাগিনী বউয়ের ছেঁড়া-খোঁড়া-কামড়ানো লাশ ভেসে উঠেছিল কুষ্টিয়া থানার ডাকবাংলোর পাশের কচুরিপানায় ঢাকা পুকুরে। সাত বছরের মেয়েটাকেও ছাড়েনি! নৌকার মধ্যে বেচারির সালোয়ার ভেসে যাচ্ছিল রক্তে। জ্ঞান হারাচ্ছিল বারবার। এতদিন পরে আজ ইন্দুবালার হঠাৎ মনে হল, নারায়ণ মণ্ডলের মেয়ের তো বাপের ঠিক ছিল, তবুও বেচারি রক্ষা পেল কই?...

পদ্মা পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ, সেখান থেকে নদীয়ার শরনার্থী শিবির। ওষুধ নেই, ভরপেট খাবার নেই, শিবিরের মধ্যে কয়েক পা হাঁটলেই বোঝা যেত– কার আয়ু ঘণ্টা কতক, আর কার কপালে তখনও হপ্তাখানেকের দুর্ভোগ বাকি। হাড়ের খাঁজে খাঁজে ঢুকে যাওয়া চামড়া, বেশিরভাগেরই মাথা তোলার শক্তি নেই। বেশিরভাগই বুড়ো, বাচ্চা আর মেয়ে। মেয়েদের অনেকেই ওর মতো সেনাশিবির ফেরৎ। যাদের ঘর ছিল, তারাও কেউ ফিরতে পারেনি। কিছু নিস্তেজ, কিছু উন্মাদ, কিছু গর্ভবতী।

নারায়ণ মণ্ডলের মেয়ের বাঁচার কথাও নয়, বাঁচেওনি। তারা দু'জন টিকে গিয়েছিল কোনোমতে। শরণার্থী শিবিরে আসার কয়েক মাস পর ও'দেশ স্বাধীন হলেও, সেখানে ফিরে যাওয়ার সাহস হয়নি।

দুটুকরোর বদলে একটুকরো ছাদে, দুটোর বদলে একটা উনুনে খরচ কম হয়। টিকে থাকার স্বার্থেই স্বজনছাড়া, ঘরছাড়া, দেশছাড়া দুটো মানুষ হয়ে উঠেছিল একে-অপরের অবলম্বন। কিন্তু মনে তো বটেই, শরীরেও আর কোনোদিন দাম্পত্য পালনের ক্ষমতা ছিল না ইন্দুবালার। বেয়নটের খোঁচায়...।

ওই হারামজাদাগুলোর মধ্যে কে যে বিশুর জন্মদাতা– তা ইন্দুবালা কেন, ভগবানও বোধহয় জানে না।

ছেলেটা বাপের রক্ত পায়নি, নাতনি পেয়েছে। আশক্ত শরীরে উঠে আসে বুড়ি। নাতনির মাথায় হাত রাখে। যেন মনেমনেই বিড়বিড় করে,– 'কারো বাপেরই ঠিক থাকে না রে দিদি, কারো ঠিক থাকে না।... আর থাকলেই বা কী!'

*****

'বইচই' শারদীয়া, ২০২১

কিছু মায়া রয়ে গেল

প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। সূর্য এখনও ডোবেনি। অ্যাপার্টমেন্টের পুরোটাই নো-স্মোকিং। ফলে সন্ধের কফি-সিগারেটের পর্বটি টেরেসেই সারতে হয়। শতদ্রু এর আগে গ্রীনপার্ক নামের এক শহরতলিতে থাকত। জায়গাটা মেরিল্যান্ডে। অনেকটা শস্তা পড়ত, কিন্তু রোজ-রোজ প্রথমে বাস আর তারপর দু'বার করে মেট্রো বদলে ওয়াশিংটন ডিসি-তে অফিস করা পোষাচ্ছিল না। আসলে দূরপাল্লার যাতায়াত বাদে যে-যার ব্যক্তিগত গাড়িতেই বেশি অভ্যস্ত। ফলে, এখানকার গণ-পরিবহনের সংখ্যা একেই কম, তার ওপর প্রচণ্ড খরচ-সাপেক্ষ। সপ্তাহে বার-তিনেক ট্যাক্সিতে উঠলেই সাশ্রয়ের গুড় পিঁপড়েয় খায়। অগত্যা, মাস-খানেক হল এইচ্-স্ট্রিট নর্থ-ওয়েস্টের এই অ্যাপার্টমেন্টে ঠিকানা বদল।

রাজধানীর প্রায় বুকেই বলা যায়। প্রায় ঢিলছোঁড়া দূরত্বে হোয়াইট-হাউজ, ক্যাপিটল বিল্ডিং, লিংকন মেমোরিয়াল। তবে ওর সবচাইতে প্রিয় ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, আকাশচুম্বী মিনারের চারিদিকে খোলা মাঠ, কাছেই রাজপুরুষের বাসভবন, রাস্তায় যুদ্ধবিরোধী প্ল্যাকার্ড। একটু এগোলেই নদী। শুধু হুগলীর বদলে পোটোম্যাক। আশেপাশে কয়েকটা বাদামওয়ালা থাকলেই দিব্যি গড়ের মাঠ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়!

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে টনি'স বিয়ার পাব। ডলার দশেকের বিনিময়ে এক গ্লাস পানীয়, সঙ্গে রং তুলি ক্যানভাস। হিমশীতল বিয়ার হাতে ছবি আঁকা,– মন্দ লাগে না। মনটা খুব বেশি কলকাতা-কলকাতা করলে ডাউনটাউনের বাংলাদেশী দোকানগুলো আছে। ফুলবড়ি বা তিলের খাজাও দুস্প্রাপ্য নয়। আজকাল বাংলা বই-পত্রিকাও রাখছে কেউ কেউ।

তবে কয়েকদিন ধরে মেজাজটা বেশ খিঁচড়ে আছে। গত সপ্তাহে অফিসের কাজে ও ব্রাশেলসে গিয়েছিল। ফেরার দিন ইমিগ্রেশান কাউন্টার পেরিয়ে কনভেয়ার বেল্টের সামনে প্রায় ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষার পর জানতে পারে– ওর স্যুটকেসটি নাকি প্লেনে ওঠেইনি! টুথপেস্ট, সাবান, চিরুণী, আরও একগাদা টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা একখানা প্লাস্টিকের থলে হাতে ধরিয়ে এয়ারলাইনসের সুন্দরী কর্মচারী মিষ্টি হেসে বলল,– অসুবিধার জন্য তারা অত্যন্ত দুঃখিত, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্যুটকেসটি নিশ্চিত ওর কাছে পৌঁছে যাবে।

পৌঁছায়নি। তিনদিন পর আজ এয়ারপোর্ট থেকে ক্ষমাপ্রার্থনার চিঠি

এসেছে, সঙ্গে আটশো ডলারের একটি প্রি-পেইড কার্ড। এই এদের এক দোষ, যেন ডলার ছুঁড়লেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়!

তিন্নির দেওয়া উপহার 'কিছু মায়া রয়ে গেল' বইটি, তার নিজের হাতে লেখা 'শুভ জন্মদিন', বাবার সেই পুরোনো মাফলার– প্রথমবার হোস্টেলে যাওয়ার দিন থেকে ওর সঙ্গী– সব ছিল ওই স্যুটকেসে। ফুরোতে ফুরোতে সঞ্চয় বলতে তো শুধু ওইটুকুই। কী মনে করে যে নিতে গিয়েছিল! হারিয়ে গেল কত স্মৃতির মূর্তিময়তা।

চলে যাওয়ার মাত্র একবছর আগে বাবা বাড়ি কেনেন। কলকাতার একটু বাইরেই। ওপর-নীচ মিলিয়ে পাঁচখানা ঘর, সামনে একচিলতে বাগান। কোমরের ব্যাথায় মা তখন শয্যাশায়ী। মাসের মধ্যে কুড়িদিন বেডপ্যান লাগে। ওই সময়টা তিনি শতদ্রুকে একা পেলেই ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করতেন, 'বিতুর কোনো সম্বন্ধ পেলি?'

বিতু,– বিতস্তা। ওর দিদি। প্রায় বছর দশেকের বড়ো। তখনই সে মধ্য তিরিশ-– 'সম্বন্ধ'র পক্ষে একটু বেশিই। আর তাছাড়া, যদিও ভাই হয়ে সে' তথ্য জানা হয়তো কিছুটা অসমীচীন,– দিদির পক্ষে মা হওয়া সম্ভব নয়। অকালেই থেমে গিয়েছে তার ঋতুচক্র। কিছুদিন আগে স্টেপলারের খোঁজে দিদির ড্রয়ার ঘাঁটতে গিয়ে একটা প্রেসক্রিপশান দেখতে পেয়েছিল শতদ্রু। বিতস্তা চিরকালই চাপা স্বভাবের মেয়ে। ভয় হয়েছিল, জটিল কিছু গোপন করছে না তো?

এই কারণেই নাকি অন্য কোনো ব্যাপার? কেন যে দিদি বিয়ে-থা করল না,– বিষয়টায় খুব বেশি ঢুকতে ওর অস্বস্তি হত। মা সুস্থ থাকাকালিন অশান্তিও কম হয়নি। প্রায় রোজ সেই এক বিষয়ে তর্কাতর্কি শুনতে-শুনতে একদিন ও-ও বলে ফেলেছিল, 'কেন পাগলামি করছিস?'

-একমাত্র বদ্ধ পাগলা ছাড়া সবারই পাগলামি করার ইচ্ছে হয় ভাই। কারো কম, কারো বেশি। এই দেখ না, তুই অ্যাকাডেমিক্‌সে যথেষ্ট ভালো হওয়া সত্বেও চাকরি-বাকরি না করে থিয়েটার নিয়ে পড়ে আছিস। যে কেউ শুনলে বলবে– পাগলামি। কিন্তু আমি জানি, নিশ্চয় তোর নিজস্ব কোনো কারণ আছে। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, সেই কারণটা তোর কাছে খুব মূল্যবান।...

থিয়েটার এখন স্মৃতির কোঠায়। আজ গৌতম এসেছিল। দিলখোলা ছেলে। সদ্য কলকাতা থেকে ফিরেছে। সেই কবে একবার তার মায়ের পাঠানো শুকনো মালপোয়া শতদ্রুর ভালো লেগেছিল, সেই থেকে দেশে গেলেই ফেরার পথে কিছু না কিছু নিয়ে আসে। এবারও অন্যথা হয়নি। কৌটা, প্যাকেট, ঠোঙা মিলিয়ে প্রায় সাত-আট ধরনের এটা-সেটা খাবার। কুচো নিমকি থেকে শুরু করে সাবুর পাঁপড় অবধি! গৌতম যাওয়ার পর খাবারগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটি ঠোঙায় চোখ পড়ল;-

শতদ্রুদা,

জানি না চিঠিটা কোনোদিন হাতে পাবে কিনা। তাও...

অবাক কাণ্ড!– চিঠির ঠোঙা, তাও আবার শতদ্রু নামেরই কোনো একজনকে লেখা! কিছুটা আমোদ আর কিছুটা কৌতূহলে ও বাকিটুকু পড়তে শুরু করল–

'পড়শু ছোটোমাসীকে ফোন করতে গণেশকাকুর বুথে গিয়েছিলাম। কাঁচের ঘেরটোপের মধ্যে তোমাকে দেখলাম। ফোন করছিলে। কাকে গো, বান্ধবী? শুনতে পেলাম, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোমার হোস্টেলের ঠিকানা বলছ। ভাগ্যিশ্ বাইরে থেকে শোনা যায়! নইলে ঠিকানাটা কোনোদিন জানতে পারতাম না। তোমাকে জিজ্ঞেস করার সাহসই হত না। সঙ্গে মা ছিল তো, লিখে রাখতে পারিনি। ভেবেছিলাম, শুনেই মুখস্থ হয়ে যাবে। এখন দেখছি, রুম নম্বরটা কিছুতেই মনে পড়ছে না! ধ্যুৎ। পিনটাও গোলমাল হচ্ছে,– ২০৮০১৬ নাকি ১৭? অর্ধেক ঠিকানার ভরসায় চিঠি ছাড়লে পৌছাবে কিনা ভগবান জানে। শেষে, যার-তার হাতে পড়লে– ছিঃ ছিঃ লজ্জার ব্যাপার ভাববে কেয়া-মেয়েটা কি বেহায়া!

আচ্ছা তোমাদের হোস্টেলে নাকি খুব র‍্যাগিং হয়? সবাই নাকি খুব নেশা-টেশা করে? তুমি ধরোনি তো? প্লিজ ওসব কোরো না। জানো, তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার একদম ভালো লাগে না। মাঝেমাঝে একা ঘরে কাঁদি। তুমিও কেমন যেন! এতদিন পর ছুটে এলে, পাড়ায় থাকতেই চাও না। আগে তবু বাবুকাকুর চায়ের দোকানে বসতে-টসতে, জানালা দিয়ে দেখতে পেতাম-' ...

চিঠির প্রতিটি ছত্রে কিশোরীর উচ্ছ্বাস। জীবন কেন যে এমন সহজ-সরল থাকে না?

'...বাবার ট্রান্সফারের অর্ডার এসেছে। পুজোর পরেই গাজিয়াবাদে চলে যেতে হবে। দিল্লির পাশেই নাকি জায়গাটা। পিসেমশায়ের এক বন্ধু বাবাকে বলেছে, সেখানে খুব নাকি লোডশেডিং হয়। জলেরও খুব সমস্যা। আমার স্কুলেও ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়ে গিয়েছে। সিনিয়র সেকেন্ডারির আগেই বলে কারো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কী-ই বা করা যাবে!

যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার ছিল। খুব খুব খুব দরকার। একবার ভেবেছিলাম, সুমনাকে দিয়ে বলে পাঠাব। ও খুব চটপটে। হয়তো ভাবছ, কেয়া-টা কী হ্যাংলা মেয়ে! না গো, আমি যা ক্যাবলা, তোমার সামনে হয়তো কথাই বেরোতো না মুখ থেকে। একপাড়ায় থাকি, তাই নামটুকু শুধু জানো। দূরে চলে গেলে হয়তো মুখটাও ভুলে যাবে। প্লিজ্ না'...

মাঝের বেশ কিছুটা অংশ ঠোঙার সুবাদে আঁঠা দিয়ে জোড়া। বহু চেষ্টায় 'নন্দননগর' শব্দটা উদ্ধার করা গেল। শেষ কয়েকটি লাইন অবশ্য পড়া যাচ্ছিল।–

'...সুমনাদের বাড়ির ঠিকানা দিলাম। ওখানেই চিঠি দিও। খামে ওপরে 'পার্সোনাল (কে.এম.)' লিখলেই হবে। ভুলেও আমাদের ঠিকানায় পাঠিও না কিন্তু। মা'র হাতে পড়লে কপালে অশেষ দুঃখ আছে। আর কী লিখি? পুজোয় দেখা তো

হচ্ছেই। তখন কথা হবে।'...

চিঠিটা খাতার পাতা হয়েই মুখ বুজে পড়েছিল হয়তো। নইলে আর কলকাতার কোনো রদ্দিওয়ালার হাতে পৌছাবে কেন? কে জানে কতবছর আগে লেখা? ও নিজে যখন ভিসার অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে ছোটাছুটি করছে,– হয়তো সেই সময়ে।

তখন জুতসই একটা জব-এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেটের খুব দরকার। ওর এক বন্ধু তন্ময়ের যোগসূত্রে কসবার একটি মাঝারি-গোছের কোম্পানিতে গিয়েছিল। মেকি সার্টিফিকেট,– কিছুক্ষণ কিন্তু-কিন্তু করলেও ডিরেক্টর ভদ্রলোক লিখে দিলেন।

কসবা চত্বরে সার সার ছোটো বড়ো মেজো কারখানা। হাজারখানেক যন্ত্রের সমবেত শব্দে কান ঝালাপালা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাইপাসের মোড়ে পৌছায়। ফেরার তাড়া নেই না তেমন। মনটাও খুব চা-চা করছিল। ভাঁড়টা হাতে নিতেই সদ্য-কেনা মোবাইলটা পকেটে বেজে উঠল।

– কিছুক্ষণ আগে বাস থেকে তোমাকে দেখলাম। রুবির উলটোফুটে।

– একটা কাজে এসেছি।

– তোমার সেই পালানোর প্ল্যান?

– প্লিজ তিন্নি, ফোনেই শুরু কোরো না।

– 'শুরু'? কী করি বলো, হঠাৎ শেষ করতে পারি না যে। ... একটা রিকোয়েস্ট্ রাখবে?

– বলো।

– বাড়ি আসবে একবার? কিছু কথা ছিল।

তিন্নির কথাবার্তা যেন বড্ড রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। স্মৃতি আর প্রত্যাশার মাঝে পথচলার সময়টুকুতে দুটি মানুষের মধ্যে কোনো সম্পর্কের জন্ম হলে কিছু সমীকরণ আপনাথেকেই জন্ম নেয়। আর সেই দুজনের মধ্যে কেউ অদ্ভুত অদ্ভুত 'অজুহাত' দিতে শুরু করলে তাকে কাপুরুষ মনে হওয়া বোধহয় আশ্চর্য নয়।

কিন্তু, তিন্নির চোখে যা অজুহাত, সেটা ওর নিজের জন্য সংকটের চেয়ে কম কিছু নয়। যে থিয়েটার ঘিরে ওর এত স্বপ্ন 'ছিল', তাও যেন ইলেকট্রিক তারের ঘুড়ির মতো আটকে গিয়েছে। সেই কোনোক্রমে আধা-স্পনসর আধা-ধারবাকি করে এক-একটা শো নামানো। কিছু হাততালি। একে-তাকে ধরে কাগজে এক-কলাম দু-কলামের রিভিউ। মাঝেমাঝে থিয়েটারকে টিভি-সিরিয়ালের প্রথম ধাপ ভাবা ছেলেমেয়ের অডিশন। মোদ্দা কথা, কিছুই হচ্ছিল না।

আর একটা উপলব্ধিও ওকে ক্রমাগত আহত করছিল। কেন জানে না, মনে হয় ও বোধহয় নিজেকে বাস্তবের চাইতে একটু বেশিই প্রতিভাময় ধরে নিয়েছিল। ভেবে দেখেছে– ওর চিন্তা বা প্রকাশ কোনোটাই 'সেই উচ্চতা'-টা ছুঁতে পারে না। ও জানে, শুধু অধ্যাবসায় দিয়ে সেই শূন্যস্থান ভরাট করা অসম্ভব। থিয়েটার শিল্প, মিস্তিরিগিরি নয়। মধ্যমানের কাজে সন্তুষ্টি আসতে পারে, তৃপ্তি

নয়।

তখন ওর বয়সও সদ্য-যৌবনে থেমে ছিল না। এযাবৎকাল তুচ্ছ, মেকি, গতানুগতিক মনে হওয়া ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ, একটা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গগুলোকে উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছিল ক্রমশ। নিজের সঙ্গে লড়াই কম হয়নি। শেষে মেনে নিয়েছে ভবিতব্য।

তিন্নির পক্ষে তার মাকে ছেড়ে কলকাতার বাইরে যাওয়া সম্ভব হত না। সেদিন কসবা থেকে ওদের বাড়ি পৌছাতেই আরও একবার সেই প্রশ্নটা করল।

– একেবারে বিদেশেই যেতে হবে? কাছাকাছি কোথাও কিছু-?

– আগেই বলেছি তোমাকে। কেরিয়ারে এতদিনের গ্যাপ পড়ে গিয়েছে, হাতে সুযোগ বেশি নেই। এই অফারটা ছাড়া বোকামি হবে।

– কথাগুলো তুমিই বলছ?

– উপায় নেই। আর অহেতুক ইনসিকিওরিটিতে ভুগছ কেন বলো তো? আমি কি চিরদিনের জন্য যাচ্ছি, নাকি তোমার সঙ্গে সবকিছু চুকিয়ে যাচ্ছি?

– কেন যাচ্ছ শতদ্রু?

কাতর আবেদন তিন্নির চোখে। শতদ্রু তাকে বুকে টেনে নেয়। কপালে ঠোঁট ছোঁয়ায়। দিকনির্দেশ ছিল না, তবু হঠাৎ করেই সেদিন শরীরের সব আগল খুলে গিয়েছিল।

ডুপঁ-সার্কেল মেট্রো স্টেশানের চলমান সিঁড়িটা শেষ হতে চায় না! অন্তত কয়েকশো ফুট তো হবেই। অফিসফেরতের সময় হলেও ভিড় তেমন নেই। স্টেশনের সামনেই কানেক্টিকাট এভিনিউ। শহরের প্রাণ কেন্দ্র বলা যায়। ছোট্ট একটা পার্কে চাষিদের তাজা শাক-সবজি, ঘরে তৈরী পাউরুটি, আইসক্রিম, হ্যাম-বেকনের বাজার। সপ্তাহে একদিন করে বসে। অনেকটা যেন গাঁয়ে-গঞ্জের হাটের মতো। শতদ্রু প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসে। কে জানে, হয়তো 'ঝোলা হাতে বাজার করার' স্বাদ পেতেই। সেদিন আগত ফার্ম-কার্টগুলিতে সাদা সবুজ বেগুনি– হরেক কিসিমের তাজা কপি, মুলো, সেলেরি, ক্যন্টিলোপের আধিক্য। আশ্বিন এসে গেল তবে!

বাঙালি অ্যাসোসিয়েশানগুলির পাঠানো ই-মেলে আগমনির সুর বাজতে শুরু করেছে। মা চলে যাওয়ার পর কলকাতায় ফেরার টান তেমন অনুভব করে না। দিদি চিরকালই যেন কিছুটা দূরগ্রহের বাসিন্দা, তিন্নির সঙ্গেও এখানে আসার বছর খানেক পর থেকে যোগাযোগ তেমন ছিল না। মোটামুটি সবকটি বড়ো শহরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পুরোনো বন্ধুবান্ধব, সহপাঠিরা। গত চার-পাঁচ বছর তাদেরই কারো না কারো শারদীয়া নিমন্ত্রণে হাজির হয়। এবার অর্কদের ওখানেই যাওয়ার কথা ভাবছে।– ফিলাডেলফিয়ায়। নবমী-দশমীতে নাট্য উৎসব আছে। নতুন-পুরোনো মিলিয়ে কলকাতার বেশ কয়েকটি দল আসার কথা।

মোবাইল বেজে ওঠে। বিতস্তা। প্রায় মাস চারেক পর।

– হ্যাঁ দিদি, বল।

– কেমন আছিস?

– ভালো। তুই?

– খারাপ নেই। ... একটা খবর দেব ভাই, বিয়ে করছি।

– মানে! সে কী– আই মিন্ কাকে?

– নিশীথ। চেষ্টা করলে মনে করতে পারবি বোধহয়। আজ নোটিশ দিলাম। পুজো-টুজো কাটলে-। সামনের মাসের আঠারো তারিখ। তুই এলে ভালো লাগবে। পারবি?

– অবশ্যই আসব। কিন্তু, ওই সময়টায় আবার দিওয়ালির রাশ্ থাকবে। টিকিট পাওয়াটা-।

– সমস্যা হলে জানাস। বিয়েটা দু-চারদিন পিছোতে হলেও কোনো সমস্যা নেই। জনা-দশেক বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কাউকে ডাকছি না।

– সে ঠিক আছে। কিন্তু-!

বিশ্বাস হচ্ছিল না শতদ্রুর।– এই বয়সে? হঠাৎ? মা চলে যাওয়ার পর থেকে দিদি একা। সেই কারণেই কী? মনে হয় না। প্রেম? অসম্ভব শোনাচ্ছে। দিদির রুচি ও মোটামুটি জানে। এই নিশীথদা বিপত্নীক। একটি ছেলে অথবা মেয়েও আছে। লোকটি আদতে ভোঁতা গোছের। স্কুল-কলেজের সিলেবাসের বই, খবরের কাগজ আর পাঁজি ছাড়া জীবনে কিছু পড়েছে বলেও মনে হয় না। বড্ড বেশি পুজো-আচ্চা, মাদুলি-আংটির বাতিক। আর সেখানে দিদি ঠিক উলটো। মনে আছে, বছর দশ-বারো আগে একবার এক সম্ভাব্য পাত্রের বাবা দিদি শিবরাত্রি করে কিনা প্রশ্ন করায় দিদি সটান জবাব দিয়েছিল, 'না'। ভদ্রলোক বেশ লম্বা-চওড়া বক্তৃতায় সেসবের উপকারিতা বোঝানোর চেষ্টা করাতে সে মুখের ওপর বলেছিল,– 'অশিক্ষিত মানুষজনের পুজো-আচ্চা একমাত্র সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতিই একমাত্র পুজো।'

সেই দিদি আর নিশীথদা! ... ওদের বাড়ির বাগানে অপরাজিতা লতাটির ধারে-কাছে কোনো বড়ো গাছ ছিল না। ছিল এক হাত-পা ভাঙা চেয়ার। গাছটি মাটিতে লুটোতো। একদিন দেখা যায়, সেই বাতিল চেয়ার বেয়ে প্রাচীরের উপরে উঠে এসেছে। দিদিও কি-? না। দিদির চরিত্রের সঙ্গে তা খাপ খায় না। সে যেমন নিজেকে 'লতাগাছ' মনে করার পাত্রী নয়, তেমনই অন্য একজন মানুষকে স্রেফ্ ঠেকনা হিসেবে দেখবে না। তাহলে কি এই সেই সুস্থ মানুষের পাগলামির ইচ্ছে? কে জানে!

ফিলাডেলফিয়া শহরটা ঘণ্টা-তিনেকের পথ। ফ্লোরটাউন রোডের এক বাগানবাড়িতে পূজামণ্ডপ। ডাউনটাউনের ভারতীয় দোকান থেকে কেনা পাঞ্জাবী। স্কার্ট-ট্রাউজারে অভ্যস্থদের দিন-চারেকের শাড়ি-বিলাস। দুপুরে খিচুড়ি আলুর দম।

রাতে জ্যাক-ড্যানিয়েল সিলভার সিলেক্ট। একটু গানবাজনা, একটু সিঁদুরখেলা। কচিকাঁচাদের ভাষায়, 'ডুর্গাপুজো ইজ় কুল মম্'।

অষ্টমীর সন্ধের দিকে থিয়েটার-গ্রুপগুলো সঙ্গে গেট-টুগেদারের আয়োজন। বেশ কয়েকজন নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী এসেছেন। ঘরোয়া পরিবেশে টুক-টাক আড্ডা চলছে। আর তখনই হঠাৎ চমকে ওঠে শতদ্রু– তিন্নি!

– দেখে খুব অবাক হয়েছ, তাই না? আমি কিন্তু হইনি। জানতাম একদিন না একদিন দেখা হবে। নইলে বৃত্তটা পূর্ণ হত না যে।

– তুমি কি এখনও-?

– পাগল নাকি! ... তোমার কী খবর? বিয়ে করেছ?

– সুযোগও মেলেনি, সাহসও পাইনি। তুমি?

– পল্লবকে মনে আছে তোমার?– বেহালার কাগুজে নাট্যগোষ্ঠীর?

– হুঁ।

– ওকেই। ও এখন 'সুপ্রভাত'-এ আছে। আর আমি 'সহজপাঠ'-এ।

– যাক। থিয়েটারটা এখনও চালিয়ে যাচ্ছ দেখে ভালো লাগছে।

তিন্নির চোখে এক মুহূর্তের জন্য হাসি ছুঁয়ে যায়। হয়তো অবজ্ঞারই। না, শতদ্রুকে আঘাত করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। নিজের কথাই শোনায়।

– এর ক্রেডিটটা পল্লবেরই প্রাপ্য। বিয়ের পর নিজেই ছাড়তে চেয়েছিলাম। ও দেয়নি। তারপর দেখলাম, ঠিকই তো বলছে– আমাদের সম্পর্কের সূত্রপাত তো থিয়েটারকে ঘিরেই। আর অন্য কিছু ভাবিনি। শুধু ডেলিভারির আগে-পরের কয়েকটা মাস ছাড়া একটা শো-ও মিস্ করিনি। এই যে এসেছি, দেশে পল্লবই মেয়েকে সামলাচ্ছে। মেয়েও খুব বাপ-ন্যাওটা।

– মেয়েকে মিস্ করছ না এখানে?

'করছি তো। খুব মনখারাপ লাগলে'– কাঁধের ব্যাগ থেকে একটি ছোট্ট বেবি-পাউডারের কৌটো হাতে নেয় তিন্নি। 'এইটার গন্ধ নিচ্ছি, ভাবছি মেয়ের গন্ধ। খুব সুন্দর। দেখো।'

তখনই কার-একটা ডাকাডাকিতে তিন্নি সেদিকে চলে যায়। বেবি-পাউডারের কৌটোটি শতদ্রুর হাতে ধরা। ও ঘ্রাণ নেই। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে– দিদির ড্রয়ারে তার মেনোপজের প্রেসক্রিপশানের পাশাপাশি ও এমনই একটা কৌটা দেখেছিল না! দিদি কি তবে-?

ট্যাক্সিটা থামলেও ও মিটার চালু রাখতে বলে। সামনে একটা পান-সিগারেটের দোকান।

– বাবুদার চায়ের দোকান কোথায় বলতে পারেন?

– কাদের বাড়ি যাবেন?

– না মানে সেরকম কিছু নয়, ওই চায়ের দোকানটাই খুঁজছি।

– বাবুকাকার দোকান ছিল বটতলা রোডের মুখে। এখন যেখানে পার্টি

অফিস, তার পাশেই। কিন্তু, কাকা তো মারা গিয়েছে ছ'-সাত বছর হল। দোকানও আর নাই। ওদের বাড়ি যাবেন? বাবুকাকার বৌ-ছেলে তো এখানে আর নেই। গুজরাটে থাকে শুনেছি।

– না ঠিক ওদের খুঁজছি না। ... আচ্ছা, এই চত্বরে 'গণেশ' নামের কারো টেলিফোন বুথ আছে?

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ চোখে এই আজব প্রশ্নকর্তাকে মাপার চেষ্টা করেন। লোকটা অচেনা। বুকপকেটে পাশপোর্ট। জামাকাপড় দেখেও মনে হয় বিদেশ থেকে এসেছে, টেলিফোন বুথ আর চায়ের দোকান খুঁজতে!– তাও ভরদুপুরে!

– ক' বছর পর দেশে ফিরলেন স্যার? কলকাতায় টেলিফোন বুথ আর আছে নাকি! গণেশদাও মারা গিয়েছে। তবে দোকানটা আছে। গণেশদার ছেলে মোবাইলের রিচার্জ বেচে, সোজা এগিয়ে যান-।

– দাদা, শতদ্রু নামের কাউকে চেনেন?– কানপুরে পড়ত।

– কেন চিনব না, সুভাষজেঠুর ছেলে। আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট খেলেছি। শতু পড়াশোনায় হেব্বি ছিল। প্রতিবছর বলে-বলে স্ট্যান্ড্ করত। ব্যাটিংয়েও সলিড। পাড়ার টিমে আমি আর ও ওপেন করতাম। শচীনের বিশাল ফ্যান ছিল। এখন তো আমেরিকায় থাকে। ওই যে দেখছেন প্যান্ডেল খুলছে, তার পেছনেই ওদের বাড়ি-।

– কেয়া নামের কেউ-?

– বাদলকাকুর মেয়ে তো? ও তো বোনের বন্ধু ছিল। আপনি? কী ব্যাপার বলুন তো দাদা, কোনো লাফড়া কেস্ নাকি?

– না না, তেমন কিছু নয়। কেয়াদের বাড়িটা কোথায়?

– শতুদের পাশের বাড়িটাই তো-। কিন্তু, দুটো বাড়ির একটাও তো এখন নেই।

– এখন নেই মানে?

– সঞ্জয়দারা ফ্ল্যাট তুলছে। বত্রিশশো টাকা স্কোয়ার ফিট্-।

...

এমন ক্ষ্যাপাটে প্যাসেঞ্জারের পাল্লায় পড়ে ট্যাক্সির ড্রাইভার উশখুশ করছে। ফাঁকা মণ্ডপ ছাড়িয়ে আসে শতদ্রু। দিন-তিনেক আগে কালীপুজো গিয়েছে। ফুল, সিঁদুর, প্রদীপ, ভাঙা ধুনুচি,– বিসর্জনের চিহ্নগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ঠুক-ঠাক শব্দে দুজন লোক বাঁশের শরীর থেকে প্যান্ডেলের কাপড় খুলছে ঢিমেতালে।একটা দিক বে-আব্রু হতেই দৃশ্যমান হয় দুটি বাড়ির কংকাল। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ভাঙাচোরা দেওয়াল, ইঁট-পাথরের স্তূপ। ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তিন্নির সেই কৌটাটির ঘ্রাণ নেয় আরও একবার।

মোবাইল বাজে।

– হ্যাঁ দিদি, বল।

– কী রে, তোর ফ্লাইট নামার কথা সকালে! ... ফোন করব কি করব

না ভাবছিলাম। ইন্টারন্যাশানাল রোমিং করিয়েছিস কী না– জানতাম না তো। কোথায় তুই?

– নন্দননগরে। বেলঘরিয়ার কাছাকাছি।

– কোনো বন্ধুর বাড়ি?

– ধ্যুস্, এদিকে আগে কোনোদিন আসিইনি।

– তাহলে?

– কিছু না। পাগলামিও বলতে পারিস।

– এক্স্যাক্টলি কী করছিস বল তো?

– খুঁজছি। ... অন্য এক শতদ্রু-কে।

*****

'বঙ্গোপসাগর', ২০১৩

মাধুকরী

ভালোই মেতেছে! বৃষ্টির তোড়ে দশহাত দূরের মানুষকেও যেন চেনা দায়! পশ্চিম কালো হয়ে আসছিল সকাল থেকেই। গুপ্ত-বৃন্দাবনের মেলার তাড়া না থাকলে হয়তো ঘর ছাড়ত না সুদাম। ঘরে পরিবার আছেন, সন্তান আছে। পিণ্ডদানেরও প্রসঙ্গ নাই। তবু কেন যে জ্যৈষ্ঠমাস এলেই টান আসে— সে' রহস্য প্রভুই জানেন!

ট্রেনটা সিঁদুলি স্টেশানের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল।— ওভারহেডের তারে কলাপাতা ফেলেছে। লাইনের ওপরেও শয়ে শয়ে লোক। ক'দিন ধরেই ঝুটঝামেলার খবর ছিল। কিছু দাবী-দাওয়া নিয়ে দফায় দফায় মিছিল, ধর্মঘট, ট্রেন অবরোধ। আজ বাড়াবাড়ি হয়েছে।

কী-করি কী-করি ভেবে মরছিল সুদাম। হঠাৎ কয়েকজন পাথর ছুঁড়তে শুরু করল। এক-দু'জনের চোটও লাগল। আতঙ্কে পড়িমরি নেমে স্টেশনের দিকে ছুট লাগায় অনেকজন। কিন্তু, ছোট্ট হল্ট্-স্টেশনটাও ততক্ষণে লোকে লোকারণ্য। সেখানেও ভাঙচুর চলছে। সুদাম রেলপথের ঢাল বেয়ে নেমে মেঠোপথ ধরে। হাঁটতে শুরু করে পাকা রাস্তার দিকে। মেঘ ডাকছিল এতক্ষণ। কয়েক পা এগোতেই বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়।

ছাওনিতে দাঁড়িয়ে ওর হঠাৎ যেন উপলব্ধি হল— ইচ্ছার মালিক যিনি, তিনি বলবেন আর অবিচারে তার ইচ্ছা মানবো। এ-ও এক সেবা। এই ইচ্ছাপালনের জগত বৈকুণ্ঠ। তারই হুকুম, তারই খিদমৎ। কেউ সেবাকে ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য আর হিসাব-নিকেশে বাঁধে। যে বাঁধে না, তার ঠাঁই বৈকুণ্ঠেরও উপরে। প্রকোষ্ঠ গোলকে। সেই সেবা, অনুরাগের সেবা— হিসাব নাই, নিকেশ নাই। ও-তে না মাতলে মনও মাতে না।

না, সাধকের পথে চলা হয়ে ওঠেনি। শেষমেষ ব্যবসার হাল ধরতে হলেও সেদিকে মন নেই তেমন। মান-ও যে নেই বিশেষ। হাত মাঝেমাঝেই ফসকে যায়। গৃহিণী আছেন, তাই ভেসে যায়নি। সংসারের টান আট আনা, আট আনা ভজন কীর্তনে। তাই, একটানা বাস করলে প্রাণ হাঁসফাঁস করে।

মনে দুঃখ নাই তেমন, প্রলম্বিত বিষাদ আছে এক। শুধুই কি বিষাদ? অজান্তে সে' ঘরের আগল খুললেই প্রাণান্তকর হাহাকার ঝামলে পড়ে যেন! গানটুকু আছে— সেটিই ভরসা। কখনও শোনার আশায়, কখনও গাওয়ার নেশায় মাঝেমধ্যে ছুটতে হয় এই গ্রাম থেকে সেই মফঃস্বল, অমুক মেলা থেকে তমুক

আখড়া। কিন্তু, তা কি শুধুই নামগান আর সাধকসঙ্গের টানে?— স্মৃতিপটে একটি মুখ, একটি নাম ফুটে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে বুকের ভিতর থেকে।

মালদা সদর থেকে দশ মাইল দূরের পথ পিয়াসবাড়ির মোড়। সেইখানে মেলার শুরু। দূরদূরান্ত থেকে কত বোষ্টম যে আসে, তার গোনাগুনতি নাই। গুপ্ত-বৃন্দাবনি মেলায় তাদের অনেকে ঘরও বাঁধে। রূপ-সনাতনের কালে কাপড়ের আড়াল থেকে বৈষ্ণবীর অনামিকা দর্শনে বিয়ে ঠিক হত। এখন সে' চল আর নাই। অনেকের সম্বন্ধ আগেভাগেই ঠিক থাকে। অনেকের আবার মেলার পথে-পথে চলতে—চলতেই মন মজে। বাঙালির সনে অহমিয়ার, উড়িয়ার সনে তেলেগুর। গৌড়েশ্বরীর আশীর্বাদ নিয়ে কণ্ঠিবদল হয়। মেলার পথে পথে আসর বসে। সুরে-তালে সর্বক্ষণ প্রেমধারা বইছে আর মন বইবে না? বোষ্টম-বোষ্টমীর মন মজে। পদে আছে— পিরিতে মজিলে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যদি মুন্সি আবদুলের প্রেমে মজতে পারেন, রাজিয়া সুলতানা যদি দাস জামালে মজতে পারেন, তাহলে—।

নিজেকে থামায় সুদাম। ওরে মন, তোর হয়েছেটা কী? কেন বারবার অকারণ এমন 'বেশ করেছে' রব! নিয়ম-না-মানা প্রেম দুনিয়ায় কী এমন আশ্চর্য ঘটনা? শ্রীরাধাও তো কলঙ্কিনী হয়েছেন।

চিন্তায় শ্রীরাধার নামখানি ভেসে আসতেই সেই নামখানা গোঁসাইয়ের ভাবনা স্পর্শ করে যায়। মনের কোন এক অচেনা গহীন দেশ থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। আগে বহুবার ঘটেছে। ভাবে মাতাল হয়ে গাইবার সময় 'শ্রীরাধা' অজান্তেই উদ্ভাসিত হয়েছেন অন্য নামে। বুদ্ধি বলে— চিত্তচাঞ্চল্য। চিত্ত বলে— মনের ভুল। মন মাথা খুঁড়ে মরে— 'আমায় আর বলতে দিলে কবে!'

টালি আর পুরোনো ভাঙাচোড়া টিনের রংমিলান্তি ছাদের ফাঁকফোকড় দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরার বিরাম নেই। এই ছাদের তলায় সুদাম ছাড়াও রয়েছে দুজন। সঙ্গী গাঁটরিগুলি দেখে মনে হয় ব্যবসায়ী বুঝি। হাত-চারেকের তফাতে দু'খানি দোকানঘর। ভাতঘুমের পর দোকানিরা এবেলা বোধহয় বৃষ্টিতে ঝাপ খুলতে আসেনি। তবু ঘরগুলির সামনে ছাওনি ছিল বলে রক্ষে। কয়েকজন মানুষের মাথা বাঁচানোর ঠাঁই জুটেছে। অন্য ছাওনিতে দুই স্ত্রীলোক কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। বৃষ্টিতে মুখগুলি স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু, তবু যেন চেনা-চেনা ঠেকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সুদাম,— প্রভু তোমার লীলা বোঝা দায়! আজ এতদিন পর, এমন ভাবে স্মৃতিপটের মুখখানি চর্মচক্ষুতে দর্শন হবে কে তা জানতো? প্রৌঢ়প্রায় হৃদপিণ্ডে সহসা যেন যৌবনের চাঞ্চল্য।– শ্রীরূপা!

অতীতে প্রভু দু'বার পথ মিলিয়েছিলেন, সুদাম দু'বারই হারিয়েছে। বিষয়ের ঘোঁটে যে আশয় হাতছাড়া হয়, তার শোকে উদ্বাস্তুর বুক ফাটে। কিন্তু, আসরে তখনও সেই বিষয়বুদ্ধি;— মুখ ফুটতে দেয়নি। আজও কথা বলার ইচ্ছে জাগলেও প্রসঙ্গ খুঁজে পায় না। অনেকগুলো দিন বয়ে গিয়েছে। পরস্ত্রীও বটে!

নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ছাওনির এককোণে একখানা সুর গুণগুণ করে কিছুক্ষণ। দীর্ঘ আলাপের পর শেষ অবধি পদের মায়া কাটাতে পারে না— 'এক অদ্ভুত সখি... জনমিঞা নাঞি দেখি... হেন রামা কাহার নন্দিনী।... গিয়াছিলাম গোচারণে... দেখিল কালিন্দী বনে... পুষ্পতুলি ফিরিছে কামিনী॥'

— এখনও বুঝি আলাপে এত সময় লাগে, গোঁসাই?

সুদাম অবাক হয়। গভীর আনন্দও জাগে মনে,– ভোলেনি আজও!...

এক যুগ আগের ঘটনা। বীরভূম জেলার কোটাসুর আশ্রম। নারায়ণচাঁদ গোঁসাই আর তার সাধনসঙ্গিনী ক্ষ্যাপা মায়ের নামে প্রসিদ্ধ সেই মাটি। বৃন্দাবনি 'অনুমান' নয়, সেথায় সহজিয়া 'বর্তমান' সাধনার চল। সেখানেই মানিকদাস আর তার পরিবার বামার সঙ্গে আলাপ। এক প্রহরেই আপনজন হয়ে উঠেছিল তারা। একসঙ্গে নামগান, সাধন ভজন কীর্তন। একপংক্তির ঘুম, একই সঙ্গে জাগরণ, একহাঁড়িতে অন্নসেবা।– স্বাদে অমৃত।

মানিকদাসেরা আমিষ খায়, তবে শুধুই চারামাছ। কারণ জানতে চাইলে সে বলেছিল, 'শরীরের নাম মহাশয় হলেই কী আর যা খাওয়াবা তাই সয় ভাই?'

কথাটির গূঢ়ার্থ প্রথমে ধরতে পারেনি সুদাম। চোখেমুখের কৌতূহল আন্দাজ করে বুঝিয়ে বলেছিল মানিকদাস, 'শুনো ভাই, ভাবি বটে স্মৃতি মগজে থাকে, ব্যাপারটা শুধু তেমনধারা না। সারা দেহ জুড়ে স্মৃতির বাস। নইলে প্রিয়া-বিরহে প্রতি অঙ্গ কাঁদবে কেন বলো দেখি? আমাদের বাপ-পিতিমের চারপুরুষ আগের কাউকে আমরা দেখি অবধি নাই, কিন্তু তাদের মতো নাক-চোখ-কান দেহে ধারণ ঠিকই করি। তেমনই, পেটে চিড়া দাও আর মুড়িই দাও, পিঠা দাও আর পুলিই দাও— পেটের ভিতরের নাড়িভুঁড়ি তাদের স্মৃতি থেকে মানুষদেহই গড়ে। তবে কি জানো, এই যে গড়া তা শুধু বাইরেটুকুই। অন্তরের কথা অন্য।

ঠিক ধরতে পারে না সুদাম। বামাসুন্দরী বলে, 'বুঝলা না ভাই? বাপের মতো চোখ-মুখ পেলেই কি ছেলে বাপের চরিত্তিরও সবসময় পায়? তফাৎ গড়ে তার সঙ্গ। গুরু বলেন, খাদ্যও সঙ্গের মতো। শুধু দেহ গঠনেই না, মন গঠনেও তা ভেদ করে। ভগবানের মর্জিতে গাছপালার বংশরক্ষা আছে, দেহে কাম নাই। তাই ফলমূল সাধকের খাদ্য। প্রাণীর দুনিয়ায় মাছ নিষ্কাম কিনা, তাই মাছেও দোষ লাগে না।

সুদাম আবাক হয়ে যায়। 'বলি দাদা, এমন একজন বৌদিদি তুমি জোটালে কোত্থেকে?'

মানিকদাস হাসে, 'ও ক্ষেপি আমার জন্যই জন্মেছিল। গুরুই জুটাইছেন।'

মৃদু আপত্তি তোলে বামাসুন্দরী, 'না গো ভাই। তোমার দাদার যত্ত বানানো কথা। পুরুত ডেকে, শাখা-নোয়া-সিঁদুর দিয়েই বিয়ে হয়েছিল আমাদের। জ্ঞাতি-আত্মীয় সবাই আছেন। তারা সংসারী মানুষ। আমরাই শুধু এই পথে।

— ঘর-সংসারের সাধ হয়নি কখনও?

বামাসুন্দরী হাসে, 'সংসার কি শুধু পাকা ভিটে আর কাঁসার থালায় হয় ভাই?'

মানিকদাস গান ধরে, 'রূপ নিরূপন হবে যখন... মনের মানুষ দেখবি তখন... জনম সফল হবে ও মন... সে রূপ দেখিলে।'

সুদাম শুনেছিল, হাঁড়ি যেমন অন্নের স্বাদ পায় না, তেমনই সাধনায় নারী আধার মাত্র। তারা রেচক, পূরক, কুম্ভক। তারা কষ্টিপাথর।— সোনা নয়, তবে সোনা কতটা খাঁটি তা যাচাই করার মাধ্যম। কিন্তু, বামাসুন্দরী নিজেও সাধিকা। দুটি আত্মা যেন এক হয়ে ধাইছে পরমাত্মার মিলন অভিসারে।— যুগলকে দেখে বড়ো ঈর্ষা জেগেছিল মনে।

সেই রাতের মোচ্ছবে মানিকদাস নিজে গোটাতিনেক পদ গাইবার পর সুদাম-কে মধ্যমণি সাধলো। অত লোকের মাঝে প্রথমবার, বুক টিপটিপ করছিল ভয়ে। তবে গৌরাঙ্গের দয়ায় মুখরাটুকু ধরতেই যেন কিন্নরের আশীর্বাদ ঝরতে লাগল ।

আসরের ডানদিকে পুরুষদের বসার ব্যবস্থা, বামে স্ত্রীলোক। গানের মাঝে সেদিকে একবার নজর যেতেই বুকে শিহরণ জাগে। খোলের একটি তাল বৃথা যায়।– হে ভগবান, এমন চোখ মানুষের হয়! সুন্দর শ্বাস নেয় তার অন্তরে। যেন একজোড়া হিরণ্ময় মণি। যেদিকে দৃষ্টি যায়, সেইদিক ধনী হয়ে ওঠে। তাই বোধহয় মুঘল তলোয়ারের মতো ভুরু-যুগল অমন পাহারায় বসেছে।

চোখ তো নয়, চকিতা— নিজের ছায়াতেই তার কৃষ্ণভ্রম। সে চোখ স্বপ্ন আর দুনিয়ার দ্বন্দ্ব। পলক ফেলতেই যেন জমিয়ে রাখা সব ইচ্ছের প্রাচীরে ফাটল ধরায়। সামান্য অবহেলায় বইতে পারে মর্মভেদী ঝরনা। নাইতে মন চায়। খুব ডুবতে ইচ্ছা করে। না, ক্ষণিকের প্রৈতি নয়, এ তার দীর্ঘদিনের অনুভব। দেখার সেই মুহূর্তে চমক ছিল, জমকও ছিল। নিয়মনীতির ধমক ছিল না। তাই দ্বিতীয় পদে জয়দেবের বদলে চণ্ডীদাস উঠে এসেছিলেন কণ্ঠে— 'বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।... দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি... কুল শীল জাতি মান...'।

সঙ্গী বাজনদারেরা অবাক হয়। বামা-মানিকদাসের মুখমণ্ডলে উঁকি দেয় প্রশ্রয়ের হাসি। তৃতীয় প্রহরের মুখে আসর ভাঙে। মাথাটি ঝুঁকে রয়েছে সামনে। পা একদিকে চলে, মন যায় অন্যদিকে। আস্তানায় ফেরার পথে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোনো শব্দ আসে না সুদামের ভিতর থেকে। অথচ, কতই না সংলাপ হট্টগোল জুড়েছে সেথায়! মানিকদাস বলে, 'দুপুরে মাছে কথা তুলেছিলা না ভাই? সাধকগণরে মাছ ধরতে লাগে। চিত্তে একাগ্রতা আসে। চণ্ডীদাসও ধরতেন। ছিপ ফেইলা আবিষ্ট মনে চেয়ে থাকতেন ফাৎনার দিকে। জলে ফাৎনা নড়তো, তিনি খোঁজতেন কাব্যরসের ধারা। একদিন রজকিনী রামী পাশের ঘাটে আইলো কাপড় কাচতে। চণ্ডীদাস তার মুখের পানে চাইতেই বেকুব,— এই তারে রাধিকার মতো লাগে, এই লাগে শ্রীকৃষ্ণ। আবার পরক্ষণেই মনে হয় সাক্ষাৎ মা বাশুলী! চণ্ডীদাসের ভাব দেখে রজকিনী হাসে— ও ঠাকুর, মাছে যে তোমার

ছিপখানা টেনে নিয়ে যায় গো!'

ঘরের সামনে পৌছে বামাসুন্দরী সস্নেহে ওর মাথায় হাত রাখে।— 'ভাই, মন দিয়েছো বুঝি! তার সনে আলাপের সাধ হয়?'

বহু ক্লেশে অর্জিত গুটিকয় শব্দ কোনোমতে উচ্চারণ করে সুদাম, 'আমি তাকে চিনি।'

— আপনজন?

উত্তর ছিল না। অবনত মুখে ও দাঁড়িয়ে থাকে শুধু।

বাপ হরিদাস বসাকের ইচ্ছে ছিল তারই মতো ব্যবসার হাল ধরুক ছেলে। কিন্তু, সেদিকে ওর মন ছিল না। মাঠে ঘাটে গান গেয়েও যা সুখ, তার কানাকড়িও মেলে না গদি ক্যাসবাক্স হাতপাখার আয়োজনে। জোর খাটানোর চেষ্টা হয়েছে একাধিকবার। লাভ হয়নি বিশেষ।— বাপেরই সন্তান কিনা, সুদামেরও জেদে কমতি নাই। এমন উড়ু-উড়ু ছেলেকে সংসারী করে তোলার দাওয়াই খুঁজতে ব্রজঘটকের ডাক পড়ে। একখানা ছবি আর কুলুজিও হাতে এসে যায় হপ্তাদুয়েকের মধ্যে। গ্রাম: শিবনারায়ণগড়, জেলা: হুগলী, পিতামহ: দয়াময় ঘোষ, পিতা: অরুণ ঘোষ। বাড়ির বড়োমেয়ে। গোত্র: সৌকালিন, রাশি: কন্যা, নক্ষত্র: চিত্রা, গণ: রাক্ষস।

হরিদাসের প্রখর বিষয়বুদ্ধি খটকা গোনে, 'কুলীন কায়েতের বাড়ি থেকে বেনের ঘরে সম্বন্ধে আপত্তি নাই— ব্যাপারখানা যে হজম হয় না ঠাকুর। সুউপায়ি পরিবার, মেয়েও অসুন্দরী না। মাঙ্গলিক নাকি?'

— না, না। পঞ্জিকা না দেখে কি কেউ বাঁধা যজমানের ঘরে সম্বন্ধ আনে!

— অন্য দোষ-খুঁৎ কিছু নাই তো? মেয়ের গণটাও যে রাক্ষস।

— কী যে বলেন! নিজের হাতে তাকে আশিব্বাদ করিছি। ভাবভঙ্গী, হাঁটাচলা, কথাবার্তা— সবেতেই সুলক্ষণা। সুদামের ছবি আর কুষ্ঠীখানা দেন। মিলিয়ে দেখি। কথা এগুই।

— ভালো করে তত্ত্বতলাশ করেন। মেয়ের চোখ বড়ো চঞ্চল। এ'বাড়ির কুলাঙ্গারটার মতো সে-ও বারমুখো নয় তো? একেই যে হাঁড়ি, তার ঢাকনাও যদি সৃষ্টিছাড়া হয়, সব্বনাশ হবে।

বাপের আশঙ্কার কথাগুলো শুনে বেশ কৌতুকই জেগেছিল। ওর সঙ্গে মতের মিল না হলেও লোকটা যে মানুষ ভালোই চিনতে পারে, সে'কথা বিলক্ষণ জানা। অমন মাপমতো হাঁড়ি-ঢাকনার যুগলবন্দীর লোভ যে জাগেনি— তাও নয়। ছবিখানা দেখতেই জেদ-টেদ সব উধাও যেন। ওর জন্য এই মেয়ের সম্বন্ধ-? কল্পনায় কেবলই নিজেকে তুচ্ছ মনে হয় তার পাশে। কিছুদিনের জন্য দোটানায় পড়ে থাকা-- না, ব্রজঘটক আর কোনো খবর দেয়নি তারপর। হয়তো পছন্দ হয়নি শেষমেষ, মিল হয়নি গ্রহ-নক্ষত্রে।

এই উচাটন নজর এড়ায়নি হরিদাসের। চোখেমুখে 'জানা ছিল মুরোদ, কে

বাপ আর কে ব্যাটা ভুলে যেও না'— ভাবখানা স্পষ্ট প্রকাশ পেতে থাকে কথায় কথায়। দ্বিগুণ উদ্যমে শুরু হয় তত্ত্বতলাশ,— 'শিঘ্র বিবাহ' ও 'অসবর্ণ চলিবে না'।

সহ্য হয়নি। পুরোনো জেদখানা আঁকড়ে বাড়ি ছেড়েছিল সুদাম। তারপর, এ'পথ-সে'পথ ঘুরে পৌছেছিল নারায়ণচাঁদের আখড়ায়।

না, গানের আসরে বিয়ের চিহ্ন কিছু নজরে পড়েনি। তবে অনেকগুলো 'কিন্তু' পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন সে ঘরছাড়া যুবক। মনস্থির করেছে আখড়ায়-আখড়ায় জীবন কাটাবে। আর আসরে গান শুনতে এসেছে বলেই যে সে' মেয়ে যে ভাঙা চাল মোটা কাপড়ের জীবনে মানিয়ে নেবে— তা কেন? মানুষের সাধ থাকা তো অন্যায় কিছু নয়। দূরতম কল্পনাতেও আসেনি– সেদিনের জেদটুকু তাকে এমন ভাবে উপহাস করবে। যে গোপী নিত্যকালের লীলারসের সঙ্গিনী, সে নিত্যপ্রিয়া। তেমন মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদবে না, সে কি হয়? পরদিন ভোর থাকতেই ও আখড়া ছেড়ে পালায়। বড়ো ভয় করছিল। লজ্জাও।...

বছরপাঁচেক পরের কথা। সেদিন পৌষ সংক্রান্তি। এই সময় সোনারুন্দীর মন্দির থেকে গৌর, নিতাই ও বলরামের দারুব্রহ্ম দিন-ছয়েকের জন্য উদ্ধারণপুরের আশ্রমে আসেন। উপলক্ষ্যে অন্নভোগ হয়, মেলা বসে। কাটোয়া থেকে মাইলতিনেকের পথ এই আশ্রম।

আগেরদিন কাটোয়ায় নেমেছিল সুদাম। কুয়াশায় সারাটা পথ ট্রেন চলেছে টিকিয়ে-টিকিয়ে, যেখানে-সেখানে থামতে-থামতে। পৌছাতেই এত দেরি হয় যে, আস্তানা খোঁজার দরকার পড়েনি। রাতটুকু স্টেশানেই কাটিয়ে উদ্ধারণপুর যাওয়ার প্রথম বাসখানা ধরতে অন্ধকার থাকতেই রওনা দিয়েছিল।

ভোর হয়-হয়। বাস ছাড়ার সময় হয়নি তখনও। একটু দূরে একখানা বুড়ো ষাঁড় অলস ভঙ্গীতে মাছি তাড়াচ্ছে। লাগোয়া চায়ের দোকানে আঁচ পড়েছে সদ্য। ওইদিকটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়। সব মিলিয়ে জনা বিশেকের বেশি লোক নাই চারপাশে। কাটোয়ার শীত ভয়ঙ্করা। উত্তুরে হাওয়ায় হাড়-পাঁজর জমে যাওয়ার দশা। হাতজোড়ায় সাড় নেই যেন। ঠোঙা কাগজ আবর্জনার সঙ্গে গুটিকয় ঝটতি-পড়তি কাঠের টুকরো জড়ো করে আগুন পোয়াচ্ছে কয়েকজন। সুদামও যোগ দেয়।

একটু তফাতে বসেছিল একজন লোক। মলিন শতছিন্ন পোশাক, উশখো খুশকো চুল, একমুখ দাড়িগোঁফ। শরীরে যেন শীতের কোনো প্রভাবই নাই! পাগল-ছাগল হবে কোনো— সুদাম ভাবে। হঠাৎ আপন ঘোরে গান ধরল সে'লোক, 'জেগে দেখো আর তো নিশি নাই গো ... জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই...'।

এই কণ্ঠ ভুলবার নয়। এমন এক স্থানে যে আবার মানিকদাসের সঙ্গে দেখা হতে পারে— ভাবনায় ছিল না! কিন্তু, এ কী দশা তার! সুদাম এগিয়ে যায়,– 'দাদা, চিনতে পারেন?'

গান থামায় মানিকদাস। চোখেমুখে কোনো বিকার নেই।

— কোটাসুরের মোচ্ছব, আসরে গাইতে বললেন— মনে পড়ে?

— ওই মনখানাই যে রোগ। পড়েই থাকে।

— বৌদিদি কই?

'ক্ষেপি?'— দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মানিকদাস, 'সে মানুষ মায়া কাটইছে গো ভাই। গেল বর্ষায় তারে শঙ্খচূড়ে লইয়া গেছে।'

আকস্মিক দুঃসংবাদে সুদাম স্তম্ভিত হয়ে যায়। কী বলবে— ভেবে পায় না। নীরবে বসে রয় পাশটিতে। বাসের সময় হয়ে এসেছিল। কন্ডাক্টরের হাঁকডাক শুরু করলে ওর সম্বিত ফেরে যেন।

— চলো দাদা। উদ্ধারণপুর যাবে তো?

— তুমি যাও ভাই। মেলা মোচ্ছবে যেতে আর মন চায় না।

নীরবেই বিদায় চায় সুদাম। ফাঁকা বাস, সীট পেতে অসুবিধা হল না। মানিকদাস দাঁড়িয়েছিল জানালার বাইরে,— 'কী একটা কথা যে বলব-বলব ভাবছিলাম! ওহ্, হ্যাঁ, কোটাসুর থেকে সেই দিন সকালে তুমি চলে যাওয়ার পর-পরই একজন এয়েছিল তোমার খোঁজে।'

সুদাম চমকে ওঠে।

— ক্ষেপি কয়েছিল, সে নাকি তোমার মনের মানুষ। আহা, চলে গ্যাছো শুনে বেচারির চোখদুইটিতে সে কী কাতরতা! সে' মায়া ভুলবার নয় গো ভাই। হারাইছো বুঝি? খুঁইজো। বুকের মাঝখানটায় যত্ন করে রেখো। যাইতে দিও না।...

জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার আগে এ কী কথা শুনিয়ে গেল মানিকদাস?— সে মানুষ কিনা তার জন্য—! এমন প্রকাণ্ড আক্ষেপ বুকে ধাক্কা দেয়নি কোনোদিন। তার পাশে নিজেকে না-মানানোর হীনমন্যতা ছিলই, পাশাপাশি ব্রজঘটকের সেই জবাব না দেওয়া-কে ওই পক্ষের 'না'-ই ধরে নিয়েছিল এতদিন। সে-ও যে-!

অথচ, তাকে ভোলার জন্যই তো এত আয়োজন! গানে অবধি মন বসতো না। গাইতে গাইতে পদের মাঝেই অনমনা হয়ে যেত এক-একদিন। বাজনদার হরিহর বিচক্ষণ লোক। আন্তরিক উপদেশই দিয়েছিল, 'এত অস্থির মনে নামগান হয় না ভায়া। দুঃখ পেও না। গাইয়ে তুমি ভালোই। কিন্তু, একমাত্র প্রভুর নামের সঙ্গেই গাঁটছাড়া বাঁধার ধাত তোমার নয়। গলায় আর্তির বদলে বেদনার ঝোঁক বেশি। একটা নোঙর লাগে তোমার। সংসারে যাও। থিতু হও ক্ষণিক। গান তো রইলও। আমরাও রইলাম।'

হরিদা ভুল বলেনি কিছু। কোটাসুরের মেলা থেকে পালানোর পর থেকে অন্তরের এই বেদনার ঠেলায় টানা দুই-তিন বছর এ'মোচ্ছব থেকে সে'মোচ্ছব, এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছে সুদাম। বলাই বাহুল্য, একদণ্ডের জন্যও শান্তি মেলেনি। সে এক অদম্য বীজকণা,— শাসন মানে না, দমন মানে না। দু-ফোঁটা জল পেলেই চোরকাঁটাদের ভিড়ের মাঝে বারবার যেন ঘাসফুলের মতো

ফুটে উঠতো।

সব জেদ ভুলে বাড়ি ফিরেছিল সুদাম। এবারে বাপ আর দেরী করেনি। একমাসের মধ্যেই পিঁড়িতে বসিয়েছিল তাকে।— পালটি ঘর, লক্ষ্মীমন্ত বউ। দিয়েছে-থুয়েছেও মন্দ না। পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেওয়ার পর থেকে গান পুরোপুরি না ছাড়লেও মাঝেমধ্যে দুটো-একটা ছাড়া মেলা-মোচ্ছবে যাতায়াত প্রায় বন্ধই আজকাল। গৃহিণী ভালোমানুষ। মন যুগানোর চেষ্টায় ত্রুটি রাখে না।— যথেষ্ট না হলেও অপ্রতুল মায়া আছে তার প্রতি।

তা সত্ত্বেও, দিনের শেষে আর কাজের ফাঁকের প্রায় প্রতিটি ছোটো-বড়ো অবকাশে মনের সেই নির্জন পান্থশালায় ফিরে ফিরে এসেছে মুখখানা। উচিত-অনুচিতের চোখরাঙানিতে কাজ হয়নি। তখন নিজেকে বুঝিয়েছে ক্রমাগত— মন মজলে কাবুলিয়ালা হই। আসল থাক আসলের মানে, ভাবের ঘরে রোজের সুদটুকু জীবনের মাধুকরী।...

'তা সেই মাধুকরীর ভরসাতেই বেঁচে থাকা, কর্তব্যপালন। তারপর হঠাৎ এই মুখোমুখি।'– একটানা কথা বলে কিছুক্ষণ বিরাম নেয় সুদাম। নিজের কাঁচাপাকা কদমফুলি দাড়িতে হাত বুলোয়। লোকে এখন আর 'সুদাম' নয়, 'গোঁসাই' ডাকে। যৌবনের নিকুঞ্জ ছেড়ে যাই-যাই ঢঙে পরিযায়ী সময়ের ডানা ঝাপটানি আর গুপ্ত নয়। তবে হাত-চারেক তফাতে বসে থাকা মানুষটির চোখে-মুখে সময় তেমন ছাপ ফেলেনি। পূর্ণিমা গেলেও সে যেন প্রতিপদের চাঁদ।

প্রবাদে আছে— পিতৃপিণ্ডের গয়া, মাতৃপিণ্ডের রামকেলি। গৌড়েশ্বরীর থানে পিণ্ডদানের পর পিরোজ মিনারের চারপাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে মাতৃ আত্মার শান্তি কামনা করছে একদল নরনারী। বোষ্টমদের পরিপাটি সাদা বেশ, বোষ্টমীদের কপালে আঁকা রসকলি। এখানেই নাকি রূপ-সনাতনের দীক্ষা, এখান থেকেই নাকি শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রার শুরু।

প্রভুর লীলা বোঝা দায়!— তখন কেন যে অমন চাতক করেছিলেন? কেন যে এমন তৃষ্ণার্ত রেখে দিলেন? আবার দীঘি চেনালেনও এমন এক সময়— যখন জলচল বন্ধ। কিন্তু, তা জানা সত্ত্বেও আয়ুর বিনিময়ে অর্জিত স্বভাবসংযমকে হেলায় উড়িয়ে কেন হাহাকার করে উঠতে চাইছে অন্তঃপুর?— 'কই কই, প্রেমময়ী, পরশিয়ে অঙ্গ শীতল হই ... বহুদিন না দেখিয়া আমি জ্বলে যে আছি...'

সামনের মানুষটি তানপুরার তন্ত্রীর মতো স্থির। অতীতচারণায় কয়েক ফোঁটা জল বৃষ্টিবিন্দুর মতো গড়িয়ে পড়েছে গাল বেয়ে। সুদামের হঠাৎ মনে হয়, এই গুপ্ত-বৃন্দাবনই বুঝি ওর জীবনের নীলাচল। ওই তো, বৃষ্টিবিন্দুগুলি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে সামনে। ভিজিয়ে দিচ্ছে। এমনভাবে সিক্ত হলে কি রিক্ততা দূর হয়?— কে জানে! ওরে মন, তুই শান্ত হ।

— কী ভাবতেছেন গোঁসাই?

— ভাবছি, ভাবনার কালসাপটাকে কোন গর্তে শীতঘুমে পাঠাই?

— ওহ্ আচ্ছা, ঘুম পাড়াবেন বলেই বুঝি এতদিন তারে ঝাঁপিতে নিয়ে ঘুরতেছিলেন?

— '...এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে? ... আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে...'

— পরাণ ফাটে! সত্যি?

— মিথ্যায় কী কাজ?

— তবে শোনেন, আপনার সম্বন্ধ যে এয়েছিল সে'খবর আমার ছিল না। মাসে-দুইমাসে ব্রজঘটক আসতো বটে, তার উপরে ভরসা ছিল না বাপের। বেশ কয়েকবার 'রাজযোটক'-এর কুলুজি এনেছিল। বাপ খোঁজ নিয়ে দেখেছে— পাত্র হয় মাতাল, নয় দোজবর, নয়তো আরও কী-কী যেন! সে'লোক যে এমন ভুল করে ঠিক করে বসবে তা কে জানতো?... আমার না হয় বুঝবার যো ছিল না, আপনার কি একবারও খুঁজতে ইচ্ছা হয় নাই? ঠিকানা তো জানতেন! সেইদিন আপনার গান শুনলাম, মন গেল। খোঁজ করতে গেলাম, মান গেল। তারপর দুই বচ্ছর অপেক্ষা করে শেষে বেগতিকে মত দিলাম বিয়েতে। আপনি তো পুরুষ গোঁসাই, আইবুড়ির যন্তন্না জানেন না। ঘরের গঞ্জনা তো থাকেই। তার উপরে একশটা মানুষের হাজারটা প্রশ্ন, দেখলেই ফিসফাস, চাপা হাসি। দশটা লোকের কুনজর। ভাবে— যে মেয়ের বর জোটে না, তাকে সহজেই জুটিয়ে ফেলা যায়।

সুদাম কথা ঘোরাতে চায়, 'একা এসেছেন যে বড়ো?'

— একা কই, পড়শি ননদ আছে সঙ্গে। নামগান শুনছে বসে।

— কর্তা অনুমতি দিলেন?

— তিনি সাদা-সিধা মানুষ। আমি বললে না করেন না কিচ্ছুতে। ভালোই জানেন, আমার সবটুকুর দখল পান নাই। জমিদারির লোভ নাই তার। ঘরে আছি— এতেই সুখী। আপনার মতো কালসাপের ঝাঁপিতে থেকে-থেকে হাত ঢুকানোর বাতিকও নাই। যাই হোক, একটা কথা বলেন তো-।

'কী কথা?'— সুদাম স্মিত হাসে।

— কাল লোকগুলো যদি বেজায়গায় গাড়ি না থামতো, যদি ওরা পাথর না ছুঁড়তো, যদি এগিয়ে কথা না বলতাম, আপনি নিজে সামনে আইতেন না, তাই না?

কী-বলি, কী-বলি ভাবতে ভাবতে একখানা পদ ধরে সুদাম, 'কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ ... পাগলা মনটারে তুই বাঁধ...'

— চালাকি করবেন না গোঁসাই। কোনো প্রশ্নের সিধা মুখে জবাব দেন না। প্রশ্ন করলেই দু-কলি শুনায়ে দেন। ভাবেন কী, বুঝি না?

— কী বুঝেন?

— আপনার স্বভাবে বড়োই প্যাঁচ। ভাবখানা এই, 'আমি তো কাঁদি নাই, এসব পদকত্তার ভাবনা।' তাল করেন— নিজে তো বাঁচি, মরলে হতচ্ছাড়া কবি মরুক।

— 'কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই। নিশ্চয় মরিব তোমার চান্দমুখ চাই।...'

— ওই আবার! মরণের অতই যদি শখ, একযুগ আগে কি ভূতের ভয়ে পালায়েছিলেন?

— কোনো উপায় দেখি নাই সেইদিন।

— হুম্‌, বড়োই নিরুপায় মানুষ আপনি!

অভিমানে কান্তের প্রতি নায়িকার এই যে ছদ্ম অনাদর, পদকর্তারা তাকেই বলেছেন বিব্বোক-অলঙ্কার। সুদাম ধরতে পারে। কিছু বলে না। ভিন্নপানে চেয়ে থাকে শুধু।— মুখখানিতে বড়োই মায়া।...

'না গোঁসাই, আমি পারব না।'— কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে আসে শ্রীরূপার, 'আপনি বড়োই নিষ্ঠুর। ছিলাম তো বেশ নিজের খেয়ালে। আপনি ডাকাতের মতো আসবেন। কথায়-কথায় গান শুনাবেন। এই ডুবায়ে দিবেন, সেই ভাসাইবেন। একবার ঘরের আগল ভেঙে চৌকাঠে দাঁড়াইবেন, তরপর দিন-দুনিয়ার কথা তুলে, বিবেকের ধুয়ো তুলে পিছু হঠে দোর দিতে বলবেন— এ কেমন বিচার? কোনোদিন কি আপনার ভাব দেখতে চেয়েছিলাম? যেচে দিয়েছিলাম নিজের মনের তলাশ?'

হতভাগা সুদাম মরমে মরে। এ'কথার কী জবাব দেবে সে? শ্রীরূপার দুই গাল বেয়ে ধারা নেমেছে।— যেমন মানস সরোবরের দুই প্রান্ত থেকে অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে সিন্ধু আর ব্রহ্মপুত্র। এই মাটিতে অশ্রুর মূল্য যে অসীম। ভগবান চৈতন্য তো বক্তিমেও শোনাননি, তক্কোও করেননি। শুধু তার চোখের জলেই এমন বান এসেছিল,— ভেসে গিয়েছে গাঁয়ের পর গাঁ, নগরের পর নগর। কিন্তু, ওই 'কিন্তু'গুলোও যে—!

সে বলে, 'ভুল করেছি হয়তো। কিন্তু, সত্য তো 'ভুল' হয় না। আত্মপ্রকাশও পাপের কথা না। তবে কালবিশেষে তা অনধিকার হতে পারে। ভৈরব সত্য, সাঁঝের বেলাখানিও বাস্তব। গুরু বলেছেন,— সাঁঝের বেলায় ইমন, কল্যাণ, ধানেশ্রী চলে, তখন ভৈরবে আলাপ জুড়লে অনুচিত হয়।

— তত্ত্বকথা ভালোই জানেন। কিন্তু, তাতে কি হাঁড়ির ভাত সিদ্ধ হয়?

আয়নার সামনে লুকিয়ে থাকা বড়ো দায়। একখানি দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে অন্তর থেকে। ভাবে— আপনাকে আর কোন মুখে বলি, যখন আপ্রাণ চাইলেও আত্মিক হইবার উপায় থাকে না, তখন তাত্ত্বিকের ভেক ধরতে হয়।

বহুদিন পুষে রাখা আফশোস যেন জিরিয়ে নিচ্ছিল ওদের যৌথ নীরবতার আশ্রয়ে। কিছু সময় দ্রুত বয়ে যায়। সপ্রশ্ন চোখে চেয়েছিল শ্রীরূপা। সুদাম বলে, 'কিছু কিছু বেদনা এতটাই সত্য যে, তাদের খুব মমতায় লালন করতে সাধ হয়। কারো জন্য মায়া পড়েছে—'

— এখনও আড়াল গোঁসাই? এখনও বলবেন 'মায়া পড়েছে'?...

সুদাম হাসে, 'বেশ, তবে না হয় ভালোবাসাই বলি তারে। খুশি তো?

জবাব দেয় না অভিমানিনী, 'যা বলছিলেন, বলেন।'

'কারো জন্য ভালোবাসা জেগেছে, বুকের মধ্যে সেইটুকু প্রত্যক্ষ করা, সেও কী কম?'— গলা ধরে আসে সুদামের।

শ্রীরূপা বলে, 'আপনাকে 'আপনি-আজ্ঞে' করতে মন চায় না।'

ধীর পারে হাঁটতে হাঁটতে মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল দু'জন। সুদাম নিজের হাতটি শ্রীরূপার হাতের ওপর রাখে।

কেঁপে ওঠে নারী। তার গলা ধরে যায়, 'এ কী গোঁসাই?'

— খোকামি।

— তোমার নিয়মনীতি-?

— ব্যাকরণের নিয়মনীতি মেনে কবেই বা পদ রচনা হয়েছে রূপা? রাগানুগা মার্গে যে রাধা প্রভুর পরকীয়া, বৈধী মার্গে তিনিই স্বকীয়া। কোন পণ্ডিত ঠিক-বেঠিকের বিচার করে?...

সেই কবে মানিকদাস বলেছিল, 'ক্রন্দনে আর রোদনে আকাশপাতাল তফাৎ। বুঝলা ভাই!'— এই মুহূর্তে কোনো কিছুই মনে থাকে না। থাকে না সংশয়, ভয়, সঙ্কোচ অথবা কোনো অপরাধবোধ। দূরত্বটুকু নিভে যায় শীতের বিকেলের মতো। জানে ফিরে যেতে হবে যার-যার নিজের পথে।— না, পথে নয়, রাস্তায়। সব রাস্তা পথ হয়ে ওঠে না। তবু সবকিছু ছাপিয়ে, বহু ব্যক্তিক নৈর্ব্যক্তিক পাহারা এড়িয়ে, নীতি-নৈতিকতার সীমা পেরিয়ে কাছে পাওয়ার ইচ্ছে করত। সাহস হত না।- অধিষ্ঠিত নাম, ভূমিকা, পরিচয়গুলো ঘোর বাস্তব যে। তবে আজ এই নিভন্ত আকাশের রঙ কেন যে গোপন সেতারখানা এমন ভাবে বাজিয়ে তুলল, কে জানে!

নীরবে কাঁদতে পারে শ্রীরূপা। ভিজে উঠছে সুদামের বুকখানা। আলিঙ্গন কখন যে সমর্পণ হয়েছে— বোঝা যায়নি। একবুক আগুন যেন পাথরচাপা ছিল এতকাল। একজনের অশ্রু অন্যজনের অস্থি-চর্ম-আবরণ ভেদ করে ফাটল ধরিয়ে চলেছে পাথরে। ছুঁয়ে যাচ্ছে আগুন। তাই হয়তো দু'চোখ বাষ্পময়। সুদাম মুখ ডুবোতে যায় শ্রীরূপার সিঁথির মাঝে। ঠিক তখনই, অনাত্মীয়া সিঁদুরের ঘ্রাণ হঠাৎ চাবুক চালায় যেন! বুকের ভেতরের চাপা আগুনটা ঝলসে ওঠে। বাষ্পগুলো মেঘ হয়ে ওঠে চোখে। রোদের মতো রুদ্ররূপ ধারণ করে এই যে বহমান ধারা, তা ক্রন্দন নয়, রোদন— বেদনা আর ক্রোধের যুগপৎ আত্মপ্রকাশ। মানসলোকে বুঝি দেখা মেলে দেবতার, 'মা রুদঃ মা রুদঃ' প্রবোধে যদি মরুৎসঞ্চার হয়! যে বয়সে সব ঘটনার কারণ জানার ঝোঁক থাকে, সুদাম তা পেড়িয়ে এসেছে। তবু খড়কুটোর মতো কোনো একটা সংযোগ খোঁজে। লৌকিক, অলৌকিক যা খুশি হোক,— প্রসঙ্গ যদি না-ই থাকে, তবে দুই ভিন্ন পথের যাত্রী বারবার কেন এমন মুখোমুখি হবে?

বেদন জমতে জমতে 'বোধ' হয়, রোদন জমতে জমতে প্রতিরোধ হয়ে ওঠে।— সেই জুটির সহভাবে ওই দু'জন স্থানুবৎ। একে-অপরকে বন্ধনী মুক্ত

করতে মন চায় না। সুদাম টের পায়, অলক্ষ্যে জেগে উঠছে ঊনপঞ্চাশবায়ু। ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করে ঝঞ্ঝা উড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে। তারপর-?

— এবার আমরা কী করব গোঁসাই?

— সত্যপালন।

'কোনটা সত্যি?'— জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শ্রীরূপা।

— যে সংসারে ফিরতে হবে, তা যেমন চরম সত্য, যে সংসার আজ গড়ে উঠেও পড়ে রইল এই পিয়াসবাড়ির গুপ্ত বৃন্দাবনে, পরম সত্য সে-ও।

— সে কি সম্ভব?

— সত্যটাকে হাজার ধমক দিলেও সে মিথ্যা হয় না। দুনিয়াদারির চোখরাঙানিতে তাল ভাঙতে পারে। তার সনে বিরোধ নাই। দুনিয়া থাক তার মানে। নীরবেই পালন করব বরং। প্রভু চাইলে দেখা নিশ্চয়ই হবে।

— আর না চাইলে?

সুদাম স্মিত হাসে, 'পরম সত্যটা না হয় মনের গভীরেই শ্বাস নেবে।'

মেলার মাঠ থেকে নাগরদোলার শব্দ, ফিরিওয়ালাদের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। ভেসে আসছে মৃদঙ্গ করতাল হারমোনিয়াম শঙ্খের ধ্বনি, উচ্চস্বরে হরির বোল।

শ্রীরূপার অভিমানী চোখদুটি ভিজে উঠেছে আবার। এই যাত্রায় অন্তিমবারের মতো বাহুলগ্ন হয় ওরা। সে এক অদ্ভুত প্রশান্তি! মানবজনম যদি এমনই সুন্দর হয়, হয় এমনই দুর্লভ, এমনই সৌভাগ্যময়, তবে কেন যে পুনর্বার না জন্মানোর প্রার্থনা করে মুক্তিকামী সাধকগণ— আশ্চর্য লাগে!

না, নতি অথবা পরিণতি নিয়ে ভাবনা নেই ওদের। যে সূক্ষ্ম অনুভবের আশ্রয়ে আত্মা অন্তরপ্রজ্ঞ হয়ে ওঠে, তার খোরাকির জন্য বাইরে হাত পাততে হয় না। আনন্দই তার খাদ্য, অশ্রুই তার পানীয়। মাথুরের পর ভাব-সম্মেলন না ঘটলে কীর্তন যেমন অসম্পূর্ণ, মানের পর মিলন না হলে মানও পূর্ণতা পায় না। তবে ক্ষণে-ক্ষণে টের পাইয়ে দেন অন্তর্যামী— অচেনা হোক, অজানা হোক, দুর্গম হোক, গন্তব্য একটা আছেই। তবু বিয়োগের ভয় জাগে। মনে হয়, এই বুঝি পথের শেষ! না, অনুভূতিগুলো নদীর মতো নিজের নামধাম ত্যাগ করে সাগরে অদৃশ্য হয়। কামনা বাসনা ধারণা কল্পনাতেও শুধু না, তাদের উপস্থিতি মনে, বুদ্ধিতে, চিত্তে, অহঙ্কারে।— দশ ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি সঞ্চালনে।...

ওরা এভাবেই থাকুক যতক্ষণ সম্ভব। সত্যটা মনের মাঝে রয়ে যাবে ঠিকই॥

*****

'বর্তমান', ২০২১



লেখক পরিচিতি

'দুই মলাটের মাঝে যতটুকু আছে'





boiChoi publiCation

think books, think boiChoi

ISBN 978-9-39-394916-5

